শংকর

জন-অরণ্য

জন-অরণ্য

শংকর

JANA-ARANYA
Rs. 10
A Bengali Novel
BY SANKAR
Dey's Publishing
13 Bankim Ch. Street
Calcutta-700073

প্রাপ্তিস্থান :
দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ : নৃপেন নাথ

মুদ্রাকর :
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
পরিচালনাধীন)
৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

দশ টাকা

বিশ্ববাণী প্রথম প্রকাশ :
—নভেম্বর, ১৯৭৩
—অগ্রহায়ণ, ১৩৮০

দ্বিতীয় মুদ্রণ :
—নভেম্বর, ১৯৭৩
—অগ্রহায়ণ, ১৩৮০

তৃতীয় মুদ্রণ :
—ডিসেম্বর, ১৯৭৩
—পৌষ, ১৩৮০

চতুর্থ মুদ্রণ :
—জানুয়ারী, ১৯৭৪
—মাঘ, ১৩৮০

পঞ্চম মুদ্রণ :
—ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪
—ফাল্গুন, ১৩৮০

ষষ্ঠ মুদ্রণ :
—এপ্রিল, ১৯৭৪
—চৈত্র, ১৩৮০

সপ্তম মুদ্রণ :
—জুন, ১৯৭৪
—আষাঢ়, ১৩৮১

অষ্টম মুদ্রণ :
—আগষ্ট, ১৯৭৪
—শ্রাবণ, ১৩৮১

নবম মুদ্রণ :
—ডিসেম্বর, ১৯৭৪
—পৌষ, ১৩৮১

দশম মুদ্রণ :
—মার্চ, ১৯৭৫
—ফাল্গুন, ১৩৮১

একাদশ মুদ্রণ :
—মে, ১৯৭৫
—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮২

দ্বাদশ মুদ্রণ :
—সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫
—ভাদ্র, ১৩৮২

ত্রয়োদশ মুদ্রণ :
—মার্চ, ১৯৭৬
—ফাল্গুন, ১৩৮২

প্রথম দে'জ সংস্করণ :
—নভেম্বর, ১৯৭৮
—কার্তিক, ১৩৮৫

দ্বিতীয় সংস্করণ :
—ডিসেম্বর, ১৯৭৮
—অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫

তৃতীয় সংস্করণ :
—জানুয়ারী, ১৯৭৯
—পৌষ, ১৩৮৫

চতুর্থ সংস্করণ :
—মে, ১৯৭৯
—বৈশাখ, ১৩৮৬

পঞ্চম সংস্করণ :
—জুলাই, ১৯৭৯
—শ্রাবণ, ১৩৮৬

ষষ্ঠ সংস্করণ :
—নভেম্বর, ১৯৭৯
—কার্তিক, ১৩৮৬

সপ্তম সংস্করণ :
—ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০
—মাঘ, ১৩৮৬

অষ্টম সংস্করণ :
—এপ্রিল, ১৯৮০
—বৈশাখ, ১৩৮৭

নবম সংস্করণ :
—অক্টোবর, ১৯৮০
—আশ্বিন, ১৩৮৭

দশম সংস্করণ :
—ডিসেম্বর, ১৯৮০
—অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭

একাদশ সংস্করণ :
—মার্চ, ১৯৮১
—চৈত্র, ১৩৮৭

দ্বাদশ সংস্করণ :
—জুলাই, ১৯৮১
—আষাঢ়, ১৩৮৮

ত্রয়োদশ সংস্করণ :
—জানুয়ারী, ১৯৮২
—পৌষ, ১৩৮৮

জন-অরণ্য উপন্যাসটা পড়েছেন? মিসেস গাঙ্গুলীর চরিত্রটা ঠিক যেন আমাকে নিয়েই লেখা !"

আমার তরুণ বন্ধুর সাহায্যে নগর কলকাতার এক নতুন দিক আমার চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছিল। এই জগতে পয়সার বিনিময়ে মা তুলে দেয় মেয়েকে, ভাই নিয়ে আসে বোনকে, স্বামী এগিয়ে দেয় স্ত্রীকে। মিসেস বিশ্বাস এবং তাঁর দুই মেয়ের বিজনেসের যে ছবি আঁকা হয়েছে তা মোটেই কল্পনাপ্রসূত নয়। লোভের এই কলুষিত জগতে খদ্দেরের অঙ্কশায়িনী কন্যার আর কতক্ষণ দেরি হবে তা জানবার জন্যে মা নির্দ্বিধায় দরজার ফুটো দিয়ে ওদের দেখে আসেন এবং শান্তভাবে ঘোষণা করেন, "আর দেরি হবে না, টোকা দিয়ে এসেছি, আপনারা বসুন। আমার এই মেয়েটার ঐ দোষ! কাস্টমারকে ঝটপট খুশী করে তাড়াতাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারে না। বড্ড সময় নষ্ট করে।"

অভিজাত সায়েব পাড়ায় মিসেস চক্রবর্তী, মিসেস বিশ্বাসের দুই কন্যা রুমু-ঝুমু, মিসেস গাঙ্গুলী এবং চরণদাসের 'টেলিফোন অপ্রেটিং' স্কুলের ছাত্রী ছাড়াও আরও অনেকের দুর্বিসহ অপমান ও লজ্জার কাহিনী এই সময় জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মিসেস সিন্‌হা। বাইরে পরিচয় ইনসিওরেন্স এজেন্ট। কিন্তু আসলে মিসেস গাঙ্গুলীর সমব্যবসায়িনী। এই মহিলার জীবন বড়ই দুঃখের, এঁর কথা কোনো এক সময় লেখার ইচ্ছে আছে।

উপন্যাসের সমস্ত উপাদান বিভিন্ন মহল থেকে তিলে তিলে সংগ্রহ করে অবশেষে জন-অরণ্য লিখতে বসেছিলাম। সমকালের এই অপ্রিয় কাহিনী সকলের ভালো লাগবে কিনা সে-বিষয়ে মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য একটাই ছিল। আমাদের এই যুগে বাংলার কর্মহীন অসহায় যুবক-যুবতীদের ওপর যে চরম অপমান ও লাঞ্ছনা চলছে উপন্যাসের মাধ্যমে তার একটা নির্ভরযোগ্য চিত্র ভবিষ্যতের বাঙালীদের জন্যে রেখে যাওয়া; আর সেই সঙ্গে এদেশের ছেলেদের এবং তাদের বাবা-মায়েদের মনে করিয়ে দেওয়া যে বেকার সমস্যা সমাধানের জরুরী চেষ্টা না হলে আমাদের সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনের বুনিয়াদ ধ্বসে পড়বে।

উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হয়েছে এ-কথা অবশ্যই বলা যায় না। কিন্তু অনেকে এই বই পড়ে বিচলিত হয়েছেন। এই ডিসটার্বড মানসিক অবস্থায় কেউ-কেউ অভিযোগ করেছেন, এই উপন্যাসের মধ্যে শুধুই নিরাশা, কোনো আশার আলো দেখানোর চেষ্টা হয়নি। তাঁদের প্রশ্ন : 'জন-অরণ্য পড়ে কার কী উপকার হবে?' আমার বিনীত উত্তর, দীর্ঘদিনের ঘুম ভাঙানোর জন্যেই তো এই উপন্যাসের সৃষ্টি এবং নিরাশার নিশ্ছিদ্র অন্ধকার থেকেই তো অবশেষে আশার আলো বেরিয়ে আসবে। এই উপন্যাস পড়ে কারও কোনো উপকার হবে কিনা বলা শক্ত, কিন্তু সত্যকে তার স্বরূপে প্রকাশিত হতে দিলে কারোও কোনো ক্ষতি হয় না। এই মুহূর্তে এর থেকে বেশি তো কিছু জানা নেই আমার।

পাণ্ডুলিপিতে এই উপন্যাস পড়ে আমার একান্ত আপনজন বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "বড্ড অপ্রিয় বিষয়ে কাজ করলে। লেখাটা শেষ পর্যন্ত কী হবে কে জানে।"

আমার মনেও যে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল না এমন নয়। তবু একটা সান্ত্বনা ছিল। বাংলার ঘরে ঘরে অসহায় সুকুমার ও সোমনাথরা তিলে তিলে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, এদের সঙ্গে সঙ্গে অভাগিনী কণারাও সর্বনাশের অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে, সমকালের লেখক
এদের সম্বন্ধে স্বদেশবাসীকে অবহিত করবার দায়িত্ব আমি অস্বীকার করিনি।
ষণের ভয়ে সত্য থেকে মুখ সরিয়ে নিইনি।
থেকে বহু চেষ্টায় বিপ্লবী লেখক ফ্যাননের একখানা বই পেয়েছিলাম। সেই
ন্ধে ফরাসী মানব সার্তর জ্বালাময়ী ভাষায় লিখেছিলেন, "হে আমার দেশ-
স্বীকার করতে রাজী আছি, তোমরা অনেক কিছুরই খবরাখবর রাখো না।
ড়ার পর তোমরা বলতে পারবে না, নির্লজ্জ শোষণ এবং অন্যায়-অবিচারের
জানানো হয়নি। হে আমার দেশবাসিগণ, তোমরা অবহিত হও।"

উপন্যাসের প্রথম পাতায় সার্তরের মহামূল্যবান সাবধানবাণীটি আবার পড়তে অনুরোধ জানাই।

দেশ পত্রিকায় জন-অরণ্য প্রথম প্রকাশিত হবার দিন আমি একটু দেরিতে বাড়ি ফিরেছিলাম। স্ত্রী বললেন, "তোমার উপন্যাসের প্রথম পাঠক সত্যজিৎ রায় ফোন করেছিলেন। যত রাতেই হোক, তুমি ফিরলেই যোগাযোগ করতে বলেছেন।"

পরের দিন ভোরে শুনলাম দুটি ছেলে বরানগর থেকে দেখা করতে এসেছে। ছেলে দুটি বললো, "আমরা গতকালই আসতাম। গতকাল বহু চেষ্টা করেও রাত আটটার আগে আপনার ঠিকানা যোগাড় করতে পারিনি। আমরা দুই বেকার বন্ধু—অনেকটা আপনার সোমনাথ ও সুকুমারের মতো। আমরা আপনার কাছ থেকে সুধন্যবাবুর জামাই—যিনি কানাডায় থাকেন—তাঁর ঠিকানা নিতে এসেছি। এদেশে তো কিছু হবে না, বিদেশে পালিয়ে গিয়ে দেখি।" জন-অরণ্যর সুধন্যবাবু এবং তাঁর কানাডাবাসী জামাই নিতান্তই কাল্পনিক চরিত্র—কিন্তু ছেলে দুটো আমাকে বিশ্বাস করলো না। ক্ষমা চাইলাম তাদের কাছ থেকে। বিষণ্ন বদনে বিদায় নেবার আগে তারা সজল চোখে বললো, "জন-অরণ্য উপন্যাসের একটা লাইনও যে বানানো নয় তা বোঝবার মতো বিদ্যে আমাদেরও আছে শংকরবাবু। আপনি সুধন্যবাবুর জামাইয়ের ঠিকানা দেবেন না তাই বলুন।"

সত্যজিৎ রায় জন-অরণ্য চলচ্চিত্রায়িত করবার কথা ভাবছেন জেনে বিগত রাত্রে যতটা আনন্দিত হয়েছিলাম, আজ সকালে ঠিক ততটাই দুঃখ হলো। দেশের লক্ষ লক্ষ বিপন্ন ছেলেমেয়েদের হৃদয়ে আশার আলোক জ্বালিয়ে দেবার ক্ষমতা আমার নেই ভেবে লজ্জায় মাথা নিচু করে অসহায়ভাবে বসে রইলাম।

—মার্চ, ১৯৭৬

উৎসর্গ

শ্রীতুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

শংকর-এর কয়েকটি বই

যুগল উপন্যাস

মনজঙ্গল ১৬·০০
(মনোভূমি ও মনজঙ্গল)

তীরন্দাজ ২০·০০
(তীরন্দাজ ও লক্ষ্যভ্রষ্ট)

তনয়া ২০·০০
(নগর নন্দিনী ও সীমন্ত সংবাদ)

ত্রয়ী উপন্যাস

স্বর্গ মর্ত পাতাল ২০·০০
(জন-অরণ্য, সীমাবদ্ধ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা)
জন্মভূমি ২০·০০
(স্থানীয় সংবাদ, সুবর্ণ সুযোগ ও বোধোদয়)

বিশেষ রচনা

কত অজানারে ২০·০০
এই তো সেদিন ১৫·০০
যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ১৩·০০

বিশ্বভ্রমণ

জানা দেশ অজানা কথা ২৫·০০
এপার বাংলা ওপার বাংলা ২১·০০
যেখানে যেমন ১৬·০০

আরও কয়েকটি বই

মানচিত্র ১৫·০০
পাত্রপাত্রী ৮·০০
এক যে ছিল ১০·০০
সার্থক জনম ১২·০০
এক দুই তিন ১০·০০
যা বলো তাই বলো ১০·০০

ছোটদের জন্য

এক ব্যাগ শংকর ১২·০০
চিরকালের উপকথা ১০·০০

উপন্যাস

মুক্তির স্বাদ ১৫·০০
মাথার ওপর ছাদ ১৪·০০
বিত্তবাসনা ১২·০০
একদিন হঠাৎ ১৫·০০
নবীনা ১০·০০
মানসম্মান ১৪·০০
সোনার সংসার ১৫·০০
চৌরঙ্গী ২৫·০০
সুবর্ণ সুযোগ ১২·০০
জন-অরণ্য ১০·০০
মরুভূমি ১৬·০০
আশা-আকাঙ্ক্ষা ১২·০০
সম্রাট ও সুন্দরী ১৬·০০
রূপতাপস ১০·০০
বোধোদয় ১২·০০
স্থানীয় সংবাদ ১৫·০০
নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি ১৫·০০
সীমাবদ্ধ ১২·০০
পদ্মপাতায় জল ৭·০০

প্রকাশকের নিবেদন

শংকর-এর জন-অরণ্য নানা কারণে বাংলা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় সৃষ্টিরূপে চিহ্নিত হবার দাবী রাখে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন স্তরে এই উপন্যাসটি যে আলোচনা ও উত্তেজনার ঝড় তোলে তা এক কথায় অভূতপূর্ব। এই বইটির প্রধান চরিত্রগুলির যন্ত্রণা সরাসরি বাঙালীর মর্মমূলে আঘাত করেছে বলাটা বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না।

শুধু বাংলা নয়, অনুবাদের মাধ্যমে এই উপন্যাসটি এখন বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় পাঠকবৃন্দের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। গত এক দশকে আর কোনো বাংলা উপন্যাস এইভাবে সর্বভারতীয় আসরে বাংলা সাহিত্যের সম্মান বৃদ্ধি করে নি।

ত্রয়ী উপন্যাস স্বর্গ মর্ত পাতালের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জন-অরণ্য ইতিমধ্যেই বাংলার ঘরে ঘরে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। কিন্তু জন-অরণ্যের পৃথক অস্তিত্ব অক্ষুন্ন রাখার দাবী জানিয়ে বহু পাঠক-পাঠিকা সম্প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাদের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করেই নব কলেবরে এই দে'জ সংস্করণ প্রকাশিত হলো।

১লা নভেম্বর ১৯৭৮ **প্রকাশক**

এই উপন্যাসের পরবর্তী অধ্যায়

মরুভূমি ১৬'০০

দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

"I am willing to believe that at the beginning you did not realise what was happening ; later, you doubted whether such things could be true ; but now you know, and still you hold your tongues... The blinding sun of torture is at its zenith ; it lights up the whole country. Under that merciless glare, there is not a laugh that does not ring false, not a face that is not painted to hide fear or anger, not a single action that does not betray our disgust, and our complicity."

Jean-Paul Sartre
in his preface to
THE WRETCHED OF THE EARTH
by Frantz Fanon

পাণ্ডুলিপির প্রতিচিত্র

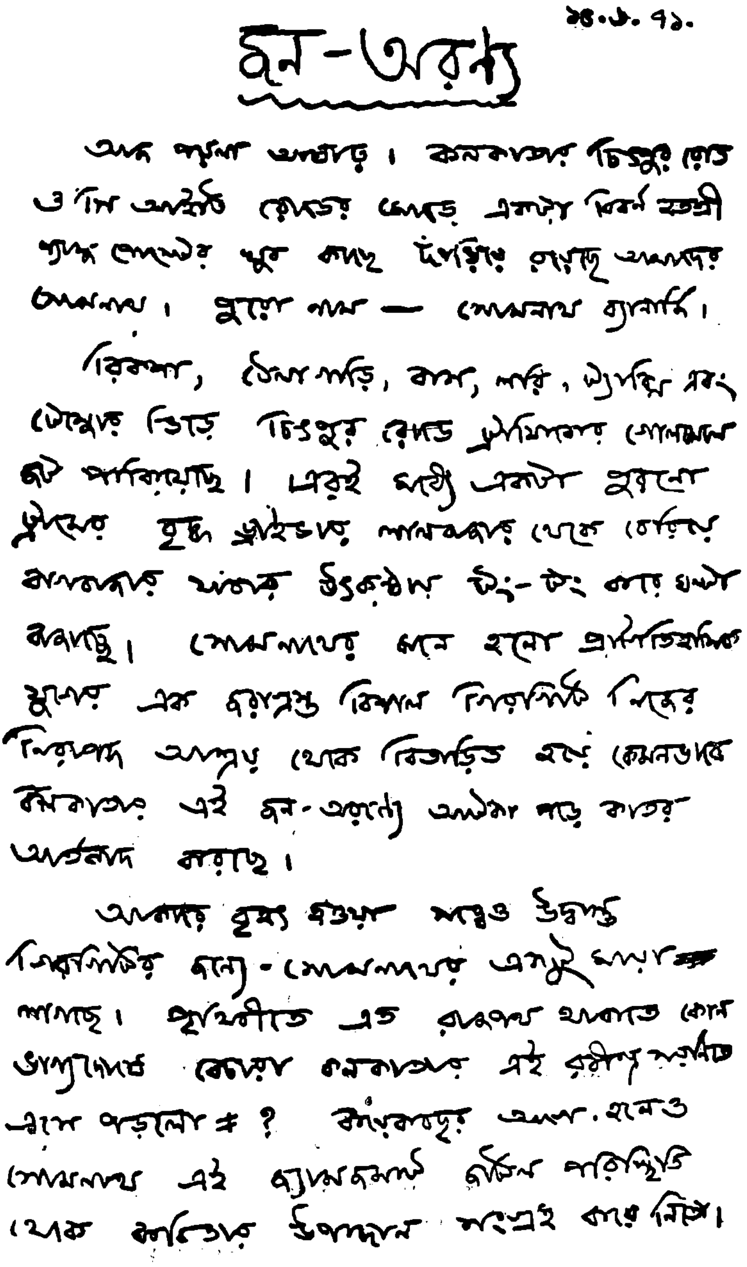

১৪.১.৭১.

জন-অরণ্য

আজ পয়লা আষাঢ়। কলকাতার চিৎপুর রোড ও সি আই টি রোডের মোড়ে একটা বিবর্ণ স্ট্রীট ল্যাম্পের খুব কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের সোমনাথ। পুরো নাম — সোমনাথ ব্যানার্জি।

রিক্সা, ঠেলা গাড়ি, বাস, লরি, ট্যাক্সি এবং লোকের ভিড় চিৎপুর রোডে ট্র্যাফিকের গোলমাল জট পাকিয়েছে। এরই মধ্যে একটা পুরনো ট্রামের বৃদ্ধ ড্রাইভার জানলার থেকে বেরিয়ে বাসগুলোর মাথার উদ্দেশে ঠুং-ঠাং করে ঘণ্টা বাজাচ্ছে। সোমনাথের মনে হলো প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক বয়স্ক বিশাল সরীসৃপ নিজের নিরাপদ আশ্রয় থেকে বিতাড়িত হয়ে কেমনভাবে কলকাতার এই জন-অরণ্যে আটকা পড়ে কাতর আর্তনাদ করছে।

আকারে বৃহৎ হওয়া সত্ত্বেও উদ্বাস্তু প্রাণীটির জন্যে সোমনাথের একটু মায়া লাগছে। পৃথিবীতে এত রকমের থাকতে কোন ভাগ্যদোষে বেচারা কলকাতার এই রাস্তায় এসে পড়লো # ? বাঁকুড়ার এম.এ. হয়েও সোমনাথ এই ব্যাপক জটিল পরিস্থিতি থেকে কবিতার উপাদান সংগ্রহ করে নিচ্ছে।

আজ পয়লা আষাঢ়। কলকাতার চিৎপুর রোড ও সি আই টি রোডের মোড়ে একটা বিবর্ণ হতশ্রী ল্যাম্পপোস্টের খুব কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোমনাথ। পুরো নাম—সোমনাথ ব্যানার্জি।

রিকশা, ঠেলাগাড়ি, বাস, লরি, ট্যাক্সি এবং টেম্পোর ভিড়ে চিৎপুর রোডে ট্রাফিকের গোলমেলে জট পাকিয়েছে। এরই মধ্যে একটা পুরনো ট্রামের বৃদ্ধ ড্রাইভার লালবাজার থেকে বেরিয়ে বাগবাজার যাবার উৎকণ্ঠায় টং টং করে ঘণ্টা বাজাচ্ছে। সোমনাথের মনে হলো প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক জরাগ্রস্ত বিশাল গিরগিটি নিজের নিরাপদ আশ্রয় থেকে বিতাড়িত হয়ে কেমনভাবে কলকাতার এই জন-অরণ্যে পড়ে কাতর আর্তনাদ করছে।

আকারে বৃহৎ হওয়া সত্ত্বেও উদ্বাস্তু গিরগিটির জন্যে সোমনাথের একটু মায়া লাগছে। পৃথিবীতে এতো রাজপথ থাকতে কোন্ ভাগ্যদোষে বেচারা কলকাতার এই রবীন্দ্র সরণিতে এসে পড়লো? কয়েক বছর আগে হলেও সোমনাথ এই জ্যামজমাট জটিল পরিস্থিতি থেকে কবিতার উপাদান সংগ্রহ করে নিতো। পকেটের ছোট্ট নোট বইয়ে এই মুহূর্তের মানসিকতা নোট করতো, তারপর রাত্রে কবিতা লিখতে বসতো। হয়তো নাম দিতো জন-অরণ্যে প্রাগৈতিহাসিক গিরগিটি। নতুন-লেখা কবিতাটা পরের দিনই তপতীকে পড়াতো। কিন্তু এসব কথা এখন ভেবে লাভ কী? সোমনাথের জীবন থেকে কবিতা বিদায় নিয়েছে।

টেরিটি বাজারের কাছে সোমনাথ ব্যানার্জি কী জন্যে দাঁড়িয়ে আছে? সে কোথায় যাবে? কেন? এই মুহূর্তে কোনো পরিচিত জন এইসব প্রশ্ন করলে সোমনাথ বেশ বিব্রত হয়ে পড়বে। অন্য যে-কোনোদিন হলে, মিথ্যা কিছু বলে দেওয়া যেতো। কিন্তু সোমনাথের পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়—আজ ১লা আষাঢ়। আষাঢ়ের এই প্রথম দিবসকে কবেকার কোন্ কবি নির্বাসিত এক যক্ষের বিরহবেদনায় স্মরণীয় করে তুলেছে। ২রা, ৩রা, ৫ই, ১৩ই, ১৫ই—আষাঢ়ের যে-কোনোদিনই তো মহাকবি কালিদাস বিরহী মর্মব্যথা উদ্ঘাটন করতে পারতেন—তাহলে এই ১লা তারিখটা সোমনাথ একান্তভাবে নিজের কাছে পেতো।

১লা আষাঢ় সোমনাথের জন্মদিন। চব্বিশ বছর আগে এমনই একদিনে সোমনাথ যে-হাসপাতালে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল তার নাম সিলভার জুবিলী মাতৃসদন। পঞ্চম জর্জের রাজত্বের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে মহামান্য সম্রাটের অনুগত ভারতীয় প্রজাবৃন্দ নিজেদের উৎসাহে চাঁদা তুলে সেই হাসপাতাল তৈরি করেছিল। সিলভার জুবিলী হাসপাতালের বেবির নিজেরই সিলভার জুবিলী হতে চললো—সোমনাথ মনে মনে হাসলো।

চিৎপুর রোডের চলমান জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে মায়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে সোমনাথের। মা বলতেন, জন্মদিনে ভালো হবার চেষ্টা করতে হয়। কাউকে হিংসে করতে নেই, কারুর ক্ষতি করতে নেই এবং মিথ্যে কথা বলা বারণ। ১লা আষাঢ়ের এই জটিল অপরাহ্ণে রবীন্দ্র সরণিতে দাঁড়িয়ে সোমনাথ তাই মিথ্যে কথা বলতে পারবে না। কেউ প্রশ্ন করলে সোমনাথকে স্বীকার করতেই হবে, সে চলেছে মেয়েমানুষের সন্ধানে।

চমকে উঠছেন? বিব্রত বোধ করছেন? ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না? ভাবছেন, শুনতে ভুল করলেন? না, ঠিক শুনেছেন? ভদ্র, সভ্য, সুশিক্ষিত তরুণ সোমনাথ ব্যানার্জি চলেছে মেয়েমানুষের সন্ধানে—এই শহরে যাদের কেউ বলে বেশ্যা, কেউ-বা কলগার্ল।

সোমনাথের বাবার নাম কয়েক বছর আগে একবার খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। কাগজের কাটিংটা সোমনাথ নিজেই কেটে রেখেছিল, তারপর কমলা বউদি পারিবারিক অ্যালবামে আঠা দিয়ে এঁটে রেখেছেন। দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি নিঃস্বার্থ দেশসেবার জন্যে সরকারী প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। সেই অবসরপ্রাপ্ত সরকারী গেজেটেড অফিসার দ্বৈপায়ন ব্যানার্জির ছেলে সোমনাথ ব্যানার্জি রাস্তায় অপেক্ষা করছে—এখনই সে নারীর সন্ধানে বেরুবে।

কালের অবহেলায় মলিন রবীন্দ্র সরণির দিকে আবার তাকালো সোমনাথ। এই গলিত-নখদন্ত জরদ্গব চিৎপুর রোডকে নামান্তরিত করে চিরসুন্দরের কবির নামের সঙ্গে জড়িয়ে দেবার কুৎসিত বুদ্ধিটা কার মাথায় এলো? কলকাতার নাগরিকরাও কেমন? কেউ কোনো প্রতিবাদ করলো না? বড়বাজারের আবর্জনায় মহাত্মা গান্ধীকে এবং চিৎপুরের পূতিগন্ধময় অন্ধকূপে রবীন্দ্রনাথকে নির্বাসিত করেও এঁরা কেমন আত্মতুষ্টি অনুভব করছেন।

উত্তেজনায় সোমনাথের দুটো কান ঈষৎ গরম হয়ে উঠছে। মিস্টার নটবর মিত্র এখনই এসে পড়বেন। মেয়েমানুষের ব্যাপারে নটবর মিত্র অনেক খবরাখবর রাখেন। কিন্তু কোথায় নটবর? তিনি কেন এতো দেরি করছেন?

বিব্রত সোমনাথ মুখ তুলে একবার আকাশের দিকে তাকালো। কোথাও এক টুকরো মেঘের ইঙ্গিত নেই। যদি আকাশে অনেক কালো মেঘ থাকতো; যদি বলা যেতো 'আসন্ন আষাঢ় ঐ ঘনায় গগনে'—তাহলে বেশ হতো। বাধাবন্ধনহীন বর্ষার প্রবল ধারায় সোমনাথ যদি নিজের অতীতকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে পারতো তাহলে মন্দ হতো না।

কিন্তু অতীতকে ভোলা তো দূরের কথা, সোমনাথের অনেক কিছু মনে আসছে। অতীত ও বর্তমান মিলেমিশে একাকার হয়ে সোমনাথের মানস-আকাশকে বর্ষার মেঘের মতো ছেয়ে ফেলেছে। সোমনাথ পথেই দাঁড়িয়ে থাকুক। চলুন আমরা ততক্ষণ ওর অতীত সম্পর্কে খোঁজখবর করি—ওর পারিবারিক জীবনের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় হোক আমাদের।

◆

⁂

যোধপুর পার্কে জলের ট্যাঙ্কের কাছে লাল রংয়ের ছোট্ট দোতলা বাড়িটার একতলার ঘরে ভোরবেলায় সোমনাথ যখন বিছানায় শুয়ে আছে তখনই ওকে ধরা যাক।

একটু আগেই তার ঘুম ভেঙেছে। কিন্তু নীল স্ট্রাইপ দেওয়া পাজামা আর হাতকাটা জালি গেঞ্জি পরে সোমনাথ এখনও পাশবালিশ জড়িয়ে চোখ বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে আছে।

সোমনাথের ঘরের বাইরেই এ-বাড়ির খাবার জায়গা। সেখানে চা তৈরির ব্যবস্থাও আছে। ওইখান থেকে চুড়ির ঠুং ঠুং আওয়াজ ভেসে আসছে। এই আওয়াজ শুনেই সোমনাথ বলে দিতে পারে, বড় বউদি অন্তত আধঘণ্টা আগে ঘুম থেকে উঠে পড়ে সংসারের কাজকর্ম শুরু করেছেন। কমলা বউদি এই সময় মিলের আটপৌরে শাড়ি পরেন, তাঁর পায়ে থাকে বাটা কোম্পানির লাল রংয়ের শিলপার। চায়ের কাপ নামানোর আওয়াজ ভেসে আসছে—সুতরাং লিকুইড পেট্রলিয়াম গ্যাসের উনুনে বউদি নিশ্চয় চায়ের কেটলি চাপিয়ে দিয়েছেন।

ভোরবেলায় এই বাড়ির চা দু'বউ-এর একজনকে তৈরি করতে হবে। কারণ, দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি দিনের প্রথম চায়ের কাপটা ঝি-চাকরের হাত থেকে তুলে নেওয়াটা পছন্দ করেন না।

এ-বাড়ির অপর বউ দীপান্বিতা ওরফে বুলবুলের ওপরও মাঝে মাঝে চা তৈরির দায়িত্ব পড়ে। সোমনাথের ছোটদা একদিন বড় বউদিকে বলেছিল, "তুমি রোজ-রোজ কেন ভোরবেলায় উঠবে? বুলবুলও মাঝে মাঝে কষ্ট করুক।"

কমলা বউদি আপত্তি করেননি, কিন্তু মুখ টিপে হেসেছিলেন। হাসবার কারণটা সোমনাথের অজানা নয়। ছোটদার বউ বুলবুল বেজায় ঘুমকাতুরে। ঘড়ির মান-সম্মান বাঁচিয়ে ভোরবেলায় বিছানা থেকে উঠে চা তৈরি করা ওর পক্ষে বেশ শক্ত ব্যাপার।

আজ তো সোমবার? সুতরাং বুলবুলেরই চা তৈরি করার কথা। কিন্তু চুড়ির আওয়াজ তো বুলবুলের নয়। বিছানায় শুয়ে শুয়েই, ব্যাপারটা বুঝতে পারলো সোমনাথ। ছোটদার শোবার ঘরের দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেলো এবার। সেই সঙ্গে বুলবুলের হাতের চুড়ির আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে।

বুলবুলের গলার স্বর একটু চড়া। এবার তার কথা শুনতে পাওয়া গেলো। "কি লজ্জার ব্যাপার বলুন তো? ঘুম থেকে উঠতে পনেরো মিনিট দেরি করে ফেললুম।"

কমলা বউদির কথাও সোমনাথের কানে আসছে। তিনি বুলবুলকে বললেন, "লজ্জা করে লাভ নেই। বাথরুমে গিয়ে চোখ-মুখ ধুয়ে এসো।"

স্বামীর প্রসঙ্গ তুলে বুলবুল বললো, "ও আমাকে ডেকে না দিলে এখনও ঘুম ভাঙতো না বোধহয়।"

"ঠাকুরপো তোমাকে তাহলে বেশ শাসনে রেখেছে! ভোরবেলায় একটু ঘুমোবার সুখও দিচ্ছে না!" কমলা বউদির রসিকতা সোমনাথের বিছানা থেকেই শোনা যাচ্ছে। ছোট দেওর যে এই সময় জেগে থাকতে পারে তা ওরা দুজনে আন্দাজ করতে পারেনি।

বুলবুলের বেশিদিন বিয়ে হয়নি। এ-বাড়ির কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে একটা স্বাভাবিক লজ্জাবোধ এখনও আছে। কমলাকে সে বললো, "ভাগ্যে আপনি উঠে পড়েছেন। না হলে কি বিশ্রী ব্যাপার হতো! চায়ের অপেক্ষায় বাবা বারান্দায় চুপচাপ বসে থাকতেন।"

চায়ের কাপ সাজানোর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কমলা বউদি বললেন, "অনেকদিনের অভ্যেস তো—ঠিক পৌনে ছ'টায় ঘুম ভেঙে গেলো। ছ'টা দশেও যখন কেটলি চড়ানোর আওয়াজ পেলাম না, তখন বুঝলাম তুমি বিছানা ছাড়োনি।"

বুলবুল বললো, "ভোরের দিকে আমার কী যে হয়! যত রাজ্যের ঘুম ওই সময় আমাকে ছেঁকে ধরে।"

কমলা বউদি অল্প কথার মানুষ—কিন্তু রসিকতা বোধ আছে পুরোপুরি। বললেন, "ঘুমের আর দোষ কি? রাত দুপুর পর্যন্ত বরের সঙ্গে প্রেমালাপ করবে, ঘুমকে কাছে আসতে দেবে না। তাই বেচারাকে শেষ রাতে সুযোগ নিতে হয়।"

কমলা বউদির কথা শুনে সোমনাথেরও হাসি আসছে। বুলবুলের সলজ্জ ভাবটা নিজের চোখে দেখতে ইচ্ছে করছে। হাজার হোক কলেজে একসময় বুলবুল ওর সহপাঠিনী ছিল। বুলবুল বলছে, "বিশ্বাস করুন, দিদিভাই, কাল সাড়ে-দশটার মধ্যে দুজনে ঘুমিয়ে পড়েছি।

এখন তো আর নবদম্পতি নই।"

কমলা বউদি ছাড়লেন না। "বলো কি? এখনও পুরো দু'বছর বিয়ে হয়নি, এরই মধ্যে বুড়ো-বুড়ি সাজতে চাও?"

"কী যে বলেন!" বুলবুল আরও কিছু মন্তব্য করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার কথা আর শোনা গেলো না। সোমনাথের কাছে বুলবুল যতই স্মার্ট হোক, গুরুজনদের কাছে সে বেশ নার্ভাস।

কমলা বউদি বললেন, "এ-নিয়ে লজ্জা পাবার কিছু নেই। বিছানায় শুয়ে শুয়ে বরের সঙ্গে মনের সুখে গল্প করবে এটা তোমার জন্মগত অধিকার। তাছাড়া, ভোরবেলায় ঘুম ভাঙলেও ঠাকুরপোর হয়তো তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছে করে না! বরের রিলিজ অর্ডার না পেলে তুমি কী করবে?"

"দাদা নিশ্চয় আপনাকে সকালবেলায় ছাড়তে চান না।" বুলবুল এবার পাল্টা প্রশ্ন করলো।

কমলা বউদি উত্তর দিতে একটু দেরি করছেন। বোধহয় চায়ের কাপগুলো শুকনো কাপড় দিয়ে মুছছেন—কিংবা লজ্জা পেয়েছেন। না, কমলা বউদি সামলে নিয়েছেন। অল্পবয়সী জা-কে ভয় দেখালেন, "বম্বেতে আজই প্রশ্ন করে পাঠাচ্ছি। লিখবো তোমার ভাদ্দর বউ জানতে চাইছিল!"

সোমনাথের চোখে আবার ঘুম নেমে আসছে। বাইরের কথাবার্তায় সে আর মনোযোগ দিতে পারছে না। কিন্তু কমলা ও বুলবুল তাদের আলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।

দাদাকে চিঠি লেখার প্রসঙ্গে বুলবুল বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেলো। সন্ত্রস্ত হরিণীর মতো মুখভঙ্গি করে বুলবুল বললো, "লক্ষ্মীটি দিদিভাই। দাদা এসব শুনলে, আমি ওঁর সামনে লজ্জায় যেতে পারবো না। আপনার কাছে মাপ চাইছি, কাল থেকে সময়মতো উঠবোই..."

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল বুলবুল। কিন্তু কমলা চাপা অথচ শান্ত গলায় জা-এর বক্তব্যের শূন্যস্থান পূরণ করলো, "তার জন্যে যদি রাত্রিবেলায় বরের সঙ্গে প্রেম বন্ধ রাখতে হয় তাও!"

এবার কেটলি নামিয়ে কমলা মেপে-মেপে কয়েক চামচ চা চীনেমাটির পটে দিলো, আর একটা বাড়তি চামচ চা দিলো পটের জন্যে। কমলা তারপর বুলবুলকে বললো, "ছোটবেলা থেকে আমার সকালে ঘুম ভেঙ্গে যায়। সুতরাং তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। সকালে বাবাকে আমিই চা করে দেবো।"

বুলবুলের মুখে কৃতজ্ঞতার রেখা ফুটে উঠেছিল। তবু সে আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল। কিন্তু কমলা বললো, "বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে জল দিয়ে এসো। ঘুম ভেঙে বউ-এর চোখে পিঁচুটি দেখলে বর মোটেই খুশী হবে না।"

বুলবুল বাথরুমে চলে গেলো। কমলা চটপট এক কাপ চায়ে দুধ মেশালো। তারপর মাথায় ঘোমটা টেনে, শাড়ির আঁচলটা ঠিক করে নিয়ে, একটা প্লেটে দু'খানা নোনতা বিস্কুট বার করে শ্বশুরমশায়ের উদ্দেশ্যে দোতলায় চললো।

দোতলায় মাত্র একখানা ঘর। সেই ঘরে একমাত্র দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি থাকেন। ভোরবেলায় কখন যে তিনি ঘুম থেকে উঠে পড়েছেন কেউ জানে না।

সকালবেলায় প্রাত্যহিক হাঙ্গামা সেরে দক্ষিণের ব্যালকনিতে দ্বৈপায়ন শান্তভাবে বসে রয়েছেন। বাড়ির পূর্ব দিকটা এখনও খোলা আছে। সেদিক থেকে ভোরবেলায় মিষ্টি রোদ সলজ্জভাবে উঁকি মারছে। বাবা সেইদিকে চুপচাপ তাকিয়ে রয়েছেন। কমলার ধারণা, বাবা এই সময়ে মনে মনে ঈশ্বরের আরাধনা করেন।

চায়ের কাপ নামিয়ে সনম্র কমলা বাবাকে প্রণাম করলো। পায়ের ধুলো নিতে গেলে গোড়ার দিকে বাবা আপত্তি করতেন—এখন মেনে নিয়েছেন। বধূমাতাকে তিনি প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন।

কমলা বললো, "সকালবেলায় একটু বেড়ানো অভ্যেস করুন না।"

দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি বললেন, "করবো ভাবছি। কিন্তু শরীরে ঠিক জুত পাই না।"

শ্বশুরের উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারলো না কমলা। তাঁকে মনোবল দেবার জন্যে সে বললো, "আমার বাবাও প্রথমে বেরোতে চাইতেন না। এখন কিন্তু সকালে বেড়িয়ে খুব আরাম পাচ্ছেন। বাতের ব্যথা কমেছে। খিদে হচ্ছে।"

দ্বৈপায়ন বললেন, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো না বউমা।"

এক সময় শ্বশুরমশায় গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কারুর সঙ্গে বড় একটা কথা বলতেন না। কিন্তু স্ত্রী বিয়োগের পর কী যে হলো—বেশ পাল্টে গেলেন। এখন বড় বউমার সঙ্গে অনেক কথা বলেন—প্রায় আড্ডা জমিয়ে ফেলেন মাঝে মাঝে।

আট বছর আগেও এই বাড়ির সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন প্রতিভা দেবী। কাজে কর্মে ও প্রাণোচ্ছল কথাবার্তায় তিনি একাই ব্যানার্জি পরিবারের সমস্ত কিছু পরিপূর্ণ রেখেছিলেন। দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি নিজেই কমলাকে বলেছিলেন, "তোমার শাশুড়ী যে বলতেন এ-বাড়িতে তিনিই ভাগ্যলক্ষ্মীকে এনেছেন তা মোটেই মিথ্যে নয়।"

এর পরেই শ্বশুরমশায় ডুবে যেতেন পুরানো দিনের গল্পে। কমলাকে বলতেন, কেমন করে ওঁদের বিয়ে হলো—ছোটবেলায় প্রতিভা কী রকম একগুঁয়ে ছিলেন—দ্বৈপায়নের সঙ্গে ঝগড়া হলে শাশুড়ীর কাছে কীভাবে স্বামীর নামে লাগাতেন।

আজও বাবা বোধহয় বউমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান। আর এই ভোরবেলাটাই ওঁর যত কথা বলার সময়। চায়ে চুমুক দিয়ে দ্বৈপায়নের খেয়াল হলো বউমার নিজের হাতে চায়ের পেয়ালা নেই। ব্যস্ত হয়ে তিনি বললেন, "ওহো, তোমাদের চা বোধহয় নিচের টেবিলে ঠাণ্ডা হচ্ছে। আমার মনে থাকে না যে প্রথমে আমার জন্যে বিনা চিনিতে চা তৈরি করো। তারপর অন্যদের চা-এ চিনি মেশানো হয়। তুমি বরং চায়ের হাঙ্গামা শেষ করে এসো বউমা। ইচ্ছে করলে নিজের কাপটা এনে এখানে বসতে পারো।"

কমলা বললো, "না-হয় একটু দেরি হবে। এখনও তো কেউ ওঠেনি।"

বাবা রাজী হলেন না। বললেন, "না, মেজ বউমা নিশ্চয় তোমার জন্যে বসে আছে। তোমার শাশুড়ী এই জন্যে আমাকে বকাবকি করতেন। বলতেন, সংসারটা কেমনভাবে চলছে তুমি মোটেই খোঁজ রাখো না। তুমি নিজের খেয়ালেই বুঁদ হয়ে থাকো।"

শ্বশুরের কথা অমান্য করতে পারলো না কমলা। বাবাকে যে কমলা খুব ভালোবাসে তা ওর ভাবভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায়। বাড়ির সবার সঙ্গেই দ্বৈপায়নের একটু দূরত্ব আছে—যে একজন কেবল খুব কাছাকাছি চলে আসতে পারে সে কমলা।

আরামকেদারায় অর্ধশায়িত অবস্থায় দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি অপসৃয়মান কমলার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে রইলেন। শুধু নামে নয়, আসল কমলাকেই একদিন প্রতিভা পছন্দ করে এই বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। প্রতিভা বোধহয় জানতেন তিনি এখানে চিরদিন থাকবেন না।

যোধপুর পার্কের পুব-পশ্চিমমুখো রাস্তাটা এই বারান্দা থেকে পুরো দেখা যায়। দু-একজন পথচারী গভরমেন্টের দুধের বোতল হাতে এই পথ দিয়ে যেতে-যেতে ব্যালকনির আরামকেদারায় সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বৈপায়নকে লক্ষ্য করছে। এই বাড়ির মালিককে তারা বোধহয় হিংসে করছে। বাড়িটা ছোট হলেও ছিমছাম—সর্বত্র রুচির পরিচয় ছড়িয়ে আছে। সে-কৃতিত্ব অবশ্য দ্বৈপায়ন ব্যানার্জির নয়—প্রতিভা এবং বড় ছেলে সুব্রতর। আই-আই-টিতে এক মাস্টারমশায়কে দিয়ে সুব্রত নকশা আঁকিয়েছিল। দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি ভেবেছিলেন বিলেত-ফেরত আর্কিটেক্টের ওই নকশা অনুযায়ী বাড়ি করতে অনেক খরচ লাগবে—রাজ্য সরকারের সাধারণ চাকরি করে এতো টাকা কোথায় পাবেন তিনি?

প্রতিভা কিন্তু দ্বৈপায়নের কোনো আপত্তি শোনেননি। নির্দ্বিধায় স্বামীকে মুখ-ঝামটা দিয়েছিলেন। ওঁরা তখন থাকতেন টালিগঞ্জের একটা সরকারী রিকুইজিশনকরা ফ্ল্যাটবাড়িতে। প্ল্যান দেখে দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি বলেছিলেন, "ভোম্বল, এসব বাড়ি বিলেতে আমেরিকায় চলে। কলকাতা শহরে জমিই কিনতে পারতাম না—নেহাত সরকারী কো-অপারেটিভ থেকে

জলের দামে আড়াই কাঠা দিলো তাই। সে দামটাও তো শোধ করেছি মাসে মাসে মাইনে থেকে।"

প্রতিভা বলেছিল, "তুমি এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো কেন? আমি আর ভোম্বল যা পারি করবো। ভোম্বল তো তোমার মতো আনাড়ি নয়—ভালোভাবে আই-আই-টি থেকে পাস করেছে।"

কমলার তখন সদ্য বিয়ে হয়েছে। তখন থেকেই সে একটু শ্বশুরের দিকে ঝুঁকে কথা বলে। সে বলেছিলো, "টাকাটা তো বাবাকেই বার করতে হবে।" শাশুড়ীকে বলেছিল, "বাবার কত অভিজ্ঞতা। কত আদালতে কত লোককে দেখেছেন।"

বউমার সঙ্গে প্রতিভা একমত হতে পারেননি। জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, "শুধু বস্তা বস্তা রায় লিখেছে কোর্টে বসে—কিন্তু কোনো কাণ্ডজ্ঞান হয়নি। সারাজন্ম আমাকেই চালিয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে তোমার শ্বশুরমশাইকে। যোধপুর পার্কের এই জমিটুকুও কেনা হতো না—যদি-না পুলিন রায়ের কাছে খবর পেয়ে আমি রাইটার্স বিল্ডিংস-এ ওঁকে পাঠাতাম। উনি সব ব্যাপারেই হাত গুটিয়ে বসে আছেন। জীবনে করবার মধ্যে একটা কাজ করেছিলেন, রিপন কলেজ থেকে আইনের ডিগ্রি নিয়ে বি সি এস পরীক্ষায় বসেছিলেন।"

দ্বৈপায়ন ব্যানার্জির মনে আছে স্ত্রীর কথা শুনে প্রথমে তিনি মিটমিট করে হেসেছিলেন। তারপর বউমার সামনেই স্ত্রীকে জেরা করেছিলেন, "প্রতিভা, আর কোনো কাজের কাজ করিনি?"

গৃহিণী সস্নেহে কিন্তু প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন, "পরীক্ষায় পাস-দেওয়া ছাড়া সারাজীবনে তুমি আর কিছুই করোনি!"

আড়চোখে নববিবাহিতা পুত্রবধূর দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে দ্বৈপায়ন বলেছিলেন, "বউমাকে আমি সালিশী মানছি।"

তারপর আস্তে-আস্তে অর্ধাঙ্গিনীকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, "চাকরির জন্যে পরীক্ষায় পাস করা ছাড়াও আর একটা কাজ করেছিলাম—তোমাকে এ-বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম।"

কমলা আন্দাজ করেছিল, বাবার এই সগর্ব ঘোষণায় মা খুব খুশী হবেন। হয়তো পুত্রবধূর সামনে লজ্জা পাবেন। কমলা তাই কোনো একটা ছুতোয় সেখান থেকে সরে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ী কেউ যেতে দিলেন না। তাঁদের মেয়ে নেই—তাই কমলার ওপর স্নেহ একটু বেশি।

চোখে-মুখে আনন্দের ভাবটা ইচ্ছে করে চাপা দিয়ে প্রতিভা দেবী ঝগড়ার মেজাজে বলেছিলেন, "একেবারে বাজে কথা।" তারপর কমলার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "এ'র কোনো কথা বিশ্বাস কোরো না বউমা। তুমি শুনে রাখো, যদি কারুর জন্যে এ-বাড়িতে বউ হয়ে থাকতে পারি, সে আমার পুঁটে মামার জন্যে। দেড় বছর মামা ওঁর পিছনে লেগেছিলেন, আর উনি নানান ছুতোয় মামাকে অন্তত দুশোবার ঘুরিয়েছেন! পুঁটে মামার অসীম ধৈর্য না থাকলে আমার বিয়েই হতো না। আমি তখনই ঠিক করেছিলাম, আমার ছেলের বিয়ের সময় মেয়ের বাবাকে একেবারেই ঘোরাবো না।"

"করেছেনও তো তাই," কমলা এবার শাশুড়ীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল। এ-বাড়িতে বধূ হিসাবে মেয়েকে পাঠাতে তার বাবা-মাকে মোটেই কষ্ট করতে হয়নি। সামান্য এক সপ্তাহের মধ্যে সব কথাবার্তা পাকাপাকি হয়েছিল।

প্রতিভা দেবী বলেছিলেন, "তোমার বিয়ের ব্যাপারে উনি অবশ্য কথার অবাধ্য হননি। ভোম্বল একবার আপত্তি তুলতে গিয়েছিল, একটু সময় দাও, ভেবে দেখি। কিন্তু এমন বকুনি লাগিয়েছিলাম যে আর কথা বাড়াতে সাহস পায়নি। কলেজে অমন শক্ত শক্ত সব পরীক্ষায় উত্তর লিখতে তিন ঘণ্টার বেশি সময় দেয় না—আর সামান্য একটা বিয়ের ব্যাপারে মতামত জানাতে হাজার দিন সময় চাই কেন?"

"বিয়েটা সামান্য নয়, প্রতিভা," দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি পুত্রবধূর সামনেই গৃহিণীর সঙ্গে রসিকতা করেছিলেন।

প্রতিভা এবার অরিজিন্যাল বিষয়ে ফিরে এসেছিলেন। বলেছিলেন, "বিয়ের তিরিশ বছর পরে রহস্যটা বুঝে তো লাভ নেই, এখন বাড়ি সম্বন্ধে যা বলছি শোনো। তোমাকে এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তোমার ব্যাঙ্কের পাশ বই আমার কাছেই আছে। প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং ইনসিওর থেকে কত টাকা পাবে তাও আমি পুলিনকে দিয়ে হিসেব করিয়েছি। ভোম্বলের নকশা অনুযায়ীই বাড়ি হবে। ছোট বাড়ি হোক, লোক যেন দেখলে খুশী হয়। বউমাকে তুমি যতই নিজের দলে টানো, আমি আর ভোম্বল যা করবো তাই হবে। তোমার কোনো কথায় কখনও কান দিইনি, এখনও দেবো না।"

দ্বৈপায়ন হেসে বলেছিলেন, "ঠিক আছে। বাড়িতে যখন আমার কোনো কথাই চলবে না, তখন বাড়ির বারান্দায় বসে যাতে নিজের কথা ভাবতে পারি এমন ব্যবস্থা যেন থাকে।"

"রিটায়ার করে তুমি যাতে নিজের খেয়াল মতো বসে থাকতে পারো তার ব্যবস্থা তো রাখা হয়েছে—বারান্দা নয়, দোতলায় রীতিমতো ব্যালকনি তৈরি হবে তোমার জন্যে।" প্রতিভার কথাগুলো এখনও কানে বাজছে দ্বৈপায়নের। সেই বাড়ি উঠলো, সেই ব্যালকনি রয়েছে—শুধু প্রতিভা নেই। দ্বৈপায়নের রীতিমতো সন্দেহ হয়, এমন যে হবে প্রতিভা জানতো। তাই আগে থেকে সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

ব্যালকনি থেকে দ্বৈপায়ন আবার যোধপুর পার্কের রাস্তার দিকে তাকালেন। পথচারীরা ওঁর দিকে নজর দিয়ে হয়তো কত কী ভাবছে। আন্দাজ করছে, বৃদ্ধ ভদ্রলোক সব দিকে সফল হয়ে এখন কেমন নিশ্চিন্ত মনে স্বোপার্জিত অবসরসুখ ভোগ করছেন।

এ-রকম ভুল বুঝবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। বিশেষ করে বাড়ির সামনে সুদৃশ্য বোর্ডে নামের তালিকা দেখলে। নেমপ্লেটে প্রথমেই দ্বৈপায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম লেখা—সকলেই জানে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস থেকে অবসরপ্রাপ্ত। তারপরেই সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, খড়্গপুরের এম-ই। তারপর অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট। এখন তো চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্টদেরই যুগ। হিসাবেই তো শিব! অভিজিতের পরে সোমনাথের নামটাও ওখানে লেখা আছে।

ছোটছেলে সোমনাথের কথা মনে আসতেই দ্বৈপায়ন কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। যোধপুর পার্কের এই ছবির মতো সুখের সংসারে ছোট ছেলেটাই ছন্দপতন ঘটিয়েছে। সুব্রত ও অভিজিৎ দুজনেই স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় ভালো ফল করেছিল। সুব্রত তো অঙ্কে লেটার পেয়েছিল। অভিজিৎ ছোকরার নাম যে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় স্কলারশিপ-লিস্টে উঠবে তা দ্বৈপায়ন বা প্রতিভা দেবী কেউ কল্পনা করতে পারেননি। অথচ অভিজিৎ সম্বন্ধে প্রতিভার বেশি চিন্তা ছিল—ছোকরা মাত্রাতিরিক্ত আড্ডা দিতো, সময়মতো পড়াশোনায় বসতো না, বুঁদ হয়ে রেডিও সিলোনে হিন্দী সিনেমার গান শুনতো।

অভিজিৎকে প্রতিভা বলতেন, "তোর কপালে অনন্ত দুর্গতি আছে। গেরস্ত বাঙালীর ঘরে পড়াশোনার জোরটাই একমাত্র জোর—আর কিছুই নেই তোদের! তুই এখন লেখাপড়া করছিস না, পরে বুঝবি।"

অভিজিৎ, ওরফে কাজল ফিকফিক করে হাসতো। কোনো কথাই শুনতো না। পরীক্ষার রেজাল্ট যখন বেরুল তখন প্রতিভা বিশ্বাসই করতে পারেন না, কাজল স্কলারশিপ পেয়েছে। ছেলেটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে পুরানো কায়দায় ঠোঁট টিপে হাসছিল।

প্রতিভা বলেছিলেন, "দূরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আয় কাছে আয়।" তারপর ছেলেকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেয়েছিলেন। লজ্জা পেয়ে কাজল তখন মায়ের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। প্রতিভা বলেছিলেন, "শুধু শুধু আমাকে এতোদিন ভাবিয়ে কষ্ট দিলি।"

সেই সব দিনের কথা ভেবে দ্বৈপায়নের মনে হাসি আসছিল। প্রতিভার খুব বিশ্বাস ছিল ছোটছেলের ওপরে। সোমনাথ মায়ের কথা শুনতো। ছোট বয়স থেকেই সোমনাথ খুব শান্ত। পড়ায় বসাবার জন্যে মাকে কখনও বকাবকি করতে হতো না। সন্ধ্যা হওয়া-মাত্র হাত-পা ধুয়ে পড়ার টেবিলে চলে যেতো খোকন। নিজের মনে পড়ে যেতো, মা ডাকলে তবে উঠে এসে চায়ের পেয়ালা নিতো। রাত্রে খাবার তৈরি হলে প্রতিভা ডাকতেন, বই-পত্তর গুছিয়ে

রেখে খোকন খেতে বসতো। প্রতিভা বলতেন, "খোকনকে নিয়ে আমাকে একটুও ভাবতে হবে না।"

হাসলেন দ্বৈপায়ন। এখন যত ভাবনা সেই খোকনকে নিয়েই। তবে প্রতিভা একদিকে ঠিকই বলেছিলেন। সোমনাথের ভাবনা প্রতিভাকে একটুও ভাবতে হচ্ছে না। সমস্ত দায়-দায়িত্ব দ্বৈপায়নের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তিনি অসময়ে বিদায় নিয়েছেন।

ওপরের ব্যালকনিতে চায়ের কাপে দ্বৈপায়ন যখন চুমুক দিলেন তখন সোমনাথ একতলায় নিজের বিছানায় আর একবার পাশ ফিরে শুলো।

সোমনাথেরও এই মুহূর্তে মায়ের কথা মনে পড়ে গেলো। মা সত্যিই আদরের ছোটছেলের ওপর অগাধ আস্থা রেখেছিলেন। মায়ের ভরসা ছিল, ছোটছেলে বাড়ির সেরা হবে। তাই সেবার যখন সেই দাড়িওয়ালা শিখ গণৎকার টালিগঞ্জের বাড়িতে যা-তা ভবিষ্যদ্বাণী করে গেলো তখন মা ভীষণ চটে গেলেন। সেই তারিখটা সোমনাথ বলে দিতে পারে—কারণ সেদিন ছিল সোমনাথের জন্মদিন। হাতে কিছু কাগজপত্তর নিয়ে শিখ গণৎকার তাদের দরজায় এসে কলিং বেল টিপেছিল।

বাড়িতে তখন মা এবং সোমনাথ ছাড়া আর কেউ ছিল না। দাদারা কলেজ বেরিয়েছে, বাবা অফিসে। সোমনাথ শুধু স্কুলে যায়নি—জন্মদিনে মায়ের কাছে আবদার করেছিল, "আজ তোমার কাছে থাকবো মা।" মা এমনিতে বেজায় কড়া কিন্তু ছোটছেলের জন্মদিনে নরম হয়েছিলেন। বেল বাজানো শুনে মা নিজেই দরজা খুলতে এসে গণৎকারের দেখা পেলেন।

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে গণৎকার চটপট বললো, "তুই গণনায় বিশ্বাস করিস না। কিন্তু তোর মুখ দেখে বলছি আজ তোর খুব আনন্দের দিন।"

সেই কথা শুনেই মায়ের খানিকটা বিশ্বাস হলো। গণকঠাকুরকে বাইরের ঘরে বসতে দিলেন। বললেন, "আমার হাত দেখাবো না। আমার ছেলের ভাগ্যটা পরীক্ষা করিয়ে নেবো।" এই বলে মা সোমনাথকে ডাকলেন।

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে, বিড়বিড় করে কী সব হিসেব-পত্তর সেরে শিখ বললো, "বেটী তোর তিনটে ঘড়া আছে।" ঘড়া বলতে গণকঠাকুর যে ছেলেদের কথা বলছেন তা মায়ের বুঝতে দেরী হলো না। গণনা মিলে যাচ্ছে বলে একটু আনন্দও হলো। কিন্তু এবার গণৎকার চরম বোকামি করে বসলো। বললো, "তোর প্রথম দুটো ঘড়া সোনার—আর ছোটটা মাটির।"

শোনা মাত্রই মায়ের মেজাজ বিগড়ে গেলো। ইতিমধ্যে সোমনাথ সেখানে এসে পড়েছে। কিন্তু মা তখন গণকঠাকুরকে বিদায় করছেন, বলছেন, "ঠিক আছে, আপনাকে আর হাত দেখতে হবে না।"

গণকের কথা মা বিশ্বাসই করতে চাননি। তাঁর ধারণা, তাঁর তিনটে ঘড়াই সোনার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হলো?

সোমনাথ আর একবার পাশ ফিরলো। একটা মশা পায়ের কাছে জ্বালাতন করছে। অনেকগুলো দুশ্চিন্তা মাথার ভিতর জট পাকাচ্ছে এবং মাঝে মাঝে মশার মতো পোঁ-পোঁ আওয়াজ করছে। চাকরির বাজারে কী যে হলো—এতো চেষ্টা করেও সামান্য একটা কাজ জোটানো গেলো না।

সোমনাথ হয়তো বড়দা এবং ছোটদার মতো ব্রিলিয়াণ্ট নয়, হয়তো সে স্কুল ফাইনালে ওদের মতো ফার্স্ট ডিভিসন পায়নি। কিন্তু যেসব ছেলে সেকেন্ড কিংবা থার্ড ডিভিসনে পাস করেছে তাদের কি এদেশে বাঁচবার অধিকার নেই? তারা কি গঙ্গার জলে ভেসে যাবে?

গত আড়াই বছরে অন্তত কয়েক হাজার চাকরির অ্যাপ্লিকেশন লিখেছে সোমনাথ—কিন্তু ওই আবেদন-নিবেদনই সার হয়েছে। আজকাল, সত্যি বলতে কি চাকরির ব্যাপারটা আর ভাবতেই ইচ্ছে করে না সোমনাথের। কোনো লাভ হয় না, মাঝখান থেকে মেজাজটা খারাপ হয়ে যায়।

আবার একটু ঘুমের ঘোর আসছে সোমনাথের।

সোমনাথের মনে হচ্ছে চাকরির উমেদারী এবার শেষ হলো। ধবধবে সাদা শার্ট-প্যান্ট এবং নীল রংয়ের একটা টাই পরে সোমনাথ প্রখ্যাত এক বিলিতী কোম্পানির মিটিং রুমে বসে আছে। দিশী সায়েবরা ইন্টারভিউ নিচ্ছেন। তাঁরা একের পর এক প্রশ্নবাণ ছাড়ছেন, আর সোমনাথ অবলীলাক্রমে সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। একজন অফিসার তারই মধ্যে বললেন, "মিস্টার ব্যানার্জি, আপনি রিট্‌ন পেপারে ফরেন ক্যাপিটাল সম্পর্কে খুব সুন্দর উত্তর লিখেছেন। এ-বিষয়ে আরও দু-একটা কথা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই।" ভদ্রলোকের প্রস্তাবে সোমনাথ একটুও ভয় পাচ্ছে না। কারণ ফরেন ক্যাপিটাল সম্পর্কে সব রকম সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর সোমনাথের মুখস্থ আছে।

ইন্টারভিউ শেষ করে সৌজন্যমূলক ধন্যবাদ জানিয়ে সোমনাথ বেরিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় সুন্দরী এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সেক্রেটারী মিটিং রুমের বাইরে ওর পথ আটকালো। বললো, "মিঃ ব্যানার্জি, আপনি চলে যাবেন না—রিসেপ্‌শন্‌ হল্‌-এ একটু অপেক্ষা করুন।"

মিনিট পনেরো পরে সোমনাথের আবার ডাক হলো। পার্সোনেল অফিসার অভিনন্দন জানালেন এবং করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "বুঝতেই পারছেন, আমরা আপনাকেই সিলেক্ট করেছি। দু-একদিনের মধ্যেই জেনারেল ম্যানেজারের সই করা চিঠি পাবেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাওয়া মাত্রই আমাদের জানিয়ে দেবেন, কবে কাজে যোগ দিতে পারবেন!"

সেই চিঠিটার জন্যেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সোমনাথ। কখন কমলা বউদি ঘরে টোকা দেবেন, হাসি মুখে বলবেন, "নাও তোমার চিঠি এইমাত্র পিওন দিয়ে গেলো।"

সত্যিই দরজায় টোকা পড়ছে। সোমনাথের ঘুম ভেঙে গেলো। চুড়ির আওয়াজেই সোমনাথ বুঝতে পারছে কে ধাক্কা দিচ্ছে। তাহলে এই ইন্টারভিউ-এর ব্যাপারটাই মিথ্যা—ভোরবেলায় সোমনাথ এতোক্ষণ ধরে স্বপ্ন দেখছিল।

সোমনাথ দরজা খুলে দিলো। মেজদার বউ বুলবুল দাঁড়িয়ে রয়েছে। বুলবুলের সঙ্গে সোমনাথের একটু রসিকতার সম্পর্ক। ওঁরা একসঙ্গে চার বছর কলেজে পড়েছে। বুলবুল বললে, "গুড মর্ণিং। পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল। আর কতক্ষণ ঘুমুবে?"

মুখ গম্ভীর করে সোমনাথ শুয়ে রইলো। মনে মনে বললে, "বেকার মানুষ সকাল-সকাল উঠেই বা কী করবো?"

বুলবুল বললে, "দিদির হুকুম, সোমকে তুলে দাও।"

"বউদি কোথায়?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো।

"বউদি এখন নিজের কাজে ব্যস্ত।"

সোমনাথ একমত হলো না। "বউদির একমাত্র ছেলে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল রয়েছে। বউদির কর্তাটি বেশ কিছুদিন অফিসের কাজে কলকাতার বাইরে। সুতরাং বউদি এখন নিজের কাজে কি করে ব্যস্ত থাকবেন?"

বুলবুল ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো, "দাঁড়াও, দিদিকে রিপোর্ট করছি। কর্তা ছাড়া আমাদের বুঝি কোনো কাজকর্ম নেই।"

সোমনাথ অধৈর্য কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "আঃ! বলো না বউদি কোথায়?"

বুলবুল হেসে বললো, "আমিও তো তোমার বউদি।"

সোমনাথ বললো, "তোমাকে তো আমি এখনও বউদি বলে রেকগনাইজ করি নি। দাদার বউ হলেই বউদি হওয়া যায় না বুঝলে?"

"তবে কী হওয়া যায়?" সহাস্যে বুলবুল চোখ দুটো বড় বড় করে জানতে চাইলো।

"সে সব তোমাকে বোঝাতে অনেক সময় লাগবে," সোমনাথ উত্তর দিলো। "সময় মতো বলা যাবে। এখন বলো বউদি কোথায়?"

বুলবুল বললো, "দিদি দোতলার ব্যালকনিতে বসে বাবার সঙ্গে কথা বলছেন। মাথায় অনেক দায়িত্ব, হাজার হোক বাড়ির বড় গিন্নি তো।"

সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো, "তোমার কর্তা [illegible] থেকে উঠেছে?"

"কোন্ সকালে উঠে পড়েছে। অফিসে কী সব জরুরী মিটিং আছে, এখনই গাড়ি আসবে। তাই বাথরুমে ঢুকেছে।"

বুলবুল আরও জানালো, "ওর অফিসে কী যে হয়েছে! শুধু কাজ আর কাজ। লোকটাকে খাটিয়ে খাটিয়ে মারছে।" সোমনাথের জন্যে বুলবুল এবার চা আনতে গেলো।

অফিসে এই খাটিয়ে মেরে ফেলার প্রসঙ্গটা সোমনাথের ভালো লাগলো না। চাকরি পেলে অফিসে খুব খাটতে হাজার হাজার বেকারের মোটেই আপত্তি নেই। চাকরিওয়ালা লোকগুলো বেশ আছে। চাকরি করছো এই না যথেষ্ট—তবু মন ওঠে না, কাজেও আপত্তি।

* * *

চা খেয়ে সোমনাথ চুপচাপ বসেছিল। কী করবে ভেবে ঠিক করতে পারছিল না। হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া বেকারদের কীই-বা করবার আছে।

কমলা বউদি ওপর থেকে ইংরিজি খবরের কাগজখানা নামিয়ে আনলেন। সোমনাথ দেখলো, বাবা ইতিমধ্যেই কয়েকটা চাকরির বিজ্ঞাপনে লাল পেন্সিলের মার্কা দিয়েছেন। বাবার এইটাই প্রাত্যহিক কাজ। খবরের কাগজে প্রথম পাতায় চোখ না-বুলিয়ে বাবা সর্বপ্রথম দ্বিতীয় পাতায় 'চাকরি খালি' শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনগুলো পড়ে ফেলেন। প্রয়োজন মতো লাল দাগ মারেন। বিজ্ঞাপনগুলো তখন কাটেন না, কারণ বাড়ির অন্য লোকেরা কাগজ পড়বে। দুপুরে খাবার পর কমলা বউদি আবার খবরের কাগজগুলো বাবার কাছে পৌঁছে দেন। বাবা নিজের হাতে ব্লেড দিয়ে বিজ্ঞাপনগুলো কেটে সোমনাথের কাছে পাঠিয়ে দেন।

কমলা বউদির ইচ্ছে নয় সোমনাথ চুপচাপ বাড়িতে বসে সময় কাটায়। তাই প্রায় জোর করেই একবার ওকে গড়িয়াহাট বাজারে পাঠালেন। বললেন, "তোমার দাদা নেই—শ্রীমান ভজহরির ওপর প্রত্যেকদিন নির্ভর করতে সাহস হয় না। বেশি দাম দিয়ে খারাপ জিনিস নিয়ে আসে। ওর দোষ নয়, গরীব মানুষ দেখলে আজকাল দোকানদাররাও ঠকায়।"

পাজামার ওপর একটা পাঞ্জাবী গলিয়ে সোমনাথ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। হাতে থলে নিয়ে যে সোমনাথ গড়িয়াহাট বাজার থেকে পুকুরের বাটা মাছ কিনছে তা দেখে কে বলবে বাংলার লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য বেকারদের সে একজন? জিনিসপত্তর কিনতে কিনতে অনেকে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অফিস যাবার মতো যথেষ্ট সময় আছে কিনা দেখে নিচ্ছেন। সোমনাথের কীরকম অস্বস্তি লাগছে—ওর যে অফিসে যাবার তাড়া নেই তা লোকে বুঝুক সে মোটেই চায় না।

কলেজে পড়বার সময়ে সোমনাথ কতবার বাজার করেছে। কিন্তু কখনও এই ধরনের অস্বস্তি অনুভব করেনি। পরিচিত কারুর সঙ্গে বাজারে বা রাস্তায় দেখা হলে তার ভালোই লেগেছে। কিন্তু এখন দূর থেকে কাউকে দেখলেই সে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। কারণ আর কিছু নয়, লোকে বেমালুম জিজ্ঞেস করে বসে, "কী করছো?" যতদিন কলেজের খাতায় নাম ছিল, ততদিন উত্তর দেবার অসুবিধা ছিল না। যত মুশকিল এখনই।

যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধে হয়। বাজারের গেটের কাছেই সোমনাথ শুনতে পেলো, "সোমনাথ না? কী ব্যাপার তোমার, অনেকদিন কোনো খবরাখবর নেই!"

সোমনাথ মুখ তুলে দেখলো অরবিন্দ সেন। ওদের সঙ্গেই কলেজে পড়তো। অরবিন্দ নিজেই বললো, "ইউ উইল বি গ্ল্যাড্ টু নো বেস্ট্-কীন-রিচার্ডসে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি হয়েছি। এখন সাতশ' দিচ্ছে। গড়িয়াহাট মোড় থেকে মিনিবাসে কোম্পানির ফ্যাকটরিতে নিয়ে যায়। এখানে সাড়ে-সাতটার সময় আমাকে রোজ দেখতে পাবে। রাস্তার ওপারে দাঁড়াই—সিগারেট কেনবার জন্যে ভাগ্যিস এইপারে এসেছিলাম তাই তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো।"

সোমনাথ দেখলো অরবিন্দের হাতে গোল্ড ফ্লেক সিগারেটের প্যাকেট। "খাবে নাকি একটা?" অরবিন্দ প্যাকেট এগিয়ে দিলো।

সোমনাথ সিগারেট নিলো না। অরবিন্দ হেসে ফেললো। "তুমি এখনও সেই ভালো ছেলে রয়ে গেলে? মেয়েদের দিকে তাকালে না, সিগারেট খেলে না, অশ্লীল ম্যাগাজিন পড়ো না।"

অরবিন্দ এবার জিজ্ঞেস করে বসলো, "তুমি কী করছো?"

সোমনাথ অত্যন্ত লজ্জা বোধ করছে। দিস্তে দিস্তে চাকরির অ্যাপ্লিকেশন লেখা ছাড়া সে যে আর কিছুই করছে না তা জানাতে মাথা কাটা যাচ্ছে সোমনাথের। কোনো রকমে আমতা আমতা করে বলতে যাচ্ছিল, "দেখা যাক্, ধীরে সুস্থে কী করা যায়।"

কিন্তু তার আগেই অরবিন্দ বললো, "চেপে রাখবার চেষ্টা করছো কেন ভাই? শুনলাম, ফরেনে যাবার প্রোগ্রাম করে ফেলেছো? তা ভাই, ভালোই করছো। আমরা এই ভোর সাড়ে-সাতটার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে, পাঁচ বছর কারখানায় তেল-কালি মেখে বেস্ট-কীন-রিচার্ডসের জুনিয়ার অফিসার হবো। আর তুমি তিন বছর পরে ফরেন থেকে ফিরে এসে হয়তো বেস্ট-কীনেই আমার বস্ হয়ে বসবে।"

ফরেন যাবার কথাটা যদিও পুরোপুরি মিথ্যে, তবুও সোমনাথের মন্দ লাগছে না। "কে বললো তোমাকে?" সোমনাথ প্রশ্ন করলো।

"নাম বলতে পারবো না—তবে তোমারই কোনো ফ্রেন্ড," অরবিন্দ উত্তর দিলো।

"গার্ল ফ্রেন্ডও হতে পারে," এই বলে অরবিন্দ এবার রহস্যজনকভাবে হাসলো। "বেশ গোপনে কাজটা সেরে ফেলবার চেষ্টা করছো তুমি," বললো অরবিন্দ।

দূর থেকে বেস্ট-কীন-রিচার্ডসের ঝকঝকে মিনিবাস আসতে দেখে অরবিন্দ বললো, "তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। দু-একদিনের মধ্যেই তোমার সঙ্গে দেখা করবার প্রয়োজন হবে। সামনের রবিবারে বিকেলটা ফ্রি রেখো। কারণটা যথা সময়ে জানতে পারবে। তোমার বাড়ির নম্বর?"

সোমনাথ বাড়ির নম্বরটা বলে দিলো। অরবিন্দ ততক্ষণে ছুটে গিয়ে মিনিবাস ধরে ফেলেছে।

বাজারের থলিটা বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে বসে সোমনাথ ভাবছিল ফরেন যেতে পারে শুনে অরবিন্দ সেন বেশ খাতির করে কথা বললো। ওর বাবা কেন্দ্রীয় সরকারের বড় অফিসার। ছোট একটা গাড়ি ড্রাইভ করে কলেজে আসতো। সোমনাথের সঙ্গে তেমন-ভাবে মিশতো না অরবিন্দ। কিন্তু বিদেশে যাবার এই গল্পটা কে বানালো? দু-একজন পরিচিত মহিলার মুখ মনে পড়ে গেলো। কয়েকটা ছবি সরাবার পর হঠাৎ তপতীর মুখটাও চোখের সামনে ভেসে উঠলো। তপতীই হয়তো অস্বস্তি এড়াবার জন্য রত্নাকে গল্পটা বলেছে। কলেজে রত্নার সঙ্গে তপতীর খুব ভাব ছিল। অরবিন্দ যে রত্নার সঙ্গে জমিয়ে প্রেম করেছে এ-খবর কারুর অজানা নয়।

কিন্তু তপতী জেনেশুনে কেন এইভাবে বন্ধু মহলে সোমনাথকে অপ্রস্তুত করতে যাবে? সোমনাথ আরও কিছু ভাবতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার চিন্তায় বাধা পড়লো। বাইরে ইলেকট্রিক কলিং বেল বাজছে।

কমলা বউদি খবর দিলেন সুকুমার এসেছে। রোগা, কালো, বেশ লম্বা, মিষ্টি স্বভাবের এই ছেলেটি সম্পর্কে কমলা বউদির একটু দুর্বলতা আছে। ও বেচারাও বেকার। ওর উজ্জ্বল অথচ অসহায় চোখ দুটোর দিকে তাকালে মায়া হয় কমলার।

বাইরের ঘরে সোমনাথ ঢুকতেই সুকুমার বললো, "তোর হলো কী? সাড়ে-আটটা বেজে গেছে, এখনও বিছানার মায়া কাটাতে পারিসনি?"

সোমনাথ যে ইতিমধ্যে বাজার-হাট সেরে ফেলেছে তা চেপে গেলো। বললো, "বেকারের কী আর করবার আছে বল?"

"ফের আবার ওই অশ্লীল কথাটা মুখে আনলি। তোকে বলেছি না, 'বিধবার' মতো 'বেকার' কথাটা আমার খুব খারাপ লাগে। আমরা চাকরি খুঁজছি, সুতরাং আমাদের চাকুরী-প্রার্থী বলতে পারিস।"

"তুই যে আবার প্রথম ভাগের গোপাল হবার পরামর্শ দিচ্ছিস—কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া, বেকারকে বেকার বলিও না," সোমনাথ মন্তব্য করলো।

সুকুমার বললো, "দাঁড়া মাইরি। কড়া রোদ্দুরে যাদবপুর কলোনি থেকে হাঁটতে হাঁটতে এই যোধপুর পার্কে এসেছি। গলা শুকিয়ে গেছে, একটু খাবার জল পেলে মন্দ হতো না।"

কমলা বউদি ঠান্ডা জল নিয়ে এলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "চা খাবে তো, সুকুমার?"

সুকুমার খুব খুশী হলো। বললে, "বউদি, যুগ যুগ জিও।"

বউদি চলে যেতে সুকুমার বন্ধুকে বললো, "তুই মাইরি খুব লাকি। যখন তখন চায়ের অর্ডার দেবার সিস্টেম আমাদের বাড়িতে বন্ধ হয়ে গিয়েছে বাই অর্ডার অফ দি হোম বোর্ড।" সুকুমারের কিন্তু সেজন্যে কোনো অভিমান নেই। ফিক করে হেসে, বন্ধুকে জানিয়ে দিলো, "দাঁড়া, একখানা চাকরি যোগাড় করি। তারপর বাড়িতে আমুল বিপ্লব এনে ছাড়বো। যখন খুশী চায়ের জন্যে একটা ইলেকট্রিক হিটার কিনে ফেলবো। চা চিনি দুধের খরচ পেলে বাড়িতে কেউ আর রাগ করবে না।"

সুকুমারটা সত্যিই অভাগা। ওর জন্যে সোমনাথেরও কষ্ট হয়। শুনেছে, যাদবপুরে একটা টালির ছাদের কাঁচা বাড়িতে থাকে। ওর তিনটে আইবুড়ো বোন! টাকার অভাবে বিয়ে হচ্ছে না। গত বছর সুকুমারের বাবার রিটায়ার হবার কথা ছিল। সায়েবের হাতে-পায়ে ধরে ভদ্রলোক এক বছর মেয়াদ বাড়িয়ে নিয়েছেন। কিন্তু তিন মাস পরেই চাকরি শেষ হবে। তারপর ওদের কী যে হবে। সুকুমারই বড়। আরও দুটো ভাই ছোট, নীচু ক্লাসে পড়ে। এই ক'মাসে একটা কাজ যোগাড় না হলে কেলেঙ্কারি। বাবার পেনসন নেই। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা ধার নেওয়া আছে। তার ওপর কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে কিছু দেনা আছে বাবার। বড়দির বিয়ে দিতে গিয়ে সেবার ধার না করে উপায় ছিল না। এ-সব বাদ দিয়ে সুকুমারের বাবা হয়তো হাজার ছয়েক টাকা পাবেন। তিনি ভাবছেন তিন ভাগ করে তিন মেয়ের নামে দু'হাজার করে লিখে দেবেন। সুকুমারের বাবা অবশ্য জানেন, দু'হাজার টাকায় আজকাল বস্তির ঝিদেরও বিয়ে হয় না। কিন্তু মেয়েরা যেন না ভাবে, বাবা তাদের জন্য কিছুই করেননি।

সুকুমারকে এ-বাড়ির সবাই জানে। সোমনাথের সঙ্গে সে একই কলেজে পড়েছে। সোমনাথের মতোই সেকেন্ড ডিভিসনে পাস করেছিল সুকুমার। তারপর সোমনাথের মতোই সাধারণভাবে বি-এ পাস করেছে। সুকুমার হয়তো আর একটু ভালো করতে পারতো কিন্তু পরীক্ষার ঠিক আগে মায়ের ভীষণ অসুখ করলো। এই যায় এই যায় অবস্থা—ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত দিয়ে, সারারাত জেগে রোগীর সেবা করে সুকুমারকে পরীক্ষায় বসতে হয়েছিল। মেজবোন কণা বকাবকি না করলে সুকুমারের পরীক্ষাই দেওয়া হতো না।

চায়ের কাপ নামিয়ে কমলা বউদি জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছো, সুকুমার?"

এক গাল হেসে সুকুমার উত্তর দিলো, "খারাপ নই, বউদি। সামনে অনেকগুলো চাকরির চান্স আসছে।"

কমলা বউদি সস্নেহে বললেন, "চা বোধহয় খুব কড়া হয়নি; তুমি তো আবার পাতলা চা পছন্দ করো না।"

সুকুমার দেখলো চায়ের সঙ্গে বউদি দুখানা বিস্কুটও দিয়েছেন। হাত দুটো দ্রুত ঘষে

সুকুমার বললো, "বউদি, ভগবান যদি আপনাকে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের পার্সোনেল ম্যানেজার করতেন!"

বুঝতে না পেরে সোমনাথ প্রতিবাদ করলো। "কেন রে? বউদি কোন্ দুঃখে ব্যাঙ্কের চাকর হতে যাবে?"

সরল মনে সুকুমার বললো, "বউদির একটু কষ্ট হতো স্বীকার করছি। কিন্তু তোর এবং আমার একটা হিল্লে হয়ে যেতো। দুজনে বউদির অফিস ঘরে ঢুকে পড়লে বউদি শুধু আদর করে চা খাইয়ে ছাড়তেন না—সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটাও দিয়ে দিতেন।"

সুকুমারের কথা শুনে কমলাও হেসে ফেললো। দুই বেচারার মুখের দিকে তাকিয়ে কমলার মনে হলো ওরকম একটা বড় পোস্ট থাকলে মন্দ হতো না। অন্তত এদের মুখে একটু হাসি ফোটানো যেতো।

সুকুমার কিন্তু চাকরির আশা এখনও ছাড়ে নি। সব সময় ভাবে, এবারে একটা কিছু সুযোগ নিশ্চয় এসে যাবে। চা খেতে-খেতে সে সোমনাথকে বললো, "আর ক'টা দিন। তারপর হয়তো দেশে বেকার বলে কিছু থাকবেই না।"

সোমনাথ নিজেও এক সময় এই ধরনের কথা বিশ্বাস করতো। এখন ভরসা কমেছে।

সুকুমার বললো, "একেবারে ভিতরের খবর। রেল এবং পোস্টাপিসে দু হাজার নতুন পোস্ট তৈরি হচ্ছে। মাইনেও খুব ভাল—টু হানড্রেড টেন। সেই সঙ্গে হাউস রেন্ট, ডি-এ। তারপর যদি কলকাতায় পোস্টিং করিয়ে নিতে পারি তাহলে তো মার দিয়া কেল্লা। ঘরের খেয়ে পুরো মাইনেটা নিয়ে চলে আসবো অথচ ক্যালকাটা কমপেনসেটরি অ্যালাউন্স পাবো মোটা টাকা।"

সোমনাথ এবার একটু উৎসাহ পেলো। জিজ্ঞেস করলো, "কিন্তু এই 'ক্যালকাটা কমপেনসেটরি' ব্যাপারটা কী রে?"

সুকুমার হেসে ফেললো। "ওরে মুর্খ, তোকে আর কী বোঝাবো? চাকরি করবার জন্যে কলকাতায় থাকতে তো আমাদের কষ্ট হবে—তাই মাইনের ওপর ক্ষতিপুরণ ভাতা পাওয়া যাবে।"

এই ব্যাপারটা সোমনাথের জানা ছিল না। "বারে! চিরকালই তো তুই আর আমি কলকাতায় আছি—এর জন্যে ক্ষতিপুরণ কী?" সোমনাথ বোকার মতো জিজ্ঞেস করে। কাল্পনিক চাকরির সুখ-সুবিধে এবং মাইনে সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করতে ওদের দুজনেরই ভালো লাগে।

সুকুমার বিরক্ত হয়ে বললো, "বেশ বাবা, তোর যখন এতোই আপত্তি, চাকরিতে ঢুকে তুই অ্যালাউন্স নিস না।"

এবার দুজনেই হেসে ফেললো। একসঙ্গে দুজনেই যেন হঠাৎ বুঝতে পারলো ওরা জেগে স্বপ্ন দেখছে, এমনভাবে কথা বলছে যেন চাকরিটা ওদের পকেটে।

সারাদিন টো-টো করে সমস্ত শহর চষে বেড়ায় সুকুমার। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, রাইটার্স বিল্ডিংস, ক্যালকাটা কর্পোরেশন, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, কারখানা, অফিস কিছুই বাদ দেয় না। তাছাড়া বিভিন্ন দলের বেশ কয়েকজন এম-এল-এ এবং দুজন কর্পোরেশন কাউন্সিলর-এর সঙ্গেও সুকুমার ভাব জমিয়ে এসেছে।

সুকুমার বললো, "ক'দিন আগে বাবা হঠাৎ আমার ওপর রেগে উঠলেন। ওঁর ধারণা আমি চাকরির জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি না। ভাইবোনদের সামনে চীৎকার করে উঠলেন, 'হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকলে কোলের ওপর চাকরি ঝপাং করে পড়বে না।' সেই থেকে এই 'ঘুরঘুরে' পলিসি নিয়েছি। দিব্যি কেটেছি, দুপুরবেলায় বাড়িতে বসে থাকবো না।"

সোমনাথ অজানা আশঙ্কায় চুপ করে রইলো। সুকুমারের সংসারের কথা শুনলে ওর কেমন অস্বস্তি লাগে। যে-সুকুমার দুঃখ ভোগ করছে, সে কিন্তু মান-অপমান গায়ে মাখছে না। বেশ সহজভাবে সুকুমার বললো, "আমি ভেবেছিলুম মা আমার দুঃখ বুঝবে।

কিন্তু মা-ও সাপোর্ট করলো বাবাকে। আমি ভাবলুম, একবার বলি, কলকাতা শহরে ঘোরাঘুরি করতে গেলেও পয়সা লাগে। যাদবপুর থেকে ডালহৌসি স্কোয়ার তো দুবেলা হেঁটে মারা যায় না।"

সুকুমারের কথাবার্তায় কিন্তু কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই। অপমান ও দুঃখের বোঝাটা বেশ সহজভাবেই মাথায় তুলে নিয়েছে।

সুকুমারের সান্নিধ্য আজকাল সোমনাথের বেশ ভালো লাগে। কলেজে একসঙ্গে পড়েছে, তখন কিন্তু তেমন আলাপ ছিল না। সুকুমারকে সে তেমন পছন্দ করতো না—নিজের পরিচিত কয়েকজন বন্ধু ও বান্ধবীদের নিয়েই সোমনাথের সময় কেটে যেতো। চাকরি-বাকরির দুঃস্বপ্ন যে এমনভাবে জীবনটাকে গ্রাস করবে তা সোমনাথ তখনও কল্পনা করতে পারে নি।

কিন্তু বি-এ পরীক্ষায় পাসের পর আড়াই বছর আগে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের লাইনে দুই সহপাঠীতে দেখা হয়ে গেলো। সাড়ে-পাঁচ ঘণ্টা ধরে দুজনে একই লাইনে দাঁড়িয়েছিল। বাদাম ভাজা কিনে সুকুমার ভাগ দিয়েছিল সোমনাথকে। একটু পরে ভাঁড়ের চা কিনে সোমনাথ বন্ধুকে খাইয়েছিল। লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে সোমনাথের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। এই ধরনের অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয় নি। সোমনাথের মনের অবস্থা সুকুমার সহজেই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু সুকুমারের মনে তখন অনেক আশা। বন্ধুকে উৎসাহ দিয়ে সে বলেছিল, "ভাবিস না, সোমনাথ। দেশের এই অবস্থা চিরকাল থাকতে পারে না। চাকরি-বাকরি আমাদের একটা হবেই।"

দুজনে ঠিকানা বিনিময় করেছিল। কয়েকদিন পরেই সুকুমার যোধপুর পার্কের বাড়িতে সোমনাথের খোঁজ করতে এসেছিল। সোমনাথের সাজানো-গোছানো বাড়ি দেখে সুকুমার খুব আনন্দ পেয়েছিল। কথায় কথায় সুকুমার একদিন বলেছিল, "আমাদের মাত্র দেড়খানা ঘর। বসতে দেবার একখানা চেয়ারও নেই। চাকরি-বাকরি হলেই ওসব দিকে একটু নজর দিতে হবে। দুটো চেয়ার, একটা টেবিল, জানালার পর্দা—কিনতেই হবে। আমার বোন পর্দার রং পর্যন্ত ঠিক করে রেখেছে, কোন্ দোকান থেকে কিনবে তাও ঠিক, শুধু আমার চাকরি হবার অপেক্ষা।"

ওদের বাড়িতে যাবার মতলব করেছে সোমনাথ। কিন্তু সুকুমার উৎসাহ দেয় নি। সোজাসুজি বলেছে, "চাকরিটা হোক, তারপর একদিন তোকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে খাওয়াবো। এখন যা বাড়ির মেজাজ, তোকে নিজে থেকে এক কাপ চা পর্যন্ত দেবে না। ঘরের মধ্যে বসাতে পারবো না, বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলতে হবে।"

সুকুমার বিব্রত হবে ভেবেই সোমনাথ ওদের বাড়িতে যাবার প্রস্তাব তোলে নি। কিন্তু দুই বন্ধুতে প্রায় দেখা হয়েছে। যোধপুর পার্ক থেকে গল্প করতে করতে ওরা কখনও সেলিমপুরের মোড়ে চলে গেছে। দুজনে সমব্যথী, সুখ-দুঃখের কত কথা হয় নিজেদের মধ্যে।

আজও সুকুমার বললো, "বাড়িতে বসে থেকে কী করবি? চল্ একটু ঘুরে আসি।"

বাড়ি থেকে বেরোবার সুযোগ পেয়ে সোমনাথ রাজী হয়ে গেলো। ট্রাউজারের ওপর একটা বুশ শার্ট গলিয়ে নিয়ে সুকুমারের সঙ্গে সে পথে বেরিয়ে পড়লো।

রাস্তায় সকালের জনপ্রবাহ দেখে সোমনাথ নিজের দুঃখের কথা ভাবে। পৃথিবীটা যে কত নিষ্করুণ তা সে বোধহয় এখনও পুরোপুরি বুঝতে পারেনি। বাড়িতে দাদা বউদি বাবা সবাই এতো ভালোবাসেন—এতো তার প্রতিপত্তি—কিন্তু বাড়ির বাইরে এই জন-অরণ্যে তার কোনো দাম নেই। অন্যের সঙ্গে লড়াই করে একটা সামান্য দশটা-পাঁচটার চাকরি পর্যন্ত সে যোগাড় করতে পারছে না।

সুকুমার জিজ্ঞেস করলো, "কী হলো তোর? গম্ভীর হয়ে গেলি কেন?"

সোমনাথ বললো, "ভাবছি, বাড়ির ভিতরের সঙ্গে বাড়ির বাইরের কত তফাৎ।"

"মারো গুলি! কবিতা ছাড়," সুকুমার এবার বকুনি লাগালো। "তুই ভাগ্যবান। বেশির ভাগ লোকের ভেতর-বাইরে দুই-ই কেরোসিন। আমার অবস্থা দেখ না। জুলাই মাস থেকে বাবার চাকরি থাকবে না। বাড়ির বড় ছেলে, অথচ সংসারে কোনো প্রেস্টিজ নেই।"

"কেন?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করে।

"চাকরি থাকলে প্রেস্টিজ হতো। এখন বাবা মা ভাই বোন সবাই বলে, গুড ফর নাথিং। অনেক ইয়ংম্যান নাকি এই বাজারেও চাকরি ম্যানেজ করেছে। শুধু আমি পারছি না। বাবা মাঝে মাঝে বলেন, 'ভস্মে ঘি ঢেলেছি, সুকুমারকে বি-এ পড়িয়ে কী ভুলই যে করেছি।' বিদ্যে না থাকলে আমি নাকি কারও বাড়িতে চাকর-বাকর হয়ে নিজের পেটটা অন্তত চালাতে পারতাম।"

সোমনাথ কোনো উত্তর না দিয়ে চুপচাপ গড়িয়াহাটের দিকে হাঁটতে লাগলো। বাঁ হাতের আঙুল মটকিয়ে সুকুমার বললো, "আমিও কী ভুল যে করেছি! মা কালীকে পুজো দিয়ে ইস্কুল ফাইনালে যদি ফার্স্ট ডিভিসন বাগাতে পারতাম, তাহলে এতোদিন চাকরি কাকে বলে দেখিয়ে দিতাম।"

সোমনাথ বললো, "শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছিস কেন? তোর আমার সেকেন্ড ডিভিসন কাঁচিয়ে তো আর ফার্স্ট ডিভিসন করা যাবে না।"

সুকুমার বললে, "বড় দুঃখু লাগছে মাইরি। ব্রেবোর্ন রোডের একটা ব্যাঙ্কে স্কুল ফাইনালে ফার্স্ট ডিভিসন হলে কেরানির চাকরি দিচ্ছে—মিনিমাম ৬৪% নম্বর দেখাতে হবে।"

সোমনাথ আপসোস করলো না। সে আজকাল অবিশ্বাস করতে শুরু করেছে। বললো, "ওটাও এক ধরনের চালাকি।"

সুকুমার বললো, "চালাকি বললেই হলো! ব্যাঙ্কের নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে দিয়েছে।"

"যে-ছেলে স্কুল ফাইনালে শতকরা ৬৪ নম্বর পেয়েছে, সে কোন্ দুঃখে লেখাপড়া কুলুঙ্গিতে রেখে ব্যাঙ্কে ঢুকতে যাবে?" সোমনাথ বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে জানতে চাইলো।

"এ-পয়েন্টটা আমার মাথায় আসেনি। সাধে কি আর বাবা বলেন, আমার মাথায় গোবর ছাড়া আর কিছু নেই!" সুকুমারের মুখটা মলিন হয়ে উঠলো।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা গোলপার্কের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সকালবেলার অফিস টাইম। অনেকগুলো প্রাইভেট মোটর গাড়ি হুস-হুস করে বেরিয়ে গেলো। বাসে, ট্যাক্সিতে, মিনিবাসে তিল ধারণের জায়গা নেই। সুকুমার হাঁ করে ওই ব্যস্ত জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বললো, "না ভাই আর তাকাবো না। শেষ পর্যন্ত কারও চাকরিতে শনির দৃষ্টি লেগে যাবে। মনকে যতই শাসন করবার চেষ্টা করছি, বেটা ততই পরের চাকরিতে নজর দিচ্ছে। লোভের নাল ফেলতে-ফেলতে ভাবছে—এতো লোকের চাকরি আছে অথচ সুকুমার মিত্তির কেন বেকার?"

সোমনাথ বললো, "যত লোককে অফিস যেতে দেখছি, এরা প্রত্যেকে ফার্স্ট ডিভিসনে স্কুল ফাইনাল পাস করেছে বলছিস?"

সুকুমার বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলো। মাথা চুলকে বললো, "খুব ডিফিকাল্ট কোশ্চেন করেছিস। তোর বেশ মাথা আছে। হাজার হোক ছোটবেলায় দুধ-ঘি খেয়েছিস। তুই কেন পড়াশোনায় সোনার চাঁদ হলি না, বল তো?"

মন্দ বলেনি সুকুমার। পড়াশোনায় দাদাদের মতো ভালো হলে, সত্যিই সোমনাথের দুঃখের কিছু থাকতো না। নিজের মনের কথা সোমনাথ কিন্তু প্রকাশ করলো না। সুকুমারের যা স্বভাব, হয়তো কমলা বউদিকেই একদিন সব কথা বলে বসবে। সোমনাথ তাই পুরানো প্রসঙ্গ তুলে বললো, "শক্ত শক্ত কোশ্চেন অনেক মাথায় আসে, কিন্তু উত্তর খুঁজে পাই না।"

সুকুমার মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললো, "তোর কোশ্চেনটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। দাঁড়া একটু চিন্তা করে দেখি।"

দূরে একটা পাঁচ নম্বর গড়িয়া-হাওড়া বাসে বাদুড়-ঝোলা অবস্থায় সুকুমারের বাবাকে মুহূর্তের জন্যে দেখা গেলো। জন পঞ্চাশেক লোক হাঁই-হাঁই করে সেই দিকে ছুটে গেলেও বাস থামলো না, নিপুণভাবে আরও দু'খানা বাসকে পাশ কাটিয়ে মুহূর্তের মধ্যে পালিয়ে গেলো। সুকুমার সেইদিকে তাকিয়ে বললো, "আমার বাবার কথাই ধর না। থার্ড ডিভিসনও নয়। রেড-আপ-টু ম্যাট্রিক। অফিসে কেরানি হয়েছে তো?"

সোমনাথ বললো, "ও সব ইংরেজ আমলের ব্যাপার। তখন তো আমরা স্বাধীন হইনি।"

সুকুমার ছেলেটা সরল, একটু বোকাও বটে। সংসারের ঘাটে ঘাটে অনেক ধাক্কা খেয়েও একেবারে সিনিক হয়ে ওঠেনি। সে বললো, "তাহলে তো ইংরেজরাই ভালো ছিল। নন-ম্যাট্রিকও তাদের সময়ে অফিসে চাকরি পেতো—আর এখন হাজার হাজার গ্র্যাজুয়েট বাড়িতে বসে রয়েছে।"

"তোর চাকরির জন্যে তাহলে ইংরেজকে ফিরিয়ে আনতে হয়," সোমনাথ টিপ্পনী কাটলো।

"আমি ভাই তোকে ফ্র্যাঙ্কলি বলছি—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা এসব কিছুই বুঝতে চাই না। যে আমাকে চাকরি দেবে, আমি তার দলে—সে মহম্মদ আলী জিন্নাহ্, মাও-সে-তুং হলেও আমার আপত্তি নেই।"

"আস্তে! আস্তে!" সুকুমারকে সাবধান করে দিলো সোমনাথ। "কেউ শুনলে বিপদ হবে। পাকিস্তানের স্পাই বলে চালান করে দেবে।"

বেজায় রেগে উঠলো সুকুমার। "মগের মুলুক নাকি! চালান করলেই হলো? অ্যারেস্ট করলে জেলের মধ্যে বসিয়ে রোজ খিচুড়ি, আলুচচ্চড়ি খাওয়াতে হবে। তার থেকে একখানা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠিয়ে সমস্যা সমাধান করে ফেলো না বাবা! চাকরি পেলে তোমাদের কোনো হাঙ্গামা থাকবে না। তখন জিন্নাহ্, নিক্সন, মাও-সে-তুং, রানী এলিজাবেথ কারও নাম মুখে আনবো না—একেবারে সেন্ট পারসেন্ট স্বদেশী বনে যাবো। একদম দিল্ হ্যায় হিন্দুস্থানী!"

"সি-আই-ডি কিংবা আই-বি'র লোকেরা যদি এসব শোনে, কোনোদিন তোর সরকারী চাকরি হবে না। জানিস তো, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ইস্যু করবার আগে পুলিশে খোঁজখবর হয়—দুজন গেজেটেড অফিসারের চরিত্র-সার্টিফিকেট লাগে।" সোমনাথের বকুনিতে সুকুমার এবার ভয় পেয়ে গেলো।

বললো, "যা বলেছিস, মাইরি। হাটের মধ্যে দাঁড়িয়ে রাজনীতির গোবর ঘেঁটে লাভ নেই। বহু ছেলে তো ওই করে ডুবেছে। তারা পলিটিকস করেছে, দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার মেরেছে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে পার্টি ফান্ডের জন্যে চাঁদা আদায় করেছে, ঝান্ডা তুলেছে, মিছিলে যোগ দিয়েছে, শ্লোগান তুলেছে, মনুমেন্টের তলায় নেতাদের বক্তৃতা শুনেছে—ভেবেছে এই সব করলেই সহজে চাকরি পাওয়া যাবে। এখন অনেক বাছাধন ভুল বুঝতে পেরে আঙুল চুষছে।"

সোমনাথ গম্ভীর হয়ে বললো, "এক-এক সময়ে মনে হয়, একেবারে কিছু না করা থেকে যা হয় কিছু করা ভালো। তাতে ভুল হলেও কিছু আসে যায় না।"

সুকুমার তেড়ে উঠলো! "তিন মাস পরে যাদের পেটে ভাত থাকবে না তাদের এসব কথা মানায় না। আমাদের দলে টেনে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কত ছেলেধরা যাদবপুরে ঘোরাঘুরি করছে—তাদের পকেটে কত রকমের পতাকা। কোনোটা একরঙা, কোনোটা তিনরঙা। তার ওপর আবার কত রকমের ছাপ! আমি ওসব ফাঁদে পা দিই না বলে, ছেলেধরাদের কী রাগ আমার ওপর। আমার সোজা উত্তর, আমার বাবার তিনমাস চাকরি আছে, আমার পাঁচটা নাবালক ভাইবোন। দেশোদ্ধার করবার মতো সময় নেই আমার।"

অফিস টাইমের যাত্রীদের দিকে সুকুমার আবার তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, "যে যা করছে করুক, আমার কী?"

কয়েক মিনিট ধরে সুকুমার নিজের মনে কী সব ভাবলো। তারপর সোমনাথের পিঠে আঙুলের খোঁচা দিয়ে আবার আরম্ভ করলো, "তুই যা বলছিলি—এই যে পিঁপড়ের মতো পিলপিল করে লোক অফিসের খামে মোড়া টিফিন কৌটো হাতে হাজির দিতে চলেছে, এরা সবাই তো ইংরেজ আমলে চাকরিতে ঢোকেনি। ওই ছোকরাকে দেখ্ না—ইংরেজ রাজত্বে তো ওর জন্মই হয়নি। অথচ অফিসে বেরুচ্ছে।"

সুকুমার এবার এক কেলেঙ্কারি করে বসলো। নিখুঁত ইস্ত্রি করা শার্ট ও প্যান্ট পরে এক ছোকরা বাসে উঠছিল, ঠিক সেই সময় ছুটে গিয়ে সুকুমার তাকে জিজ্ঞেস করলো,

"দাদা, আপনি ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেছিলেন?"

অতর্কিত প্রশ্নে ভদ্রলোক চমকে উঠেছিলেন। ব্যাপারটা ঠিকমতো মাথায় ঢোকবার আগেই বাস ছেড়ে দিলো। বিরক্ত ভদ্রলোক চলন্ত গাড়ি থেকে সুকুমারের দিকে অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করলেন—তার রসিকতার অর্থ বুঝতে পারলেন না।

সুকুমার বোকার মতো ফুটপাথে ফিরে এলো। বললো, "আমি ভাই রসিকতা করিনি। ওঁর পিছনেও লাগিনি—স্রেফ জানতে চাইতাম কী করে চাকরিটা যোগাড় করলেন।"

সোমনাথ বললো, "ওরকম করিস না সুকুমার। কোন্ দিন বিপদে পড়ে যাবি। ভদ্রলোক হয়তো পড়াশোনায় আমাদের মতো। তাহলে রেগে যেতে পারতেন।"

সুকুমার ক্ষমা চাইলো। তারপর কী ভেবে ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললো, "সোম, তুই ঠিক বলেছিস। ওইভাবে জ্বালাতন করাটা আমার উচিত হয়নি। ভদ্রলোক যদি আমাদের মতো সেকেন্ড কিংবা থার্ড ডিভিসনের মাল হয়েও চাকরি পেয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয় সিডিউল্ড কাস্ট।"

"তাতে কী এসে যায়?" বিরক্ত সোমনাথ প্রশ্ন করলো।

"খুবই এসে যায়। সিডিউল্ড কাস্টরাও এখন চাকরি পাচ্ছে না। ভদ্রলোক সিডিউল্ড-ট্রাইব হতে পারেন। চাকরির বিজ্ঞাপনে প্রায়ই লেখে তপসিলীভুক্ত উপজাতি হলে অগ্রাধিকার পাবে! ইন্ডিয়াতে সিডিউল্ড-ট্রাইব গ্র্যাজুয়েট বোধ হয় কেউ বসে নেই।"

দাঁত দিয়ে ডান হাতের কড়ে আঙুলের নখ কাটলো সুকুমার। তারপর সোমনাথকে বললো, "তোর বাবা তো অনেকদিন আদালতে ছিলেন। একবার খোঁজ করিস তো, কী করে সিডিউল্ড-ট্রাইব হওয়া যায়।"

"আবার পাগলামী করছিস? তুই হচ্ছিস সুকুমার মিত্তির! মিত্তির কখনো সিডিউল্ড-ট্রাইব হতে পারে না।" সোমনাথ বন্ধুকে বোঝাবার চেষ্টা করে।

সুকুমার বুঝলো না। বললো, "আমাকে হেল্প করবি না বল। চেষ্টা করে বিশ্বামিত্র যদি ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণে প্রমোটেড হতে পারে, তাহলে আমি কায়স্থ থেকে সিডিউল্ড-ট্রাইব হতে পারবো না কেন?"

"ওদের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার কথা আমরা জানি না বলেই রসিকতা করতে পারছি। ওদের বড় কষ্ট রে," সোমনাথ সরল মনে বললো।

সুকুমারও গম্ভীর হয়ে উঠলো। "তুই ভাবছিস আমি জাত তুলে ব্যঙ্গ করছি। চণ্ডালের পায়ের ধুলো জিভে চাটতে পর্যন্ত আমার আপত্তি নেই। কিন্তু জুলাই মাসের মধ্যে আমাকে একটা চাকরি যোগাড় করতেই হবে।" বন্ধুর চোখ দুটো যে ছলছল করছে তা সোমনাথ বুঝতে পারলো।

একটু দুঃখও হলো সোমনাথের। বন্ধুকে উৎসাহ দেবার জন্যে বললো, "জানিস সুকুমার, চাকরির কথা ভেবে ভেবে আমার মনটাও মাঝে মাঝে খারাপ হয়ে যায়। আধবুড়ো হয়ে গেলাম, এখনও একটা কিছু যোগাড় হলো না। কতদিন আর বাবার হোটেলের অন্ন ধ্বংসাবো? বউদি অত যত্ন করে ভাত বেড়ে দেন, দাদাদের যে-সাইজের মাছ দেন, আমার জন্যে তার থেকেও বড়টা তুলে রাখেন। জিজ্ঞেস করেন, আর কিছু নেবো কিনা। তবু তেতো লাগে।"

এবার রেগে উঠলো সুকুমার। "রাখ রাখ বড় বড় কথা। পাকা রুই মাছের টুকরো পাতে পড়লে বেশ মিষ্টি লাগে। ওই তেতো লাগার ব্যাপারটা তোর মানসিক বিলাসিতা। আমার কিন্তু আজকাল খেতে বসলে সত্যি তেতো লাগে। কাল রাত্রে ডাল পুড়ে গিয়েছিল। একে তো নিরামিষ মেনু, তার ওপর ডাল পোড়া হলে কেমন মেজাজ হয় বল তো? মায়ের শরীর ভালো নয়, তাই বোন রাঁধছে ক'দিন। তা বোনকে বকতে গেলাম, বাড়িতে বসে বসে কী করিস? রান্নাটাও দেখতে পারিস না? বোন অমনি ছ্যাড়-ছ্যাড় করে শুনিয়ে দিলো। বলে কিনা, 'তোমারও তো কাজকম্ম নেই—বাড়িতে বসে ডাল রাঁধলেই পারো।'"

"তুই কী উত্তর দিলি?" সোমনাথ জানতে চায়।

"কিছু বললাম না. মুখ বুজে দাঁত খিঁচুনি হজম করলাম। তবে, সুকুমার মিত্তির একদিন এর প্রতিশোধ নেবে।"

প্রতিশোধের ব্যাপারটা সোমনাথের ভালো লাগে না। সে নির্বিবাদী মানুষ। বললো, "দূর। আপনজনদের ওপর প্রতিশোধ নিতে নেই।"

সুকুমার তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলো, "টেবিল-চেয়ারে বসিয়ে বউদি তোকে মন্ডা-মিঠাই খাওয়াচ্ছে, তাই তোর মাথায় প্রতিশোধের কথা ওঠে না। আমার পলিসি অন্য। যারা আমার সঙ্গে এখন যেরকম ব্যবহার করছে তা আমি নোট করে রাখছি। ভগবান যখন সময় দেবেন, তখন সুদসমেত ফিরিয়ে দেবো।"

"আঃ সুকুমার! হাজার হোক তোর নিজের বোন। তার ওপর আবার প্রতিশোধ কী?" সোমনাথ আবার বন্ধুকে বোঝাবার চেষ্টা করলো।

হাসলো সুকুমার। "প্রতিশোধ মানে কি সমর্থ বোনকে ধরে মারবো, না রেগে গিয়ে দোজবরে বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দেবো? বোনের ব্যাপারে আমার প্রতিশোধের পলিসিই আলাদা। সব ঠিক করে রেখেছি এখন থেকে। চাকরিতে ঢুকে প্রথম মাসের মাইনে থেকে কণাকে একটা লাল রংয়ের ঝকঝকে শাড়ি কিনে দেবো। আর শাড়ির মধ্যেই একটা ছোট্ট চিরকুটে লেখা থাকবে—অমুক তারিখের রাত্রিতে যখন আমাকে রান্নাঘরে ঢুকতে বলেছিলি তখনই তোকে এই শাড়িটা দেবার ইচ্ছে হয়েছিল। ইতি—দাদা।"

সোমনাথ একমত হতে পারলো না। বললো, "এখন তোর রাগ রয়েছে, তাই এসব কথা ভাবছিস। যখন প্রথম মাইনে পাবি তখন দেখবি শুধু শাড়িটা দেবার ইচ্ছে হচ্ছে, চিঠির কথা মনেই পড়বে না। হাজার হোক ছোট বোন তো, তার মনে ব্যথা দিতে তোর মায়া হবে।"

সুকুমার কথা বাড়ালো না। বললো, "হয়তো তাই। কিন্তু মাইনে পাবার মতো অবস্থাটা কবে হবে বল তো?"

একটু থেমে সুকুমার বললো, "মাঝে মাঝে তো এম-এল-এ-দের কাছে যাই। রাগের মাথায় ওঁদের যা-তা বলি। আপনাদের জন্যেই তো আমাদের এই অবস্থা। চাকরি দেবার মুরোদ না থাকলে কেন ইংরেজ তাড়িয়েছিলেন, কেন নিজেরা গদি দখল করেছিলেন?"

"ওঁরা কী বলেন?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো।

"মাইরি একটা আশ্চর্য গুণ, কিছুতেই রাগে না এই এম-এল-এ-গুলো। আমাকে ওইভাবে কেউ ফায়ার করলে, স্রেফ ঘাড় ধরে তাকে বাড়ির বাইরে বার করে দিতাম, বলতাম, পরের বারে ব্যাটাচ্ছেলে যাকে খুশী ভোট দিও।"

"যারা পাবলিককে সামলাতে পারে না তারা ভোটে হেরে যাবে" সোমনাথ বললো।

"ঠিক বলেছিস, অশেষ ধৈর্য লোকগুলোর," সুকুমার বিস্ময় প্রকাশ করলো। "অমন চ্যাটাং-চ্যাটাং করে শোনালাম, একটু রাগলো না। বরং স্বীকার করে নিলো, প্রত্যেকটি ইয়ংম্যানকে চাকরি দেবার দায়িত্ব গভরমেন্টের। যে-সরকার তা পারে না, তাদের লজ্জিত হওয়া উচিত।"

"লজ্জা কিছু দেখলি?" সোমনাথ জানতে চায়।

"অত লক্ষ্য করিনি ভাই। তবে এম-এল-এ-দা ভিতরের খবরের অনেক ছাড়লেন। মাস-কয়েকের মধ্যে অনেক চাকরি আসছে। সেলস ট্যাক্স, স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড, হাউসিং ডিপার্টমেন্টের হাজার হাজার চাকরি তৈরি হলো বলে। এতো চাকরি যে সে অনুপাতে গভরমেন্টের চেয়ার নেই। তা আমি বলে দিয়েছি সেজন্য চিন্তার কিছু নেই। চাকরি পেলে আমার বন্ধুর বাড়ি থেকে একটা চেয়ার চেয়ে নিয়ে যাবো। গভরমেন্টের অসুবিধা করবো না।"

"উনি কী বললেন?" সোমনাথ জানতে চাইলো।

"খুব ইমপ্রেসড হলেন। বললেন, সবার কাছ থেকে এ-রকম সহযোগিতা পেলে ওঁরা দেশে সোনা ফলিয়ে দেবেন। ভরসা পেয়ে তোর কথাটাও ওঁর কানে তুলে দিয়েছি। বলেছি, হাজার হাজার লাখ লাখ চাকরি যখন আপনার হাতে আসছে, তখন আমার বন্ধু সোমনাথ ব্যানার্জির নামটাও মনে রাখবেন। খুব ভালো ছেলে, আমারই মতো চাকরি না পেয়ে বেচারা

বড় মনমরা হয়ে আছে। চেয়ারের জন্যে কোনো অসুবিধা হবে না। ওদের বাড়িতে অনেক খালি চেয়ার আছে।”

সোমনাথ হাসলো।

সুকুমার একটু বিরক্ত হয়ে বললো, “এইজন্যে কারুর উপকার করতে নেই। দাঁত বার করে হাসছিস কি? এম-এল-এ-দা বলেছেন, শীগগির একদিন রাইটার্স বিল্ডিংস-এ নিয়ে যাবেন। খোদ মিনিস্টারের সি-এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন। সি-এ জানিস তো? মিনিস্টারের গোপন সহকারী—কনফিডেনশিয়াল অ্যাসিসট্যান্ট। আজকাল এরা ভীষণ পাওয়ারফুল—আই-সি-এস খোদ সেক্রেটারীরা পর্যন্ত সি-এদের কাছে কেঁচো হয়ে থাকে।”

“তাতে তোর-আমার কী? বড় বড় গভরমেন্ট অফিসাররা চিরকালই কারুর কাছে গোখরো সাপ, কারুর কাছে পাঁকাল মাছ।” সোমনাথ আই-এ-এস এবং আই-সি-এস সম্বন্ধে তার বিরক্তি প্রকাশ করলো।

সুকুমার কিন্তু নিরুৎসাহ হলো না। বন্ধুর হাত চেপে বললো, “আসল কথাটা শোন না। সি-এদের পকেটে ছোট একটা নোটবুক থাকে। ওই নোটবুকে যদি একবার নিজের নাম-ঠিকানা তোলাতে পেরেছিস স্রেফ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সরকারী চাকরি পেয়ে যাবি।”

“তুই চেষ্টা করে দেখ! তম্বিরের জন্য জুতোর হাফসোল খুইয়ে ফেলে আমার চোখ খুলে গিয়েছে,” সোমনাথ বিরক্তির সঙ্গে বললো।

সুকুমার বললো, “আশা ছাড়িস না। ট্রাই ট্রাই অ্যান্ড ট্রাই। একবারে না পারিলে দেখো শতবার।”

“শতবার! শালা সহস্রবারের ওপর হয়ে গেলো, কিছু ফল হলো না। মাঝখান থেকে রয়াল টাইপ রাইটিং কোম্পানির নবীনবাবু বড়লোক হয়ে গেলেন। আমার কাছ থেকে কত বার যে পঞ্চাশ পয়সা করে চিঠি ছাপাবার জন্যে বাগিয়ে নিলেন! আমি মতলব করেছিলুম, কার্বন কাগজ চড়িয়ে অনেকগুলো কপি করে রেখে দেবো, বিভিন্ন নামে ছাড়বো। কিন্তু বাবা এবং বউদি রাজী হলেন না। বললেন, অ্যাপ্লিকেশনটাই নাকি সবচেয়ে ইমপর্টান্ট। ওর থেকেই ক্যান্ডিডেট সম্পর্কে মালিকরা একটা আন্দাজ করে নেয়। কার্বন কপি দেখলে ভাববে লোকটা পাইকিরী হারে অ্যাপ্লিকেশন ছেড়ে যাচ্ছে।”

“এটা মাইরি অন্যায়,” সুকুমার এবার বন্ধুর পক্ষ নিলো। “তোমরা একখানা চাকরির জন্যে হাজার হাজার দরখাস্ত নেবে, আর আমরা দশ জায়গায় একই দরখাস্ত ছাড়তে পারবো না?”

সোমনাথ বললো, “আসলে বউদির খেয়াল। টাইপ করার পয়সাও হাতে গুঁজে দিচ্ছেন, বলার কিছু নেই। তবে এখন বুঝতে পারছি সরকার-বেসরকার কেউ আমাদের চাকরি দিয়ে উদ্ধার করবে না?”

“ভগবান জানেন,” সুকুমার রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজের মনেই বললো। অফিসযাত্রীর ভিড় ইতিমধ্যেই অনেকটা পাতলা হয়ে এসেছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সোমনাথ একবার বললো, “আমার বউদি কিন্তু মোটেই আশা ছাড়েনি। আমার কোষ্ঠিতে নাকি আছে যথাসময়ে অনেক টাকা রোজগার করবো।”

“আমার ভাই কোষ্ঠি নেই। থাকলে একবার ধনস্থানটা বিচার করিয়ে নেওয়া যেতো।” সুকুমার বললো।

সোমনাথ আবার বউদির কথা তুললো। “সেদিন চুপচাপ বসেছিলাম। বউদি বললেন, ‘মন খারাপ করে কী হবে? ছেলেদের চাকরিটা অনেকটা মেয়েদের বিয়ের মতো। বাবা আমার বিয়ের জন্যে কত ছটফট করেছেন। কত বাড়িতে ঘোরাঘুরি করেছেন। কিছুতেই কিছু হয় না। তারপর যখন ফুল ফুটলো. এ-বাড়িতে এক সপ্তাহের মধ্যে সব ঠিকঠাক হয়ে গেলো।” বউদি বলেছিলেন, “আমার চাকরির ফুল হয়তো একদিন হঠাৎ ফুটে উঠবে, লোকে হয়তো ডেকে চাকরি দেবে।”

“তোর বউদির মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। জুন মাসের মধ্যে যদি আমার ফুল ফোটে তাহলে বড় ভালো হয়, হাতে পুরো একটা মাস থাকে।” সুকুমার নিজের মনেই বললো।

"ফুল তো তোর আমার চাকর নয়। নিজের যখন ইচ্ছে হবে তখন ফুটবে," সোমনাথ উত্তর দিলো।

সুকুমার এবার মনের কথা বললো। "বড্ড ভয় করে মাইরি। আমাদের কলোনিতে আইবুড়ী দে'তো পিসী আছে। বিয়ের সম্বন্ধ করতে করতেই পিসী বুড়ী হয়ে গেলো—বর আর জুটলো না। আমাদের যদি ওরকম হয়? চুল-দাড়ি সব পেকে গেলো অথচ চাকরি হলো না!"

এরকম একটা ভয়াবহ সম্ভাবনা যে নেই, তা মোটেই জোর করে বলা যায় না। এই ধরনের কথা শুনতে সোমনাথের তাই মোটেই ভালো লাগে না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সোমনাথ বললো, "এবার বাড়ি ফেরা যাক। বউদি বেচারা হয়তো জলখাবার নিয়ে বসে আছেন।"

"যা তুই জলখাবার খেতে। আমি এখন বাড়ি ফিরবো না। একবার আপিসপাড়াটা ঘুরে আসবো।"

"আপিসপাড়ায় ঘুরে কী তোর লাভ হয়? কে তোকে ডেকে চাকরি দেবে?" সোমনাথ বন্ধুর সমালোচনা করলো।

কিন্তু সুকুমার দমলো না। "সব গোপন ব্যাপার তোকে বলবো কেন? ভাবছিস ফর নাথিং এই সেকেন্ড ক্লাস ট্রামের ভিড় ঠেঙিয়ে আমি আপিসপাড়ায় ভেরেন্ডা ভাজতে যাচ্ছি? সুকুমার মিত্তিরকে অত বোকা ভাবিস না।"

সোমনাথের এবার কৌতূহল হলো। বন্ধুকে অনুরোধ করলো, "গোপন ব্যাপারটা একটু খুলে বল না ভাই।"

"এবার পথে এসো দাদা! বেকারের কি দেমাক মানায়? বাড়িতে বসে শুধু খবরের কাগজ পড়লেই চাকরির গোপন খবর পাওয়া যায় না, চাঁদ।"

"তাহলে?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করে।

সুকুমার বেশ গর্বের সঙ্গে বন্ধুকে খবর দিলো, "অনেক কোম্পানি আজকাল বেকার পঙ্গপালের ভয়ে কাগজে চাকরির বিজ্ঞাপন দেয় না। একটা কোম্পানি তো কেরানির পোস্টের জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে যা ফ্যাসাদে পড়েছে না! খবরের কাগজে বক্স নম্বর ছিল। সেখান থেকে তিন লরি অ্যাপ্লিকেশন কোম্পানির হেড আপিসে পাঠিয়েছে। এখনও চিঠি আসছে। তার ওপর আবার কীভাবে খবরের কাগজের আপিস থেকে বক্স নম্বর ফাঁস হয়েছে। কারা বিজ্ঞাপন দিয়েছিল তা কিছু লোক জানতে পেরেছে। প্রতিদিন তিন-চারশ' লোক আপিসে ভিড় করছে। কোম্পানির পার্সোনেল অফিসার তো ঘাবড়ে গিয়ে কলকাতা থেকে কেটেছেন।"

"তাহলে উপায়?" সোমনাথ চিন্তিত হয়ে পড়ে।

"তাদের উপায় তারা বুঝবে, আমাদের কী? তা যা বলছিলাম, এই পঙ্গপালের ভয়ে অনেক কোম্পানি এখন বিজ্ঞাপন না দিয়ে নোটিশ বোর্ডে চাকরির খবর ঝুলিয়ে দিচ্ছে। আমাদের শম্ভু দাস, ছোকরা এইরকমভাবে হাইড রোডের একটা কারখানায় টাইপিস্টের চাকরি বাগিয়েছে। ছোকরার অবশ্য টাইপে স্পীড ছিল। বেটাকে একদিন দেখেছিলাম মেশিনের ওপর। পাঞ্জাব মেলের মতো আঙুল চলছে। ওর কাছ থেকে বুদ্ধি পেয়ে আমিও এখন আপিসে-আপিসে ঘুরে বেড়াই। মুখে কিছু বলি না—চাকরির খোঁজে এসেছি জানতে পারলে অনেক আপিসে আজকাল ঢুকতে দেয় না। তাই কোনো কাজের অছিলায় ডাঁটের মাথায় আপিসে ঢুকে পড়তে হয়, তারপর একটু ব্রেন খাটিয়ে স্টাফদের নোটিশ বোর্ডে নজর বুলিয়ে আসি।"

একটু থাকলো সুকুমার। তারপর বললো, "ভাবছিস পণ্ডশ্রম হচ্ছে? মোটেই না। চারে মাছ আছে, বুঝলি সোমনাথ? এর মধ্যে তিন-চারখানা অ্যাপ্লিকেশন ছেড়ে এসেছি। কাল যে আপিসে গিয়েছিলাম, সেখানে চাকরি হলে কেলেংকারিয়াস কাণ্ড। প্রত্যেক দিন মাইনে ছাড়াও পঁচাত্তর পয়সা টিফিন—তাও বাবুদের পছন্দ হচ্ছে না। প্রতিদিন আড়াই টাকা টিফিনের দাবিতে কর্মচারি ইউনিয়ন কোম্পানিকে উকিলের চিঠি দিয়েছে।"

গোলপার্ক থেকে একলা বাড়ি ফিরে আসার পথে সুকুমারের কথা ভাবছিল সোমনাথ।

ওর উদ্যমকে মনে মনে প্রশংসা না করে পারে নি সোমনাথ। হয়তো এই পরিশ্রমের ফল সুকুমার একদিন আচমকা পেয়ে যাবে। চাকরির নিয়োগপত্রটা দেখিয়ে সুকুমার চলে যাবে, কেবল সোমনাথ তখনও বেকার বসে থাকবে। এসব বুঝেও সোমনাথ কিন্তু সুকুমারের মতো হতে পারবে না।

বাবা সরকারী কাজ করতেন, একসময় অনেককে চিনতেন। কিন্তু সোমনাথ কিছুতেই তাঁদের বাড়ি বা অফিসে গিয়ে ধর্না দেবার কথা ভাবতে পারে না। বাবারও আত্মসম্মানজ্ঞান প্রবল—কিছুতেই বন্ধু-বান্ধবদের ধরেন না। দ্বৈপায়নবাবুর যে একটা পাস কোর্সে বি-এ পাসকরা বেকার অর্ডিন্যারি ছেলে আছে সে খবর অনেকেই রাখে না। তাঁরা শুধু দ্বৈপায়ন ব্যানার্জির দুই হীরের টুকরো ছেলের কথা শুনেছেন—যাদের একজন আই-আই-টি ইনজিনীয়ার এবং আরেকজন বিলাতী কোম্পানির জুনিয়ার অ্যাকাউনটেন্ট।

হঠাৎ সোমনাথের রাগ হতে আরম্ভ করছে। সুকুমার বেচারা অত দুঃখী, কিন্তু কারুর ওপর রাগে না। সোমনাথের এই মুহূর্তে রাগে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করছে। এই যে বিশাল সমাজ তার বিরুদ্ধে কোনো অপরাধই তো সোমনাথ বা তার বন্ধু সুকুমার করেনি। তারা সাধ্যমতো লেখাপড়া শিখেছে, সমাজের আইন-কানুন মেনে চলেছে। তাদের যা করতে বলা হয়েছে তারা তাই করেছে! তাদের দেহে রোগ নেই, তারা পরিশ্রম করতে রাজী আছে—তবু এই পোড়া দেশে তাদের জন্যে কোনো সুযোগ নেই। এমন নয় যে তারা বড় চাকরি চাইছে—যে-কোনো কাজ তো তারা করতে প্রস্তুত। তবু কেউ ওদের দিকে মুখ তুলে তাকালো না—মাঝখান থেকে জীবনের অমূল্য দুটো বছর নষ্ট হয়ে গেলো।

একবার যদি সোমনাথ বুঝতে পারতো এর জন্যে কে দায়ী, তাহলে সত্যিই সে বেপরোয়া একটা কিছু করে বসতো। সুকুমার বেচারা হয়তো তার সঙ্গে যোগ দিতে সাহস করবে না—ওর দায়-দায়িত্ব অনেক বেশি। কিন্তু সোমনাথের পিছু টান নেই। ওর পক্ষে বেপরোয়া হয়ে বোমার মতো ফেটে পড়া অসম্ভব নয়।

বাড়ি ফিরতেই কমলা বউদি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কারুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নাকি? মুখ অমন লাল হয়ে রয়েছে।"

সোমনাথ সামলে নিলো নিজেকে। বললো, "বোধহয় একটু রোদ লেগেছে।"

বুলবুল অনেক আগেই চেতলায় বাপের বাড়ি বেড়াতে গেছে। ওখানে ভাত খাবে সে। বাবা পুরানো অভ্যাস অনুযায়ী সাড়ে-দশটার সময় ভাত খেয়ে নিয়েছেন। শুধু বউদি সোমনাথের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিলো সোমনাথ। তারপর দুজনে একসঙ্গে খেতে বসলো। মায়ের মৃত্যুর পর এই এতো বছর ধরে সোমনাথ কতবার কমলা বউদির সঙ্গে খেতে বসেছে। রান্না পছন্দ না হলে বউদিকে বকুনি লাগিয়েছে। বলেছে, "বাবা কিছু বলেন না, তাই বাড়ির রান্না ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে।"

কমলা বউদিও দেওরের সঙ্গে তর্ক করেছেন। বলেছেন, "তেল-ঝাল না থাকলে তোমাদের রান্না ভালো লাগে না। কিন্তু বাবা ওসব সহ্য করতে পারেন না। ডাক্তারবাবু বলে গেছেন, লঙ্কা আর অতিরিক্ত মসলা কারুর শরীরের পক্ষে ভালো নয়।"

কিন্তু এই দু-বছরেই অবস্থাটা ক্রমশ পালটে গেলো। সোমনাথ এখন খেতে বসে কেমন যেন লজ্জা পায়! রান্নার সমালোচনা তো দূরের কথা, বিশেষ কোনো কথাই বলে না। আর কমলা বউদি দুঃখ করেন, "তোমার খাওয়া কমে যাচ্ছে কেন, খোকন? হজমের কোনো গোলমাল থাকলে ডাক্তার দেখিয়ে এসো। একটু-আধটু ওষুধ খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সোমনাথ প্রশ্নটা এড়িয়ে যায়। ওর কেমন ভয় হয়, কমলা বউদির কাছে কিছুই গোপন থাকে না। বউদি ওর মনের সব কথা বোধহয় বুঝতে পারেন।

অপরাহ্নের পরিস্থিতি আরও যন্ত্রণাদায়ক। জন্ম-জন্মান্তর ধরে কত পাপ করলে তবে এই সময় বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকবার শাস্তি পায় পুরুষ মানুষরা।

কমলা বউদি সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর এই সময় একটু নিজের ঘরে বিছানায় গড়িয়ে নেন। বিনাশ্রম কারাদণ্ডের এই সময়টা সোমনাথ কীভাবে কাটাবে বুঝতে পারে না।

এই সময় ঘুমোলে সারারাত বিছানায় ছটফট করতে হয়। চুপচাপ জেগে থাকলে, মনে নানা কিম্ভূতকিমাকার চিন্তা ভিড় করে। মাঝে-মাঝে বই পড়বার চেষ্টা করেছে সোমনাথ—এখন বই ভালো লাগে না। আগে ট্রানজিস্টর রেডিওতে গান শুনতো—এখন তাও অসহ্য মনে হয়।

অথচ কত লোক এই সময়ে অফিসে, আদালতে, কারখানায়, রেল্‌ স্টেশনে, পোস্টাপিসে, বাজারে কাজ করতে করতে গলদঘর্ম হচ্ছে। মা বলেছিলেন, কাউকে হিংসে করবে না—কিন্তু এই মুহূর্তে কাজের লোকেদের হিংসে না করে পারছে না সোমনাথ।

* * *

সাড়ে-চারটের সময় বাবার বন্ধু সুধন্যবাবু এলেন। রিটায়ার করে তিনি এখানেই বাড়ি কিনেছেন। বিকেলের দিকে সুধন্যবাবু মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে গল্প করতে আসেন।

সুধন্যবাবু এলেই বাবার গাম্ভীর্যের মুখোস খসে যায়। বউমার কাছে চায়ের অনুরোধ যায়। তারপর দুজনের সুখ-দুঃখের গল্প শুরু হয়।

সুধন্যবাবুর দিকে সিগারেট এগিয়ে দিয়ে দ্বৈপায়ন জিজ্ঞেস করেন, "চিঠিপত্তর পেলে!"

চিঠিপত্তর মানে জামাই-এর চিঠি—সুধন্যবাবুর জামাই কানাডায় থাকে।

সুধন্যবাবু বলেন, "জানো ব্রাদার, এখানে তো এতো গরম, কিন্তু উইনিপেগে এখন বরফ পড়ছে। খুকী লিখেছে, রাস্তায় হাঁটা যায় না।"

"ওদের আর হাঁটবার দরকার কী? গাড়ি রয়েছে তো?" দ্বৈপায়নবাবু জিজ্ঞেস করেন।

"শুধু গাড়ি নয়—এয়ার কন্ডিশন লিমুজিন। শীতকালে গরম, গরমকালে ঠাণ্ডা! এখানে বিড়লারাও অমন গাড়ি চড়তে পায় কিনা সন্দেহ। জামাইবাবাজী গাড়ির একটা ফটো পাঠিয়েছে, তোমাকে দেখাবো'খন। জানো দ্বৈপায়ন, এমন গাড়ি যে গিয়ার চেঞ্জ করতে হয় না—সব আপনা-আপনি হয়। আর আমাদের এখানে দেশী কোম্পানির গাড়ি দেখো! সেবার খুকী যখন এলো, তখন আমার নাতনী তো ট্যাক্সিতে চড়ে হেসে বাঁচে না। তাও বেছে-বেছে নতুন ট্যাক্সিতে উঠেছিলাম আমরা।"

"কাদের সঙ্গে কাদের তুলনা করছো, সুধন্য?" দ্বৈপায়ন সিগারেটে টান দিয়ে বলেন। এ-দেশের অর্থনৈতিক ক্রমাবনতি সম্পর্কে দ্বৈপায়নের বিরক্তি ওঁর প্রতিটি কথায় প্রকট হয়ে উঠলো।

সুধন্যবাবু এবার সগর্বে ঘোষণা করলেন, "খুকী লিখেছে, জামাইয়ের মাইনে আরও বেড়েছে। এখন দাঁড়ালো, এগারো হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা।" জানো ব্রাদার, গিন্নি তো এখনও সেইরকম সিম্‌প্‌ল আছেন—উনি ভেবেছেন বছরে এগারো হাজার টাকা। বিশ্বাসই করতে চান না, প্রতি মাসে জামাইবাবাজী এতো টাকা ঘরে আনছে। আমি রসিকতা করলাম, "গিন্নি একি তোমার স্বামী যে এগারো শো টাকায় রিটায়ার করবে।"

"আহা বেঁচে থাক, আরও উন্নতি করুক," দ্বৈপায়ন আশীর্বাদ জানালেন।

সুধন্যবাবু কিন্তু পুরোপুরি খুশী নন। বললেন, "খুকীর অবশ্য সুখ নেই। লিখেছে, এমন অভাগা দেশ যে একটা ঠিকে-ঝি পর্যন্ত পাওয়া যায় না। জানো দ্বৈপায়ন, আমার মেয়েটাকে জমাদারণীর কাজ পর্যন্ত করতে হয়। অবশ্য জামাইবাবাজী হেল্প করে!"

"বলো কী?" দ্বৈপায়ন সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

"লোকের বড় অভাব, জানো দ্বৈপায়ন। কত চাকরি যে খালি পড়ে আছে, শুধু লোক পাওয়া যাচ্ছে না বলে।" সুধন্যবাবু সিগারেটে একটা টান দিলেন।

দ্বৈপায়ন কী মতামত দেবেন ভেবে পাচ্ছেন না। সিগারেটের ছাই ঝেড়ে তিনি বললেন, "রূপকথার মতো শোনাচ্ছে সুধন্য। বিংশ শতাব্দীতে একই চন্দ্র-সূর্যের তলায় এমন দেশ রয়েছে যেখানে একটা পোস্টের জন্য এক লাখ অ্যাপ্লিকেশন পড়ে, আবার অন্য দেশে চাকরি রয়েছে কিন্তু লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

সুধন্যবাবু বন্ধুর মতো বিস্ময়বোধ করলেন না। বললেন, "তবে কি জানো, দুটোই চরম অবস্থা। যে-দেশে নিজের বাসন নিজে মেজে খেতে হয় সে দেশকে ঠিক সুসভ্য দেশ বলা চলে না।"

হাসলেন দ্বৈপায়ন। "কিন্তু যাদের বাড়িতে বেকার ছেলে রয়েছে তারা বলছে, পশ্চিম যা করেছে তাই শতগুণে ভালো। এদেশে চাকরি-বাকরির যা অবস্থা হলো।"

সুধন্যবাবু বললেন, "ভাগ্যে আমার ছেলে নেই, তাই চাকরি-বাকরির কথা এ-জীবনে আর ভাবতে হবে না।"

"বেঁচে গেছ, ব্রাদার। ছোকরা বয়সের এই যন্ত্রণা চোখের সামনে দেখতে পারা যায় না। অথচ হাত-পা বাঁধা অবস্থা—সাহায্য করবার কোনো ক্ষমতা নেই।" দ্বৈপায়নের কণ্ঠে দুঃখের সুর বেজে উঠলো।

"এই অবস্থায় জামাই-এর মাথায় ভূত চেপেছে," সুধন্যবাবু ঘোষণা করলেন, "বিদেশে থাকলে স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা বাড়ে তো। লিখেছে, দেশে ফিরে গিয়ে দেশের সেবা করবো। বলো দিকিনি, কি সর্বনাশের কথা!"

কথাটা যে মোটেই সুবিধের নয় এ-বিষয়ে দ্বৈপায়ন বন্ধুর সঙ্গে একমত হলেন।

সুধন্যবাবু বললেন, "সেইজন্যেই তো তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলাম। জামাই লিখেছে, হাজার টাকা মাইনে পেলে দেশের কোনো কলেজে লেকচারার হয়ে ফিরে যাবো। বাবাজী অনেকদিন ঘরছাড়া, বুঝতে পারছে না ইন্ডিয়াতে এতো লোক যে এখানে মানুষের কোনো সম্মান নেই। মানুষের এই জঙ্গলে মানুষকে যোগ্য মূল্য দিতে ভুলে গিয়েছি আমরা।"

দ্বৈপায়ন বললেন, "মেয়েকে লিখে দাও, জামাইয়ের কথায় যেন মোটেই রাজী না হয়। এখানে এসে ওরা শুধু ভিড় বাড়াবে, তিন-চারখানা বাড়তি রেশন কার্ড হবে, অথচ দেশের কোনো মঙ্গল হবে না। তার থেকে ঐ যে বৈদেশিক মুদ্রা জমাচ্ছে, ওতে দেশের অনেক উপকার হচ্ছে।"

সুধন্যবাবুর মনের মধ্যে কোথাও একটু লোভ ছিল মেয়েকে অতদূরে না রাখার। চাপা গলায় বললেন, "তোমাকে বলতে লজ্জা নেই, গিন্নির চোখে জল। হাজার হোক একটি সন্তান—কোথায় পড়ে রয়েছে। ওঁর ইচ্ছে, মেয়েজামাই ফিরে আসুক—অত টাকা নিয়ে কী হবে? এতো লোক তো এই দেশেই করে খাচ্ছে, গাড়ি চড়ছে, ভালো বাড়িতে থাকছে।"

একটু থেমে সুধন্যবাবু বললেন, "সেদিক থেকে তুমি ভাই লাকি। হীরের টুকরো সব ছেলে। ভোম্বলের আর কোনো প্রমোশন হলো নাকি?"

দ্বৈপায়ন ছেলেদের সব খবরাখবর রাখেন। ছেলেরা এসে অফিস সম্পর্কে বাবার সঙ্গে আলোচনা করে। দ্বৈপায়ন বললেন, "ভোম্বল এ-বছরেই টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি ম্যানেজার হবে শুনছি। ছোকরা নিজের চেষ্টায় সামান্য টাকায় ঢুকেছিল. চাকরিতে এতোটা উঠবে আশা করিনি। কিন্তু বিয়ের পরই উন্নতি হচ্ছে—বউমার ভাগ্য।"

বউমা সম্পর্কে কোথাও কোনোরকম মতদ্বৈধ নেই। সুধন্যবাবু বললেন. "গিন্নি এবং আমি তো প্রায়ই বলি, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীকে তুমি ঘরে নিয়ে এসেছো—নামে কমলা. স্বভাবেও কমলা।"

দ্বৈপায়নের থেকে এ-বিষয়ে কেউ বেশি বোঝে না। তিনি কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "বড় বউমা না থাকলে সংসারটা ভেসে যেতো সুধন্য। আজকালকার মেয়েদের সম্বন্ধে যা সব শুনি!"

পা নাড়াতে নাড়াতে সুধন্যবাবু বললেন, "আজকাল মেয়েরা যে রসাতলে যাচ্ছে তা হয়তো ঠিক নয়। তবে স্বামীরটি এবং নিজেরটি ছাড়া অন্য কিছুই বোঝে না। সুপুরুষ রোজগেরে স্বামীটি যে ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়সে আকাশ থেকে বেলুনে চড়ে মাটিতে নেমে আসেনি, অনেক দুঃখ-কষ্টে পেটে ধরে কেউ যে তাকে তিলতিল করে মানুষ করেছেন এবং তাঁদেরও যে সন্তানের ওপর কিছু দাবি আছে, তা বউদের মনে থাকে না।"

দ্বৈপায়ন বললেন, "এই ডেপুটি ম্যানেজার হবার খবরে বউমা কিন্তু খুব চিন্তিত।"

"সে কি?" অবাক হয়ে গেলেন সুধন্যবাবু। "প্রমোশন, এ তো আনন্দের কথা!"

"প্রমোশন পেলে ভোম্বলকে হেড অফিসে বদলি করে দেবে," একটু থামলেন দ্বৈপায়ন। "মা আমার কথা কম বলে, কিন্তু বুদ্ধিমতী। কমলা-বিহীন এ-সংসারের কী হবে তা নিশ্চয় বুঝতে পারো।"

"কেন? মেজ বউমা?" সুধন্যবাবু প্রশ্ন করেন।

দ্বৈপায়ন ঝুঁকে পড়েন সামনের দিকে। নিচু গলায় বললেন, "এখনও ছেলেমানুষ। মনটি ভালো, কিন্তু প্রজাপতির মতো ছটফট করে—একজায়গায় মন স্থির করতে পারে না। তাছাড়া কাজলের তো ঘন ঘন ট্রান্সফারের কাজ। আমেদাবাদ পাঠিয়ে দেবার কথা হচ্ছে।"

সুধন্যবাবু কিছু বলার মতো কথা পাচ্ছেন না। দ্বৈপায়ন নিজেই বললেন, "এমনও হতে পারে যে এই বাড়িতে কেবল আমি এবং খোকন রয়ে গেলাম।"

কপালে হাত রাখলেন দ্বৈপায়ন। "আমি আর ক'দিন? কিন্তু সংসারটা গুছিয়ে রেখে যেতে পারলাম না, সুধন্য। প্রতিভার সঙ্গে দেখা হলে বকাবকি করবে। বলবে, দুটো ছেলেকে মানুষ করে, মাত্র একজনের দায়িত্ব তোমার ওপরে দিয়ে এলাম, সে-কাজটাও পারলে না?"

"চাকরির যে এমন অবস্থা হবে, তা কি কেউ কল্পনা করেছিল?" বন্ধুকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন সুধন্যবাবু। "শুধু তোমার ছেলে নয়, যেখানে যাচ্ছি সেখানেই হাহাকার। হাজার হাজার নয়, লাখ লাখ নয়, এখন শুনছি বেকারের সংখ্যা লক্ষমাত্রা ছাড়িয়ে কোটিতে হাজির হয়েছে।"

দ্বৈপায়ন শুধু বললেন, "হুঁ।" এই শব্দ থেকে তাঁর মনের সঠিক অবস্থা বোঝা গেলো না।

সুধন্যবাবু বললেন, "এখন তো আর কাজকর্ম নেই—মন দিয়ে খবরের কাগজটা পড়ি। কাগজে লিখছে, এতো বেকার পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। এই একটা ব্যাপারে আমরা নিঃসন্দেহে ফার্স্ট হয়েছি—দুনিয়ার কোনো জাত অদূর ভবিষ্যতে আমাদের এই সম্মান থেকে সরাতে পারবে না। ইন্ডিয়ার মধ্যে আবার আমরা বাঙালীরা বেকারীতে গোল্ড মেডেল নিয়ে বসে আছি।"

আরামকেদারায় শুয়ে দ্বৈপায়ন আবার বললেন, "হুঁ।"

সুধন্যবাবু বললেন, "জিনিসটা বীভৎস। লেখাপড়া শিখে, কত স্বপ্ন কত আশা নিয়ে লাখ লাখ স্বাস্থ্যবান ছেলে চুপচাপ ঘরে বসে আছে, আর মাঝে মাঝে কেবল দরখাস্ত লিখছে--এ দৃশ্য ভাবা যায় না। সমস্যাটা বিশাল বুঝলে দ্বৈপায়ন। সুতরাং তুমি একলা কী করবে?"

মন তবু বুঝতে চায় না। দ্বৈপায়নের কেমন ভয় হয়, প্রতিভার সঙ্গে দেখা হলে এইসব যুক্তিতে সে মোটেই সন্তুষ্ট হবে না। বরং বলে বসবে, তুমি-না বাপ? মা-মরা ছেলেটার জন্যে শুধু খবরের কাগজী লেকচার দিলে!

সুধন্যবাবু বললেন, "সারাজন্ম খেটেখুটে পেনসন নিয়ে যে একটু নিশ্চিন্তে জীবন কাটাবে তার উপায় নেই। ছেলেরা মানুষ না হলে নিজেদের অপরাধী মনে হয়।"

সুধন্যবাবু উঠতে যাচ্ছিলেন। দ্বৈপায়ন বললেন, "এ-সম্বন্ধে তোমার মেয়ে একবার কি লিখেছিল না?"

সুধন্যবাবু আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "একবার কেন? মেয়ে প্রায়ই লেখে। ওখানকার পলিসি হলো—নিজের বর নিজে খোঁজো—ওন-ইওর-ওন টেলিফোনের মতো। ইচ্ছে হলে বড়জোর বাপ-মাকে কনসাল্ট করো। কিন্তু দায়িত্বটা তোমার। তেমনি চাকরি

খুঁজে দেবার দায়িত্ব বাপ-মায়ের নয়! তোমার গোঁফ-দাড়ি গজিয়েছে, সাবালক হয়েছো—এখন নিজে চরে খাও।"

সোমনাথের কথা সংগে সংগে মনে পড়ে গেলো দ্বৈপায়নের। মনের সঙ্কোচ ও দ্বিধা কাটিয়ে তিনি বললেন, "ভাবছিলাম, খোকনের জন্যে কানাডায় কিছু করা যায় কিনা। এখানে চাকরি-বাকরির যা অবস্থা হলো।"

সুধন্যবাবু কোনো আশা দিতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত দায়সারাভাবে উত্তর দিলেন, "তুমি যখন বলছো, তখন খুকীর কাছে আমি সব খুলে লিখতে পারি। কিন্তু আমি যতদূর জানি, প্রতি হপ্তায় কলকাতা থেকে এধরনের অনুরোধ জামাইয়ের কাছে দু-তিনখানা যায়। কানাডিয়ানরা আগে অনেক ইন্ডিয়ান নিয়েছে—এখন ওরা চালাক হয়ে গিয়েছে। ডাক্তার, ইনজিনীয়ার, টেকনিশিয়ান ছাড়া আর কাউকে কানাডায় ঢোকবার ভিসা দিচ্ছে না।"

দ্বৈপায়ন এই ধরনের উত্তর পাবার জন্যেই প্রস্তুত ছিলেন। কানাডাকে তিনি দোষ দিতে পারেন না। ঢালাও দরজা খুলে রাখলে, কানাডার অবস্থা এ-দেশের মতো হতে বেশি সময় লাগবে না।

তবু মনটা খারাপ হলো দ্বৈপায়নের। সুধন্যর জামাইয়ের বিদেশে যাওয়ার সময় পাসপোর্টের গোলমাল ছিল। সে-গোলমাল দ্বৈপায়নই সামলেছিলেন। খুকীর পাসপোর্ট তৈরির সময়েও দ্বৈপায়নকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। সুধন্য তখন অবশ্য ওর দুটো হাত ধরে বলেছিলেন, "তোমার ঋণ জীবনে শোধ করতে পারবো না।"

বিরক্তিটা সুধন্যর ওপর আর রাখতে পারছেন না দ্বৈপায়ন। মনে হচ্ছে, তিনকাল গিয়ে জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। এখনও তাঁকে সংসারের কথা ভাবতে হবে কেন? দ্বৈপায়নের অকস্মাৎ মনে হলো, পাশ্চাত্ত্য দেশের বাপ-মায়েরা অনেক ভাগ্যবান—তাঁদের দায়দায়িত্ব অনেক কম। মেয়ের বিয়ে এবং ছেলের চাকরি—এই দুটো বড় অশান্তি থেকে তাঁরা বেঁচেছেন।

সুধন্যবাবু বিদায় নেবার পরও দ্বৈপায়ন অনেকক্ষণ চুপচাপ বারান্দায় বসেছিলেন। বাইরে কখন অন্ধকার নেমে এসেছে। রাস্তা দিয়ে অফিসের লোকেরা ইতিমধ্যে বাড়ি ফিরে এসেছে। মাঝে মাঝে দু-একটা গাড়ি কেবল এ অঞ্চলের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে।

"বাবা, আপনি কি ঘুমিয়ে পড়লেন?" বড় বউমার ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেলেন দ্বৈপায়ন।

সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে সদ্যপ্রসাধিতা শ্রীময়ী বউমাকে দেখতে পেলেন দ্বৈপায়ন।

"এসো মা," বললেন দ্বৈপায়ন।

"আপনি স্নান করবেন না, বাবা?" স্নিগ্ধ স্বরে কমলা জিজ্ঞেস করলো।

"এখানে বসে থাকলেই নানা ভাবনা মাথার মধ্যে এসে ঢোকে, বউমা। বুড়োবয়সে কিছু করবার ক্ষমতা থাকে না, কিন্তু ভাবনাটা রয়ে যায়। অথচ কী যে ভাবি, তা নিজেও অনেক সময় বুঝতে পারি না।"

"বাবা, বেশি রাত্রে স্নান করলে আপনার হাঁচি আসে। আপনি বরং ঠান্ডা জলে গা মুছে নিন," শ্বশুরকে কমলা প্রায় হুকুম করলো।

দ্বৈপায়ন জিজ্ঞেস করলেন, "মেজ বউমা কোথায়?"

"কাজলের মেজ সায়েব নাইজিরিয়াতে বদলী হয়ে যাচ্ছেন—তাই পার্টি আছে। ওরা দুজন একটু আগেই বেরুলো। ফিরতে হয়তো দেরি হবে।"

দ্বৈপায়ন বললেন, "বিলিতী অফিসের এই একটা দোষ। অনেক রাত পর্যন্ত পার্টি না করলে সায়েবরা খুশী হন না।"

কমলা শ্বশুরকে আশ্বাস দিলো, "এবার কমে যাবে। কারণ, নতুন মেজ সায়েব ইন্ডিয়ান।"

"কী নাম?" দ্বৈপায়ন জিজ্ঞেস করলেন।

"মিস্টার চোপরা, বোধহয়," কমলা জানালো।

"ওরে বাবা! তাহলে বলা যায় না, হয়তো বেড়েও যেতে পারে।"

কমলা বললো, "সিধু নাপিতকে কাল আসতে বলে দিয়েছি, বাবা! অনেকদিন আপনার চুল কাটা হয়নি।"

"কালকে কেন? পরশু বললেই পারতে," দ্বৈপায়ন মৃদু আপত্তি জানালেন।

"পরশু যে আপনার জন্ম বার," কমলা মনে করিয়ে দিলো। জন্ম বারে যে চুল ছাঁটতে নেই, এটা শাশুড়ীর কাছে সে অনেকবার শুনেছে।

দ্বৈপায়ন নিজের মনেই হাসলেন। তারপর বললেন, "চুল ছাঁটার কথা বলে ভালোই করেছো, বউমা। ঠিক সময়ে চুল ছাঁটা না হলে তোমার শাশুড়ী ভীষণ চটে উঠতেন।"

মুখ টিপে হাসলো কমলা। শ্বশুর-শাশুড়ীর ঝগড়া সে নিজের চোখে দেখেছে এবং নিজের কানে শুনেছে। শাশুড়ী রেগে উঠলে বলতেন, "যদি আমার কথা না শোনো তাহলে রইলো তোমার সংসার। আমি চললাম।"

শ্বশুরমশায় বলতেন, "যাবে কোথায়?"

শাশুড়ী ঝাঁঝিয়ে উঠতেন, "তাতে তোমার দরকার? যেদিকে চোখ যায় সেদিকে চলে যাবো।"

বাবার কী সেসব কথা মনে পড়ছে? নইলে উনি অমন অসহায়ভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন কেন? মায়ের কথা ভেবে বাবা রাতের নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

দ্বৈপায়ন নিজেকে শান্ত করে নিলেন। তারপর সস্নেহে বললেন, "ভোম্বলের কোনো খবর পেলে?"

স্বামী ট্যুরে গিয়েছেন বোম্বাইতে। কমলা বললো, "আজই অফিস থেকে খবর পাঠিয়েছেন। টেলেক্সে জানিয়েছেন, ফিরতে আরও দেরি হবে। হেড অফিসে কী সব জরুরী মিটিং হচ্ছে।"

দ্বৈপায়ন বললেন, "হয়তো ওর প্রমোশনের কথা হচ্ছে। টেকনিক্যাল ডিভিসনের ডেপুটি ম্যানেজার হলে তো অনেক বেশি দায়িত্ব নিতে হবে।"

কমলা চুপ করে রইলো। দ্বৈপায়ন বললেন, "জানো বউমা, আই অ্যাম প্রাউড অফ ভোম্বল। ওর জন্যে কোনোদিন একটা প্রাইভেট টিউটর পর্যন্ত আমি রাখিনি। নিজেই পড়াশুনা করেছে, নিজেই আই-আই-টিতে ভর্তি হয়েছে, নিজেই ফ্রি স্টুডেন্টশিপ যোগাড় করেছে, তারপর চাকরিটাও নিজের মেরিটে পেয়েছে। এগারো বছর আগে যখন তোমার সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক হলো, তখনও ভোম্বল ছিল একজন অর্ডিনারি টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট। আর চল্লিশে পা দিতে-না-দিতে ডেপুটি ম্যানেজার।"

হঠাৎ চুপ করে গেলেন দ্বৈপায়ন। তিনি কি ভাবছেন কমলা তা সহজেই বলতে পারে। সোমনাথের কথা চিন্তা করে তিনি যে হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন, তা কমলা বুঝতে পারছে। যোধপুর পার্কের এই বাড়ির একটা ভবিষ্যৎ কল্পনাচিত্র যে দ্বৈপায়নের মনে মাঝে মাঝে উঁকি মারে তা কমলার জানা আছে।

ছবিটা এইরকম। ভোম্বল বোম্বাই বদলি হয়েছে। বউমাকেও স্বামীর সঙ্গে যেতে হয়েছে। যাবার আগে সে বাবাকে নিয়ে যাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছে। বাবা রাজী হননি। কাজলও বদলি হয়েছে আমেদাবাদে। আর মেজ বউমা (বুলবুল) তো স্বামীর সঙ্গে যাবার জন্যে এক-পা বাড়িয়েই আছে। তখন এ-বাড়িতে কেবল দ্বৈপায়ন এবং সোমনাথ।

বড় বউমার দিকে অসহায়ভাবে তাকালেন দ্বৈপায়ন। কিন্তু কোনো কথা বললেন না। সঞ্চয় বলতে তাঁর বিশেষ কিছুই নেই—মাত্র হাজার দুয়েক টাকা। আর পেনসন, সে তো তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে। তারপর সোমনাথ কী করবে? এ-বাড়িটাও তাঁর নিজস্ব নয়। দোতলা করবার সময় ভোম্বল ও কাজল দুজনেই কিছু কিছু টাকা দিয়েছে। কাজলের মাইনে থেকে এখনও কো-অপারেটিভের ঋণের টাকা মাসে মাসে কাটছে।

কমলা বললো, "বাবা, আপনাকে একটু হরলিক্স এনে দেবো? আপনাকে আজ বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে।"

দ্বৈপায়ন নিজের ক্লান্তি অস্বীকার করতে পারলেন না। বললেন, "কিছুই করি না, তবু আজকাল মাঝে মাঝে কেন যে এমন দুর্বল হয়ে পড়ি।"

কমলা বললো, "আপনি যে কারুর কথা শোনেন না, বাবা। দিনরাত খোকনের জন্যে চিন্তা করেন।"

দ্বৈপায়ন একটু লজ্জা পেলেন। মনে হলো পুত্রবধূর কাছে তিনি ধরা পড়ে গিয়েছেন।

কমলার মধ্যে কি মধুর আত্মবিশ্বাস। সে বললো, "আপনি শুধু-শুধু ভাবেন ওর জন্যে। আমার কিন্তু একটুও চিন্তা হয় না। অত ভালো ছেলের ওপর ভগবান কখনও নির্দয় হতে পারেন না।"

বার্ধক্যের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে দ্বৈপায়ন যদি বত্রিশ বছর বয়সের বউমার অর্ধেক বিশ্বাসও পেতেন তাহলে কি সুন্দর হতো। লক্ষ্মী-প্রতিমার মতো বউমার প্রশান্ত মুখের দিকে তাকালেন দ্বৈপায়ন।

ধীর শান্ত কণ্ঠে কমলা বললো, "ওঁর প্রমোশন অত তাড়াতাড়ি হচ্ছে বলে মনে হয় না। আর হলেও, খোকনের বিয়ে না দিয়ে আমি কলকাতা ছাড়ছি না।"

অনেক দুঃখের মধ্যেও দ্বৈপায়নের হাসি আসছে। ভাবলেন, একবার বউমাকে মনে করিয়ে দেন—রুজি-রোজগার না থাকলে কোনো ছেলের বিয়ের কথা ভাবা যায় না। আড়াই বছর ধরে সোমনাথ চাকরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অনেক অ্যাপ্লিকেশন তিনি নিজে লিখে দিয়েছেন। প্রতিদিন তিনখানা করে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন তিনি তন্ন তন্ন করে দেখেন। সেগুলোতে লাল পেন্সিলে দাগ দেন প্রথমে। তারপর ব্লেড দিয়ে নিখুঁতভাবে কেটে পিছনে কাগজের নাম এবং তারিখ লিখে রাখেন।

দ্বৈপায়নের মনে পড়ে গেলো আজকের খবরের কাগজের কাটিংগুলো ওঁর কাছেই পড়ে আছে। কাটিংগুলো বউমার হাতে দিয়ে বললেন, "সোমকে এখনই এগুলো দিয়ে দাও।"

বাবার উদ্বেগের কথাও বউমা জানে। আগামীকাল ভোরবেলায় বউমাকে জিজ্ঞেস করবেন, "কাটিংগুলো খোকনকে দিয়েছো তো? ও যেন বসে না থাকে। তাড়াতাড়ি অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে দেওয়া ভালো। দুটো অ্যাপ্লিকেশনে আবার তিন টাকার পোস্টাল অর্ডার চেয়েছে।"

কমলা জানে সোমকে ডেকে সোজাসুজি এসব কথা বলতে আজকাল বাবা পারেন না। দুজনেই অস্বস্তি বোধ করে। অনেক সময় বাবা ডাকলেও সোম যেতে চায় না। যাচ্ছি-যাচ্ছি করে একবেলা কাটিয়ে দেয়। কমলাকে দু'পক্ষের মধ্যে ছুটোছুটি করতে হয়। কমলা বললো, "সোমকে আমি সব বুঝিয়ে বলে দিচ্ছি। পোস্টাল অর্ডারের টাকাও তো ওর কাছে দেওয়া রয়েছে।"

দ্বৈপায়ন তবুও নিশ্চিত হতে পারলেন না। ওঁর ইচ্ছে, সোমনাথ নাইট পোস্টাপিস থেকে এখনই পোস্টাল অর্ডার কিনে আনুক এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন টাইপ হয়ে যাক, যাতে কাল সকালেই রেজেস্ট্রি-ডাকে পাঠানো যায়।

কমলা বাবাকে শান্ত করবার জন্যে বললো, "দরখাস্ত নেবার শেষ দিন তো তিন সপ্তাহ পরে।"

নিজের অস্বস্তি চেপে রেখে দ্বৈপায়ন বললেন, "তুমি জানো না, বউমা. আজকাল ডাকঘরের যা অবস্থা হয়েছে, গিয়ে দেখবে একটাকা দু'টাকার পোস্টাল অর্ডার ফুরিয়ে গেছে। তারপর রেজেস্ট্রি-ডাকের তো কথাই নেই। তিন ঘণ্টার পথ যেতে তিন সপ্তাহ লাগিয়ে দেয়। যারা চাকরির বিজ্ঞাপন দেয় তারাও ছুতো খুঁজছে। লাস্ট ডেটের আধঘণ্টা পরে চিঠি এলেও খুলে দেখবে না—একেবারে ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দেবে।"

নিজের ইচ্ছে যাই হোক, বউদির অনুরোধ এড়ানো যায় না। কমলা বউদি সোমনাথকে বললেন, "লক্ষ্মীটি সকালবেলাতেই পোস্টাপিসে অ্যাপ্লিকেশনটা রেজেস্ট্রি করে এসো—বাবা শুনলে খুশী হবেন। বুড়ো মানুষ, ওঁকে কষ্ট দিয়ে কী লাভ?"

চিঠি ও খাম টাইপ করিয়ে সোমনাথ পোস্টাপিসের দিকে যাচ্ছিল। পোস্টাল অর্ডার কিনে ওখান থেকেই সোজা পাঠিয়ে দেবে।

পোস্টাপিসের কাছে সুকুমারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। সুকুমার চিৎকার করে বললো, "কী হে নবাব বাহাদুর, সকালবেলায় কোথায় প্রেমপত্তর ছাড়তে চললে?"

সোমনাথ হেসে ফেললো। "তোর কী ব্যাপার? দু-তিনদিন পাত্তা নেই কেন?"

"তুমি তো মিনিস্টারের সি-এ নও যে তোমার সঙ্গে আড্ডা জমাতে পারলে চাকরি পাওয়া যাবে। নিজের মাথার ব্যথায় পাগল হয়ে যাচ্ছি। রাইটার্স বিল্ডিংসের ভিতরে ঢোকা আজকাল যা শক্ত করে দিয়েছে মাইরি, তোকে কী বলবো!"

"মিনিস্টারের সি-এরাই হয়তো চায় না বাজে লোক এসে জ্বালাতন করুক," সোমনাথ বললো।

"সে বললে তো চলবে না, বাবা। মিনিস্টারের সি-এ যখন হয়েছো, তখন লোকের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। বিশেষ করে আমাদের মতো যারা এম-এল-এর থ্রু দিয়ে এসেছে তাদের এড়িয়ে যেতে পারবে না।"

সুকুমার এবার বললো, "চল তোর সঙ্গে পোস্টাপিসে ঘুরে আসি। ভয় নেই তোর অ্যাপ্লিকেশনে ভাগ বসাতে যাচ্ছি না। তুই যেখানে খুশী চিঠি পাঠা, আমি বাগড়া দেবো না।"

এবার সুকুমার বললো, "তোকে কেন মিথ্যে বলবো, গত দু-দিন জি-পি-ওর সামনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাকরির সাইক্লোস্টাইল করা ফর্ম বেচে টু-পাইস করেছি। কেরানির পোস্ট তো, হুড়-হুড় করে ফর্ম বিক্রি হচ্ছে মাইরি। এক ব্যাটা কাপুর তাল বুঝে হাজার হাজার ফর্ম সাইক্লোস্টাইল করে হোলসেল রেটে বাজারে ছাড়ছে। টাকায় দশখানা ফর্ম কিনলুম কাপুরের কাছ থেকে, আর বিক্রি হলো পনেরো পয়সা করে। তিরিশখানা ফর্ম বেচে পুরো দেড়টাকা পকেটে এসে গেলো।"

"কাপুর সায়েব তো ভালো বুদ্ধি করেছে," সোমনাথ বললো।

সুকুমার বললো, "এদিকে কিন্তু কেলেংকেরিয়াস কান্ড। বাজারে কেউ জানে না— মিনিস্টারের সি-এর সঙ্গে দেখা না করতে গেলে আমার কানেও আসতো না। পনেরোটা পোস্টের জন্যে ইতিমধ্যে এক লাখ অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়েছে। সেই নিয়ে ডিপার্টমেন্টে প্রবল উত্তেজনা। টপ অফিসার দুবার মিনিস্টারের সি-এর সঙ্গে দেখা করে গেলো।"

"তাহলে ওদের টনক নড়েছে। দেশের অবস্থা কোনদিকে চলছে ওরা বুঝতে পেরে ছোটাছুটি করছে," সোমনাথ খবরটা পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হলো।

"দূর, দেশের জন্যে তো ওদের ঘুম হচ্ছে না। ওরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত। এক লাখ অ্যাপ্লিকেশন ইতিমধ্যে এসে গেছে শুনে সি-এ বললেন, কীভাবে এর থেকে সিলেকশন করবেন?

"অফিসার বললেন, সিলেকশন তো পরের কথা। তার আগে আমি কী করবো তাই বলুন? প্রত্যেক অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে তিন টাকার ক্রসড্ পোস্টাল অর্ডার এসেছে। তিন টাকার পোস্টাল অর্ডার হয় না, তাই মিনিমাম এক টাকার তিনখানা অর্ডার প্রত্যেক চিঠির সঙ্গে এসেছে। তার মানে এক লাখ ইনটু থ্রি অর্থাৎ তিন লাখ ক্রসড্ অর্ডারের পিছনে আমাকে সই করতে হবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা দেবার আগে। সব কাজ বন্ধ করে, দিনে পাঁচশোখানা সই করলেও আমার আড়াই বছর সময় লেগে যাবে। অথচ ফাইনানসিয়াল ব্যাপার, সই না করলেও অডিট অবজেকশনে চাকরি যাবে।"

হা-হা করে হেসে উঠলো সুকুমার। বললো, "লোকটার মাইরি, পাগল হবার অবস্থা। বলছে, হোল লাইফে কখনও এমন বিপদে পড়েনি।"

কোন্ ডিপার্টমেন্ট রে?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো। তারপর উত্তরটা শুনেই ওর মুখ কালো হয়ে গেলো। ওই পোস্টের জন্যেই আরো তিন টাকার পোস্টাল অর্ডার কিনতে যাচ্ছে সে।

সুকুমার বললো, "তোর তিনটে টাকা জোর বেঁচে গেলো। ওই টাকায় ফুটবল খেলা দেখে, বাদাম ভাজা খেয়ে আনন্দ করে নে।"

খেলার মাঠের নেশাটা সোমনাথের অনেকদিনের। সুকুমারও ফুটবল পাগল। দুজনে

অনেকবার একসঙ্গে মাঠে এসেছে। সোমনাথ বললো, "চল মাঠেই যাওয়া যাক।" সুকুমারের আত্মসম্মান জ্ঞান টনটনে। সে কিছুতেই সোমনাথের পয়সায় মাঠে যেতে রাজী হলো না।

সোমনাথের হঠাৎ অরবিন্দের কথা মনে পড়ে গেলো। সুকুমারকে বললো, "শুনেছিস, রত্নার সঙ্গে অরবিন্দের বিয়ে। বাড়িতে একটা কার্ড রেখে গেছে।"

সুকুমার বললো, "আমাকেও একটা কার্ড পাঠিয়েছে ডাকে। শুভবিবাহ মার্কা কার্ড দেখে বাড়িতে আবার কতরকম টিপ্পনী কাটলো। ভেবেছিলুম, অরবিন্দর বিয়েতে যাবো—হাজার হোক বর-কনে দুজনেই আমার ফ্রেন্ড। কিন্তু বিয়ে মানেই তো বুঝতে পারিস।"

সোমনাথ চুপ করে রইলো। সুকুমার বললো, "আমি ভেবেছিলুম, খালি হাতেই একবার দেখা করে আসবো। সেই শুনে আমার বোনদের কি হাসি। বললো, 'তোর কি লজ্জা-শরম কিছুই রইলো না দাদা? লুচি-মাংস খাবার এতোই লোভ যে শুধু হাতে বিয়ে বাড়ি যেতে হবে?'"

সোমনাথের বোন নেই। সুতরাং বোনেদের সঙ্গে ভাইদের কী রকম রেষারেষির সম্পর্ক হয় তা সে জানে না।

সুকুমার বললো, "কণাকেও দোষ দিতে পারি না। ওর বন্ধুর বিয়েতেও নেমন্তন্নের চিঠি এসেছিল। উপহার কিনতে পারা গেলো না তাই বেচারা যেতে পারলো না।"

সোমনাথ বললো, "অরবিন্দ ছেলেটার ক্রেডিট আছে বলতে হবে। বেস্ট-কীন-রিচার্ডসের মতো কোম্পানিতে ঢুকেছে।"

সোমনাথের কথা শুনে সুকুমার ফিক করে হেসে ফেললো। "ক্রেডিট ওর বাবার। আয়রন স্টীল কনট্রোলে বড় চাকরি করেন—ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছেন।"

একটু থেমে সুকুমার বললো, "তবে ভাই আমার রাগ হয় না।"

"কেন?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো।

"ওদের ব্যাচে বারোজন ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি নিয়েছে—তার মধ্যে অরবিন্দই একমাত্র লোকাল বয়। আর সব এসেছে হরিয়ানা, পাঞ্জাব এবং তামিলনাড়ু থেকে। সব ভাগ্যবানের পিছনে হয় মামা না-হয় বাবা আছেন! অথচ অরবিন্দ বলছিল, 'কোনো ব্যাটা স্বীকার করবে না যে দিল্লীতে বড়-বড় সরকারী পোস্টে ওদের আত্মীয়স্বজন আছেন। সবাই নাকি নিজেদের বিদ্যে বুদ্ধি এবং মেরিটের জোরে বেস্ট-কীন-রিচার্ডসে ঢুকেছে! কলকাতার ছেলেদের তো কোনো মেরিট নেই!' জানিস সোমনাথ, এই বেস্ট-কীন-রিচার্ডস যেদিন ঝুনঝুনওয়ালা কিংবা বাজোরিয়ার হাতে যাবে, সেদিন দেখবি সমস্ত মেরিট আসছে রাজস্থানে ওঁদের নিজেদের গ্রাম থেকে।"

সোমনাথ ও সুকুমার দুজনেই গম্ভীর হয়ে উঠলো। তারপর একসঙ্গে হঠাৎ দুজনেই হেসে উঠলো। সুকুমার বললো, "আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খোঁজ করে মাথায় রক্ত তুলছি কেন? আমরা তো অফিসার হতে চাইছি না। আমরা কেরানির পোস্ট চাইছি। আর আমার যা অবস্থা, আমি বেয়ারা হতেও রাজী আছি।"

◆

আজকাল বাবাকে দেখলে কমলার কষ্ট হয়। ওপরের ওই বারান্দায় বসে অসহায়ভাবে ছটফট করেন ছোট ছেলের জন্যে।

আরামকেদারায় সোজাভাবে বসে দ্বৈপায়ন বললেন, "জানো বউমা, যে-কোনো একটা চাকরি হলেই আমি সন্তুষ্ট। খোকনের একটা স্থিতি প্রয়োজন।"

কমলা গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বললো, "নিশ্চয় স্থিতি হবে বাবা।"

"কোনো লক্ষণ তো দেখছি না, মা," গভীর দুঃখের সঙ্গে বললেন দ্বৈপায়ন।

চোখের চশমাটা খুলে সামনের টেবিলে রেখে দ্বৈপায়ন বললেন, "যার দাদারা ভালো চাকরি করে, তার পক্ষে একেবারে সাধারণ হওয়া বড্ড যন্ত্রণার। খোকন সেটা বোঝে কি না জানি না, কিন্তু আমার খুব কষ্ট হয়।"

কমলা অনেকবার ভেবেছে, দাদারা নিজেদের অফিসে সোমের জন্যে একটু চেষ্টা করে দেখলেই পারে। আজ শ্বশুরের কাছে সেই প্রস্তাব তুললো কমলা।

দ্বৈপায়ন বললেন, "কথাটা যে আমার মাথায় আসেনি তা নয়। ভোম্বল এবং কাজল দুজনকেই খোঁজখবর করতে বলেছিলাম। কিন্তু উপায় নেই, নিজের ভাইকে অফিসে ঢুকোলে ইউনিয়ন হৈ-চৈ বাধাবে। ভোম্বলের অফিসে তো বড় সায়েব গোপন সার্কুলার দিয়েছেন, কোনো অফিসারের আত্মীয়কে চাকরিতে ঢোকাতে হলে তাঁর কাছে পেপার পাঠাতে হবে। সোজাসুজি বলে দিয়েছেন ব্যাপারটা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না।"

"দুই ভাই যদি গুণের হয়? তবু তারা এক অফিসে জায়গা পাবে না?" কমলা বড় সায়েবের সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারলো না।

দ্বৈপায়ন বললেন, "তা হলেও নয়। সায়েবদের ধারণা, একই পরিবারের বেশি লোক একই অফিসে ঢুকলে নানা সমস্যা দেখা দেয়।"

কমলার তবু ভালো লাগছে না। সে বললো, "একই পরিবারের লোক এক অফিসে থাকলে বরং সুবিধে। এ ওকে দেখবে।"

হাসলেন দ্বৈপায়ন। বললেন, "বউমা, কর্মস্থল এবং ফ্যামিলি এক নয়, তুমি ভোম্বলকে জিজ্ঞেস করে দেখো।"

কমলা কিছুতেই একমত হতে পারছে না। সে বললো, "কেন বাবা? ওঁদের অফিস থেকে যে হাউস-ম্যাগাজিন আসে তাতে যে প্রত্যেক সংখ্যায় লেখা হয়, কোম্পানিও একটা পরিবার। প্রত্যেকটি কর্মচারি এই পরিবারের লোক।"

হাসলেন দ্বৈপায়ন। "ওটা সত্যি কথা নয়, বউমা। নাম-কা-ওয়াস্তে বলতে হয়, তাই বড়-কর্তারা বলেন। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করেন না। ভোম্বল একটা বই এনে দিয়েছিল, তাতে পড়েছিলাম—অফিসটা হলো পরিবারের উল্টো। অফিসে আদর্শের কোনো দাম নেই—সেখানে যে ভালো কাজ করে, যে বেশি লাভ দেখাতে পারে তারই খাতির। সে লোকটা মানুষ হিসেবে কেমন তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। অথচ ফ্যামিলিতে মনুষ্যত্বের দামটাই বেশি দেবার চেষ্টা করি আমরা। দয়া মায়া স্নেহ মমতা এসবের কোনো স্বীকৃতি নেই অফিসে। যে ভুল করে, দোষ করে, নিয়ম ভাঙে, ঠিক মতো প্রোডাকশন দেয় না, কর্মক্ষেত্রে তাকে নির্দয়ভাবে শাসন করতে হয়—সংসারে কিন্তু তা হয় না। অফিসে যে ভালো কাজ করে তার দাম। বাড়িতে কোনো ছেলে পরীক্ষায় ফেল করলেও তার ওপর ভালোবাসা কমে যায় না। বরং অনেক সময় ভালোবাসা বাড়ে।"

কমলা এতো বুঝতো না। সে সবিস্ময়ে সরল মনে বললো, "তাহলে পরিবারটাই তো অনেক ভালো জায়গা, বাবা।"

দ্বৈপায়ন হাসলেন। "সে-কথা বলে। সংসারটাই তো আমাদের আশ্রয়—সংসারের ভালোর জন্যেই তো লোকে আপিসে যায়।"

কমলা বললো, "আপিসে তো যাইনি, তাই ব্যাপারটা কখনও বুঝিনি, বাবা।"

"অনেকে সারাজন্ম আপিস গিয়েও ব্যাপারটা বোঝে না, মা। সংসারের মূল্যও তারা জানে না।"

কমলা তার পদ্মের মতো চোখ দুটো বড় বড় করে বিস্ময়ে শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে থাকে। দ্বৈপায়ন বললেন, "ভোম্বলকে বোলো তো বইটা আবার নিয়ে আসতে। আর একবার উল্টে দেখবো, তুমিও পড়ে নিও। একটা কথা আমার খুব ভালো লেগেছিল—আমাদের এই

সমাজটাও এক ধরনের অরণ্য। ইট-কাঠ-পাথর দিয়ে তৈরি এই অরণ্যে জঙ্গলের নিয়মই চালু রয়েছে। এরই মধ্যে পরিবারটা হলো ছোট্ট নিরাপদ কুঁড়েঘরের মতো। এখান থেকে বেরোলেই সাবধান হতে হবে; সবসময় মনে রাখতে হবে আমরা মানুষের জঙ্গলে বিচরণ করছি।"

হতাশ হয়ে পড়লো কমলা। "তাহলে বলছেন, ভাইদের অফিসে সোমের কোনো আশা নেই?"

দুঃখের সঙ্গেই দ্বৈপায়ন স্বীকার করলেন, "কোনো সম্ভাবনাই নেই। এবং চেষ্টা করাও ঠিক হবে না, কারণ তাতে দুই দাদার কাজের ক্ষতি হতে পারে।"

দ্বৈপায়ন এবার বাথরুমে গা মুছবার জন্যে ঢুকলেন। কমলা সেই ফাঁকে দ্রুত এক গ্লাস হরলিক্স তৈরি করে নিয়ে এলো।

ঠান্ডা জলের সংস্পর্শে এসে দ্বৈপায়ন এবার বেশ তাজা অনুভব করছেন। শরীরের অবসাদ নষ্ট হয়েছে।

কমলা উঠতে যাচ্ছিল। দ্বৈপায়ন বললেন, "রান্না তো শেষ হয়ে গিয়েছে?"

"খাবার লোক তো এবেলায় কম। নগেনদি কেবল রুটিগুলো সেঁকছেন," কমলা জানালো।

দ্বৈপায়নের ইচ্ছে বউমা আরও একটু বসে যায়। বললেন, "তোমার যদি অসুবিধে না হয়, তাহলে আরও একটু বসো না, বউমা।"

বাবার মন বোঝে কমলা। বউমার সঙ্গেই একমাত্র তিনি সহজ হতে পারেন। আর সবার সঙ্গে কথা বলার সময় কেমন যেন একটা দূরত্ব এসে যায়। এই দূরত্ব কীভাবে গড়ে উঠেছে কেউ জানে না। ছেলেরা কাছে এসে তাঁর কথা শুনে যায়, কিছু খবর দেবার থাকলে দেয়, কিন্তু সহজ পরিবেশটা গড়ে ওঠে না। কমলা বাবাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, কিন্তু প্রয়োজন হলে প্রশ্ন তোলে। আর বাবারও যে বউমার ওপর বেশ দুর্বলতা আছে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। বউমা প্রশ্ন করলে রাগ তো দূরের কথা তিনি খুশী হন। ছেলেদের অত সাহস নেই। তারা প্রতিবাদও করে না, প্রশ্নও করে না। তবে তারা বাবার অবাধ্য হয় না।

কমলা বললো, "বাবা, আপনি দুবেলা বেড়াতে বেরোবেন।"

"বেশ তো আছি, বউমা। এখানে বসে বসেই তো পৃথিবীর অনেকটা দেখতে পাচ্ছি।" দ্বৈপায়ন সস্নেহে উত্তর দেন। তারপর একটু থেমে বললেন, "আজকাল আর হাঁটতে ভালো লাগছে না। বয়স তো হচ্ছে।"

"আপনার কিছুই বয়স হয়নি," মৃদু বকুনি লাগালো কমলা। "আপনার বন্ধু দেবপ্রিয়বাবু তো আপনার থেকে ছ'মাস আগে রিটায়ার করেছেন। সকাল থেকে টো-টো করছেন, তাস খেলছেন।"

"দেবুটা চিরকালই একটু ফচকে। তাসের নেশা অনেকদিনের। আমার আবার তাসটা মোটেই ভালো লাগে না," দ্বৈপায়ন বললেন।

ছোট মেয়ের মতো উৎসাহে কমলা বললো, "কাকীমা সেদিন দেবপ্রিয়বাবুকে খুব বকছিলেন। কাকাবাবু নাকি কোনো সিনেমা বাদ দেন না। আজকাল ম্যাটিনী শোতে হিন্দী বই পর্যন্ত লাইন দিয়ে দেখে আসেন একা-একা।"

গম্ভীর দ্বৈপায়ন এবার হাসি চাপতে পারলেন না। বললেন, "দেবু তাহলে বুড়ো বয়সে হিন্দী ছবির খপ্পরে পড়লো। বউকে নিয়ে গেলেই পারে—তাহলে বাড়িতে আর অশান্তি হয় না।"

"দোষটা তো কাকাবাবুর নয়," কমলা জানায়। "কাকীমা যে ঠাকুর-দেবতার বই ছাড়া দেখতে যাবেন না।"

এই ধরনের কথাবার্তা বাবার সঙ্গে এ-বাড়ির কেউ বলতে সাহস করবে না।

বাবা যে আবার সোমনাথ সম্পর্কে চিন্তা আরম্ভ করেছেন তা কমলা ওঁর মুখের ভাব দেখেই বুঝলো।

দ্বৈপায়ন জিজ্ঞেস করলেন, "খোকন কোথায়?"

সোমনাথ এখনও ফেরেনি শুনে প্রথমে একটু বিরক্তি এলো দ্বৈপায়নের। ভাবলেন, কোনো দায়িত্বজ্ঞান নেই—বেশ টো-টো করে ঘুরছে। তারপর নিজেকে সামলে নিলেন। ঘোরা ছাড়া ওর কী-ই বা করবার আছে?

ঠিক সময়ে সোমনাথ বাড়ি ফিরলে দ্বৈপায়ন তবু একটু নিশ্চিন্ত হতে পারেন। আজকাল যেরকম খুনোখুনীর যুগ পড়েছে, তাতে মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তা হয় দ্বৈপায়নের। কয়েকবছর আগে সমর্থ মেয়েদেরই একলা বাইরে বেরুতে দিতে ভয় করতো বাবা-মায়েরা। এখন জোয়ান ছেলেদের নিয়ে বেশি চিন্তা। গোপনে গোপনে এদের মনের মধ্যে কখন কীসের চিন্তা আসবে কে জানে। তারপর রাজনীতির নেশায় দলে পড়ে, সমাজের ওপর বিরক্ত হয়ে, কী করে বসবে কে জানে? দ্বৈপায়ন ভাবলেন, আত্মহনন ছাড়া এযুগের অভিমানী ছেলেগুলো অন্য কিছুই জানে না।

কমলা এবার শ্বশুরের চিন্তা নিরসন করলো। বললো, "সোমের বন্ধু অরবিন্দর বৌভাত আজ। যেতে চাইছিল না। আমি জোর করে পাঠিয়েছি।"

"অরবিন্দ তাহলে কাজ পেয়েছে। পড়াশুনোয় ও তো খুব ভালো ছিল না।" দ্বৈপায়ন নিজের মনেই বললেন।

"ওর বাবা চেষ্টা করে কোনো বড় অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছেন. সোম বলছিল।"

দ্বৈপায়ন বউমার এই কথা শুনে অস্বস্তি বোধ করলেন। নিজের অক্ষমতাকে চাপা দেবার জন্যেই যেন সমস্ত দোষ সোমের ওপর চাপাবার চেষ্টা করলেন। বেশ বিরক্তির সঙ্গে বউমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন এমন হলো বলো তো?"

কমলা উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলো।

দ্বৈপায়ন বললেন. "আমি তো কখনও পরীক্ষায় খারাপ করিনি। নিজের চেষ্টায় কম্পিটিশনে স্ট্যান্ড করে সরকারী কাজে ঢুকেছিলাম। ওর দাদাদের জন্যে কোনোদিন তো মাস্টার পর্যন্ত রাখিনি। তারা অত ভালো করলো। অথচ খোকন কেন যে অত অর্ডিনারি হলো?"

কমলা শ্বশুরের সঙ্গে একমত হতে পারছে না। সোম মোটেই অর্ডিনারি নয়। ওর বেশ বুদ্ধি আছে। কমলা বললো, "পরীক্ষাটা আজকাল পুরোপুরি লটারি, বাবা। সোমনাথ তো বেশ বুদ্ধিমান ছেলে।"

দ্বৈপায়ন ঠোঁট উল্টোলেন। "তুমি বলতে চাও, ওর ওপর এগজামিনারের রাগ ছিল?"

"তা হয়তো নয়। কিন্তু আজকাল কীভাবে যে পরীক্ষা-টরিক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষকরাও বোঝেন না যে এর ওপর ছেলেমেয়েদের জীবন নির্ভর করছে।"

"এর মধ্যেই অনেকে ভালো রেজাল্ট করছে. বউমা।" দ্বৈপায়নের গলার স্বরে ছোট ছেলে সম্পর্কে ব্যঙ্গ ফুটে উঠলো।

ছোট দেওর সম্পর্কে কমলার একটু দুর্বলতা আছে। বিয়ের পর থেকে এতোদিন ধরে ছেলেটাকে দেখছে কমলা। দুজনে খুব কাছাকাছি এসেছে।

"ওর মনটা খুব ভালো বাবা," কমলা শান্তভাবে বললো।

"মন নিয়ে এ-সংসারে কেউ ধুয়ে খাবে না, বউমা," বিরক্ত দ্বৈপায়ন উত্তর দিলেন। "পড়াশোনায় ভালো না করলে, দুনিয়াতে কোনো দাম নেই।"

"পড়াশোনায় ভালো অথচ স্বভাবে পাজী এমন ছেলে আজকাল অনেক হচ্ছে, বাবা। তাদের আমার ভালো লাগে না," কমলা বললো। তার ঘোমটা খসে পড়েছিল, সেটা আবার মাথার ওপর তুলে নিলো।

"যে-গোরু দুধ দেয় তার লাথি অনেকে সহ্য করতে রাজী থাকে বউমা," দ্বৈপায়ন বিরক্তভাবেই উত্তর দিলেন।

"খোকন তো চেষ্টা করছে বাবা," কমলা ব্যর্থ চেষ্টা করলো শ্বশুরকে বোঝাবার।

"চেষ্টা নিয়ে সংসারে কী হবে? রেজাল্ট কী, তাই দিয়েই মানুষের বিচার হবে,"

দ্বৈপায়ন যে সোমনাথের ওপর বেশ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছেন তা তাঁর কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

কিন্তু কমলা কী করে সোমনাথের বিরুদ্ধে মতামত দেয়? সোমনাথ তো কখনও বড়দের অবাধ্য হয়নি। বাড়ির সব আইনকানুন খোকন মেনে চলেছে। পড়ার সময় পড়তে বসেছে। অন্য কোনো দুষ্টুমির সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েনি। গোড়ার দিকে সে তো পড়াশোনায় খারাপ ছিল না কিন্তু মা দেহ রাখার পর কী যে হলো। ক্রমশ সোমনাথ পিছিয়ে পড়তে লাগলো। সেকেন্ড ডিভিসনে স্কুল ফাইনাল পাস করলো। বাবার ইচ্ছে ছিল এক ছেলে ইনজিনীয়ার, এক ছেলে চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট এবং ছোট ছেলেকে ডাক্তার করবেন। কিন্তু ভালো নম্বর না থাকলে ডাক্তারিতে ঢোকা যায় না।

কমলার মনে পড়লো, সোমনাথ একবার বউদিকে বলেছিল, "আমাকে অত ভালোবাসবেন না বউদি। আপনার বিশ্বাসের দাম তো আমি দিতে পারবো না। আমি সব বিষয়ে অর্ডিনারি।"

কমলা বলেছিল, "তোমাকে আর পাকামো করতে হবে না।"

সোমনাথ বলেছিল, "মায়ের রং কত ফর্সা ছিল আপনি তো দেখেছেন। দাদারা ফর্সা হয়েছে। আমার রং দেখুন—কালো। ভাগ্যে মেয়ে হইনি, তাহলে বাবাকে এই বাড়ি বিক্রি করতে হতো। পড়াশোনায় কখনও ফাঁকি দিইনি—কিন্তু অর্ডিনারি থেকে গেছি। অনেকে গান-বাজনা কিংবা খেলাধুলোয় ভালো হয়। আমার তাও হলো না।"

দুনিয়ার সব মানুষকে ব্রিলিয়ান্ট হতে হবে, এ কী রকম কথা? পৃথিবীর কোন্ দেশে ক'টা লোক ব্রিলিয়ান্ট হয়? বেশির ভাগ মানুষই তো অতি সাধারণ। কিন্তু তারা কেমন সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রয়েছে। কমলা বুঝতে পারে না, এই দেশের কী হতে চলেছে। ব্রিলিয়ান্ট হোক না-হোক সোমকে খুব ভালো লাগে কমলার। ছেলেটা খুব নরম। ওর মনে নোংরামি নেই। অনেক বাড়িতে এক ভাই আরেক ভাইকে হিংসা করে। সোমের শরীরে হিংসে নেই। আর বউদিকে সে যে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে তা কমলা ভালোভাবে জানে।

বাবাকে আবার বোঝাবার চেষ্টা করলো কমলা। বললো, "আজকালকার ছেলেদের সম্বন্ধে যা শুনি তার থেকে সোম অনেক ভালো। ওর মনটা এখনও সংসারের নোংরামিতে বিষিয়ে যায়নি বাবা।"

দ্বৈপায়ন বিশেষ ভিজলেন না। বললেন, "তোমার কাছে বলতে বাধা নেই, এক-এক সময় মনে হয়—কাউকে বেশি প্রোটেকশন দিতে নেই। বেশি সুখ, বেশি স্বাচ্ছন্দ্য, বেশি নিশ্চয়তার মধ্যে থাকলে অনেক সময় মানুষের ভিতরের আগুনটা জ্বলে ওঠবার সুযোগ পায় না। যাদের দেখবে প্রচন্ড অভাব, প্রচন্ড অপমান, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাদের কোনো ভরসা নেই—তারা অনেক সময় নিজেদের দুঃখের শিকল নিজেরাই ছিঁড়ে ফেলে। তারা অপরের মুখ চেয়ে বসে থাকে না।"

কমলা বুঝতে পারলো বাবা কী বলতে চাইছেন। কিন্তু সব সময় কথাটা সত্যি নয়। সুকুমারকে তো বাবা চেনেন, তাহলে সে তো এতোদিন আশ্চর্য কিছু একটা করে ফেলতো।

কমলা এবার একতলায় নেমে এলো। তার ভয়, সোমনাথ এসব না জেনে ফেলে। রাগের মাথায় বাবা কোনোদিন না সোমনাথের সঙ্গেই এসব আলোচনা করে বসেন। বাইরের সমস্ত দুনিয়া তো বেচারাকে অপমান করছে, এর পর বাড়ির আত্মসম্মানটুকু গেলে ছেলেটা কোথায় দাঁড়াবে?

দ্বৈপায়নও একটু লজ্জা পেলেন। সত্যি, এই সব ছেলে যে এখনও সভ্যভব্য রয়েছে, এটা কম কথা নয়। সুযোগ-সুবিধা না পেয়ে ঘরে ঘরে লক্ষ লক্ষ ছেলে যদি উচ্ছন্নে চলে যায়, তাহলে সেও এক ভয়াবহ ব্যাপার হবে। সত্যিই তো সোমনাথের বিরুদ্ধে বেকারত্ব ছাড়া তাঁর আর কোনো অভিযোগ নেই। একটা চাকরি সে যোগাড় করতে পারেনি। কিন্তু আর কোনো কষ্ট সোমনাথ তো বাবাকে দেয়নি। আজকাল ছেলেপুলে সম্বন্ধে যেসব কথা কানে আসে, তারা যেসব কান্ড বাধিয়ে বসেছে, তাতে বাপ-মায়ের পাগল হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

গতকালই তো দ্বৈপায়ন শুনলেন, অনেক বেকার ছেলে বাড়িতে আজকাল চরম দুর্ব্যবহার করছে। তারা বাড়ির সব সুবিধে নিচ্ছে, অথচ চোখও রাঙাচ্ছে। তারা নিজেদের জামাকাপড় পর্যন্ত কাচে না, একগ্লাস জল পর্যন্ত গড়িয়ে খায় না, বাড়ির কোনো কাজ করে না এবং বাড়ির কোনো আইন মানতেও তারা প্রস্তুত নয়। বাড়িটাকেও ওরা জঙ্গল করে তুলছে।

দ্বৈপায়ন ভাবলেন, এই সব ছেলে বাইরে হেরে গিয়ে, বাড়ির ভিতরে এসে যেন-তেন-উপায়ে জিততে চায়। এরা প্রত্যেকে এক-একটা সাইকলজিক কেস। গতকালই তো নগেনবাবুর কথা শুনলেন। ওঁর বড় ছেলেটা মস্তান হয়েছে। সকাল সাড়ে-ন'টার আগে ঘুম থেকে ওঠে না। জলখাবার খেয়ে বাড়ি থেকে কেটে পড়ে। ভাত খাবার জন্যে ফিরে আসে তিনটের সময়। আবার বেরিয়ে পড়ে। ফেরে রাত এগারোটায়। বিড়ি সিগারেট টানে। বাবার পকেট থেকে টাকা চুরি করেছে। নগেনবাবু খুব বকুনি লাগিয়ে বলেছিলেন, "তোমাকে ছেলে বলে পরিচয় দিতে আমার লজ্জা হয়।" ছেলে সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, "দেবেন না।" চরম দুঃখে নগেনবাবু বলেছিলেন, "এই জন্যেই বুঝি লোকে সন্তান কামনা করে?" ছোকরা এতোখানি বেয়াদপ, বাবার মুখের ওপর বলেছে, "ছেলের জন্ম হওয়ার পিছনে আপনার অন্য কামনাও ছিল, সন্তান একটা বাই-প্রোডাক্ট মাত্র।"

ছেলের কথা শুনে নগেনবাবু শয্যাশায়ী হয়েছিলেন দু'দিন। এখনও লুকিয়ে-লুকিয়ে চোখের জল ফেলেন।

বউমাকে বলে দিলে হতো, খোকন যেন এদের কথাবার্তার কিছু জানতে না পারে। তারপর দ্বৈপায়ন ভাবলেন, বউমা বুদ্ধিমতী, ওকে সাবধান করবার প্রয়োজন নেই।

◆

দুপুরের ক্লান্ত ঘড়িটা যে সাড়ে-তিনটের ঘরে ঢুকে পড়েছে তা সোমনাথ এবার বুঝতে পারলো। কমলা বউদি ঠিক এই সময় বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন। প্রতিদিনের অভ্যাস মতো এই সময় কমলা বউদি বাড়ির লেটার বাক্সটা দেখেন। পিওন আসে তিনটে নাগাদ এবং তারপর থেকেই বাবা ছটফট করেন। মাঝে-মাঝে জিজ্ঞেস করেন, "চিঠিপত্তর কিছু এলো নাকি?" বাবার নামে প্রায় প্রতিদিনই কিছু চিঠিপত্তর আসে। চিঠি লেখাটা বাবার নেশা। দুনিয়ার যেখানে যত আত্মীয়স্বজন আছেন বাবা নিয়মিত তাঁদের পোস্টকার্ড লেখেন। তার ওপর আছেন অফিসের পুরানো সহকর্মীরা। রিটায়ার করবার পরে তাঁরাও দ্বৈপায়নের খোঁজখবর নেন।

সোমনাথেরও চিঠি পেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বিদেশী এক এমব্যাসির বিনামূল্যে পাঠানো একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা ছাড়া তার নামে কিছুই আসে না। এই পত্রিকা পাবার বুদ্ধিটাও সুকুমারের। দুখানা পোস্টকার্ডে দুজনের নামে চিঠি লিখে দিয়েছিল দিল্লীতে এমব্যাসির ঠিকানায়। বলেছিল, "পড়িস না পড়িস কাগজটা আসুক। প্রত্যেক সপ্তাহে পত্রিকা এলে পিওনের কাছে সুকুমার মিত্তির নামটা চেনা হয়ে যাবে। আসল চাকরির চিঠি যখন আসবে তখন ভুল ডেলিভারি হবে না।"

এই সাপ্তাহিক পত্রিকা ছাড়া গত সপ্তাহে সোমনাথের নামে একটা চিঠি এসেছিল। বিশ্ববিখ্যাত কোম্পানির বিশেষ যন্ত্রে প্রতিদিন পাঁচ মিনিট দৈহিক কসরত করলে টারজনের

মতো পেশীবহুল চেহারা হবে। ডাকযোগে মাত্র আশি টাকা দাম। বিফলে মূল্য ফেরত। বিজ্ঞাপনের চিঠি পেয়ে প্রথমে বিরক্তি লেগেছিল। তারপর সোমনাথের মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো। বম্বের কোম্পানি কষ্ট করে নাম-ঠিকানা জেনে চিঠি পাঠিয়ে তাকে তো কিছু সম্মান দিয়েছে। চাকরিতে ঢুকলে, সোমনাথ ওই যন্তর একটা কিনে ফেলবে—পয়সা জলে গেলেও সে দুঃখ পাবে না।

এ-ছাড়া সোমনাথের পাঠানো রেজিস্টার্ড অ্যাকনলেজমেন্ট ডিউ ফর্মগুলো দু-তিনদিন অন্তর ফিরে আসে। নিজের হাতে লেখা নিজের নাম সোমনাথ খুঁটিয়ে দেখে। তলায় একটা রবার-স্ট্যাম্পে কোম্পানির ছাপ থাকে—তার ওপর একটা দুর্বোধ্য হিজিবিজি পাকানো রিসিভিং ক্লার্কের সই।

আজও কয়েকটা অ্যাকনলেজমেন্ট ফর্ম ফিরেছে। সেই সঙ্গে সোমনাথের নামে একটা চিঠিও এসেছে। কয়েকদিন আগে বক্স নম্বরে একটা চাকরির বিজ্ঞাপনের উত্তর দিয়েছিল। তারাই উত্তর দিয়েছে। লিখেছে অবিলম্বে ওদের কলকাতা প্রতিনিধি মিস্টার চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে। মিস্টার চৌধুরী মাত্র কয়েকদিন থাকবেন, সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেখা করা উচিত।

ঠিকানা কীড্ স্ট্রীটের। সময় নষ্ট না করে সোমনাথ বেরিয়ে পড়লো। বউদি জিজ্ঞেস করলেন, "বেরুচ্ছো নাকি?"

ফর্সা সাদা শার্ট প্যান্ট ও সেই সঙ্গে টাই দেখে কমলা বউদি আন্দাজ করলেন চাকরির খোঁজে বেরুচ্ছে সোমনাথ।

মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন, "ওর একটা চাকরি করে দাও ঠাকুর। বিনা অপরাধে ছেলেটা বড্ড কষ্ট পাচ্ছে।"

কমলার মনে পড়লো, কী আমুদে ছিল সোমনাথ। সবসময় হৈ-চৈ করতো। বউদির পিছনেও লাগতো মাঝে মাঝে! বলতো, "বউদি আপনাকে একদিন আমাদের কলেজে নিয়ে যাবো। মেয়েগুলোকে দেখলে, মডার্ন স্টাইল কাকে বলে আপনার ধারণা হয়ে যাবে। অফিসারের বউ হয়েছেন, কিন্তু আপনার গেঁয়ো স্টাইল পাল্টাচ্ছে না।"

কমলা হেসে বলতো, "আমরা তো সেকেলে, ভাই। তোমার বিয়ের সময় বরং দেখেশুনে আধুনিকা মেয়ে পছন্দ করে আনা যাবে।"

সোমনাথ বলতো, "সেসব দিনকাল পাল্টেছে। এখন সব মেয়ে নিজের পছন্দ মতো তো আগে থেকেই ঠিক করে রাখছে, কাকে বিয়ে করবে।"

কমলা বলতো, "আমরাও তো কলেজে পড়েছি। তখন তো এমন ছিল না।"

সোমনাথ বলতো, "সেসব দিনকাল পাল্টেছে। এখন সব মেয়ে নিজের পছন্দ মতো বিয়ে করতে চায়।"

কমলার জন্মদিনে সোমনাথ একবার কাগজের মুকুট তৈরি করেছিল। ঝলমলে রাঙ্তা লাগানো মুকুট বউদিকে পরতে বাধ্য করেছিল সে—তারপর ছবি তুলেছিল।

কাজলের সঙ্গে বুলবুলের বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল যখন, তখন সোমনাথই গোপন তদন্তের দায়িত্ব পেয়েছিল। সহপাঠিনী সম্বন্ধে সোমনাথ বলেছিল, "দীপান্বিতার বেজায় ডাঁট। ওর সঙ্গে মেজদার বিয়েটা লাগলে, বউদি বেশ হয়। ওর তেজ একেবারে মিইয়ে যাবে!"

সন্ধ্যের আগেই সোমনাথ ফিরে এলো। সে যখন শার্ট খুলছে তখনই কমলা ওর ঘরে ঢুকলো। সোমনাথের মুখে যেন একটু আশার আলো দেখা যাচ্ছে।

কীড্ স্ট্রীটের মিস্টার চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেছে সোমনাথ। চাকরিটা সেল্স লাইনের। কলকাতার বাইরে বাইরে ঘুরতে হবে। তাতে সোমনাথের মোটেই আপত্তি নেই। কিন্তু লোকটা কিছু টাকা চাইছে।

লোকটাকে অবিশ্বাস করতে পারতো সোমনাথ। কিন্তু খোদ এম-এল-এ গেস্ট হাউসে বসে ভদ্রলোক কথাবার্তা বললেন। সোমনাথের চোখে-মুখে দ্বিধার ভাব দেখে মিঃ চৌধুরী

বললেন, "চারশ' টাকা মাইনের চাকরির জন্যে আড়াইশ' টাকা পেমেণ্ট আজকালকার দিনে কিছু নয়। রেল, পোস্টাপিস, ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে চাকরি এখন নিলামে উঠছে। বহুলোক ছ'মাসের মাইনে সেলামী দিতে রাজী রয়েছে।"

সোমনাথের মনে যতটুকু সঙ্কোচ ছিল, কমলা তা কাটিয়ে দিলো। সে বললো, "বাবা শুনলে, হয়তো রেগে যাবেন। কড়া প্রিন্সিপিলের লোক—উনি এইসব ঘুষঘাষে রাজী হবেন না। কাজলকেও অতশত বোঝাতে পারবো না। কিন্তু সামান্য কয়েকটা টাকার জন্যে সুযোগটা ছেড়ে লাভ কী? আমার কাছে আড়াইশ' টাকা আছে।"

সংসার-খরচের টাকা থেকে লুকিয়ে বউদি যে টাকাটা দিচ্ছেন সোমনাথ তা বুঝতে পারলো। আগামীকাল কীড্ স্ট্রীটের এম-এল-এ কোয়ার্টারের সামনে লোকটার সঙ্গে দেখা করবে সোমনাথ। ভদ্রলোক চব্বিশ ঘণ্টার সময় দিয়েছেন।

প্রবল উত্তেজনার মধ্যে সময় কাটছে। মিস্টার চৌধুরী বলছেন, "এখন আড়াইশ' দিয়ে বিহারে পোস্টিং নিন, তারপর আরও আড়াইশ' খরচ দেবেন, কলকাতায় ট্রান্সফার করিয়ে দেবো।"

ভোরবেলার দিকে চাকরি পাবার স্বপ্ন দেখলো সোমনাথ। আড়াইশ' টাকা পকেটে পুরে মিস্টার চৌধুরী একটা ভালো চাকরির ব্যবস্থা করেছেন। তাই নিয়ে বাড়িতে চাপা আনন্দের উত্তেজনা। বাবা মুখে কিছু না বললেও, বেশ জোর গলায় বড় বউদিকে আর এক কাপ চায়ের হুকুম দিচ্ছেন। সোমনাথকে সামনে বসিয়ে অফিসের পলিটিক্স সম্বন্ধে সাবধান থাকতে বলছেন। কী করে কর্মস্থানে সবার মনোহরণ করতে হয় সে সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছেন।

ভূতপূর্ব কলেজবান্ধবী এবং বর্তমানে বউদি বুলবুলেরও খুব আনন্দ হয়েছে। বুলবুল বলছে, "কোনো কথা শুনছি না সোম—প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই সায়েবপাড়ায় একখানা ইংরেজী সিনেমা দেখাতে হবে এবং ফেরবার পথে পার্ক স্ট্রীটে গোল্ডেন ড্রাগনে চাইনিজ ডিনার।" সোমনাথ রাজী হয়েও রসিকতা করছে, "পয়সা সস্তা পেয়েছো? সিনেমা দেখাবো, কিন্তু নো চাইনিজ ডিনার।" বুলবুল রেগে গিয়ে বলছে, "আমাকে খাওয়াবে কেন? তার বদলে যাকে নিয়ে যাবে তার নাম আমি জানি না, এটা ভেবো না!"

চীনে রেস্তরাঁর দোতলায় নিয়ে যাবার সোমনাথের অন্য কেউ আছে এমন একটা সন্দেহ বুলবুল অনেকদিন থেকেই করছে। হাজার হোক কলেজে প্রতিদিন সোমনাথকে দেখেছে সে। আর এসব ব্যাপারে মেয়েদের সন্ধানী চোখ ইলেকট্রনিক রাডারকে হারিয়ে দেয়।

সোমনাথের চাকরিতে সবচেয়ে খুশী হয়েছেন কমলা বউদি। বউদি কিন্তু কিছুই চাইছেন না। মাঝে মাঝে শুধু ছোট দেওরের পিঠে হাত দিয়ে বলছেন, "উঃ! যা ভাবনা হয়েছিল। আজই কালীঘাটে যেতে হবে আমাকে। কাউকে না বলে পঞ্চাশ টাকা মানত করে বসে আছি।"

বুলবুল বললো, "নো ভাবনা দিদি! ঐ পঞ্চাশ টাকাও সোমের প্রথম মাসের মাইনে থেকে ডেবিট হবে।"

কিন্তু এসবই স্বপ্ন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো। কোথায় চাকরি? চাকরির ধারেকাছে নেই সোমনাথ।

সকালবেলা বউদি চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলেন, "কখন যাবে? টাকাটা বার করে রেখেছি!"

টাকাটা পকেটে পুরে যথাসময়ে সোমনাথ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো।

সোমনাথ ফিরতে দেরি করছে কেন? কমলা অধীর আগ্রহে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামলো। এখনও সোমনাথের দেখা নেই।

সাতটা নাগাদ সোমনাথ বাড়ি ফিরলো। ওর ক্লান্ত কালো মুখ দেখেই কমলার কেমন সন্দেহ হলো।

চিবুকে হাত দিয়ে সোমনাথ চুপচাপ বসে রইলো। বউদির দেওয়া টাকা নিয়ে সোমনাথ এম-এল-এ কোয়ার্টারে লোকটার সঙ্গে দেখা করেছিল। মিস্টার চৌধুরী নোটগুলো

পকেটে পুরে সোমনাথকে ট্যাক্সিতে চড়িয়ে ক্যামাক স্ট্রীটের একটা বাড়ির সামনে নিয়ে গিয়েছিলেন। "আপনি বসুন, আমি ব্যবস্থাটা পাকা করে আসি," এই বলে লোকটা সেই যে বেপাত্তা হলো আর দেখা নেই। আরও পনেরো মিনিট ওয়েটিং ট্যাক্সিতে বসে থেকে তবে সোমনাথের চৈতন্য হলো, হয়তো লোকটা পালিয়েছে। ভাগ্যে পকেটে আরও একখানা দশ টাকার নোট ছিল। না হলে ট্যাক্সির ভাড়াই মেটাতে পারতো না সোমনাথ।

বড় আশা করে বউদি টাকাটা দিয়েছিলেন। সব শুনে বললেন, "তুমি এবং আমি ছাড়া কেউ যেন না জানতে পারে।"

খুব লজ্জা পেয়েছিল সোমনাথ। সব জেনেশুনেও একেবারে ঠকে গেলো সোমনাথ। বউদি বললেন, "ওসব নিয়ে ভেবো না। ভালো সময় যখন আসবে তখন অনেক আড়াইশ' টাকা উসুল হয়ে যাবে।"

তবু অস্বস্তি কাটেনি সোমনাথের। বউদিকে একা পেয়ে কাছে গিয়ে বলেছিল, "খুব খারাপ লাগছে বউদি। আড়াইশ' টাকার হিসেব কী করে মেলাবেন আপনি?"

বউদি ফিসফিস করে বললেন, "তুমি ভেবো না। তোমার দাদার পকেট কাটায় আমি ওস্তাদ! কেউ ধরতে পারবে না।"

জানাজানি হলে ওরা দুজনেই অনেকের হাসির খোরাক হতো। এই কলকাতা শহরে এমন বোকা কেউ আছে নাকি যে চাকরির লোভে অজানা লোকের হাতে অতগুলো টাকা তুলে দেয়?

নিজের ওপর আস্থা কমে যাচ্ছে সোমনাথের। পরের দিন দুপুরবেলায় বউদিকে একলা পেয়ে সোমনাথ আবার প্রসঙ্গটা তুলেছিল। "বউদি, কেমন করে অত বোকা হলাম বলুন তো?"

"বোকা নয়, তুমি আমি সরল মানুষ। তাই কিছু গচ্চা গেলো। তা যাক। মা বলতেন বিশ্বাস করে ঠকা ভালো।"

বউদির কথাগুলো ভারি ভালো লাগছিল সোমনাথের। কৃতজ্ঞতায় চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছিল। বউদির এই স্নেহের দাম সে কীভাবে দেবে? বউদি কিন্তু স্নেহ দেখাচ্ছেন এমন ভাবও করেন না।

কিন্তু ঠকে যাবার অপমানটা ঘুরে-ফিরে সোমনাথের মনের মধ্যে এসেছে। এই কলকাতা শহরে এত বেকার রয়েছে, তাদের মধ্যে সোমনাথই-বা ঠকতে গেলো কেন?

এই ভাবনাতে সোমনাথ আরও দুর্বল হয়ে পড়তো, যদি-না দুদিন পরেই বেকার-ঠকানো এই জোচ্চোরটাকে গ্রেপ্তারের সংবাদ খবরের কাগজে বেরুতো। কীড্ স্ট্রীটে এম-এল-এ হোস্টেলের সামনেই লোকটা ধরা পড়েছিল। সোমনাথের লোভ হয়েছিল একবার পুলিশে গিয়ে জলঘোলা করে আসে, লোকটার আর-একটা কুকীর্তি ফাঁস করে দেয়। কিন্তু বউদি সাহস পেলেন না। দুজনে গোপন আলোচনার পরে, ব্যাপারটা চেপে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে হলো।

সোমনাথের আত্মবিশ্বাস কিছুটা ফিরে এসেছে। সোমনাথ একাই তাহলে ঠকেনি, আরও অনেকেই এই ফাঁদে পা দিয়েছে এবং সোমনাথের থেকে বেশি টাকা খুইয়েছে।

* * *

এবার বোধহয় মেঘ কাটতে শুরু করেছে। একখানা দরখাস্তের জবাব এসেছে। লিখিত পরীক্ষা হবে। নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা-ফি বাবদ দশ টাকা নগদ সহ চাকুরি-প্রার্থীকে হল্-এ দেখা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পরের দিন ভোরবেলাতেই সুকুমার খবর নিতে এলো। সুকুমারের আর তর সয় না। বউদিকে দেখেই জিজ্ঞেস করলো, "সোমটা কোথায়?" সুকুমারও পরীক্ষার চিঠি পেয়েছে। সে বেজায় খুশী।

ঠোঁট উল্টে সুকুমার বললো, "দেখলি তো তদ্বিরে ফল হয় কি না? আমাদের পাড়ার অনেকেই অ্যাপ্লাই করেছিল, কিন্তু কেউ চিঠি পায়নি। সাধে কি আর মিনিস্টারের সি-একে পাকড়েছি! কেন মিথ্যে কথা বলবো, সি-এ বলেছিলেন, আমরা দুজনেই যাতে চান্স পাই তার ব্যবস্থা করবেন।"

আবার বউদির খোঁজ করলো সুকুমার। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে কমলাকে বললো, "সি-এ তাঁর কাজ করেছেন, এখন আশীর্বাদ করুন আমরা যেন ভালো করতে পারি।"

"নিশ্চয় ভালো পারবে," বউদি আশীর্বাদ করলেন।

সুকুমারের একটা বদ অভ্যাস আছে। উত্তেজিত হলেই দুটো হাত এক সঙ্গে দ্রুত ঘষতে থাকে। ঐভাবে হাত ঘষতে ঘষতে সুকুমার বললো, "বউদি, এক ঢিলে যদি দুই পাখী মারা যায়, গ্র্যান্ড হয়। একই অফিসে দুজনে চাকরিতে বেরুবো।"

সুকুমার বললো, "বিরাট পরীক্ষা। ইংরেজি, অঙ্ক, জেনারেল নলেজ সব বাজিয়ে নেবে। সুতরাং আজ থেকে পরীক্ষার দিন পর্যন্ত আমার টিকিটি দেখতে পাবেন না। মিনিস্টারের সি-এ আমাদের চান্স দিতে পারেন। কিন্তু পরীক্ষায় পাসটা আমাদেরই করতে হবে।"

সুকুমার সত্যিই সোমনাথকে ভালোবাসে। যাবার আগে বললো, "মন দিয়ে পড় এই ক'দিন। তোর তো আবার পরীক্ষাতেই বিশ্বাস নেই। শেষে আমার সিকে ছিঁড়লো আর তুই চান্স পেলি না, তখন খুব খারাপ লাগবে।"

নির্দিষ্ট দিনে কপালে বিরাট দই-এর ফোঁটা লাগিয়ে সুকুমার এগজামিনেশন হল্-এ হাজির হয়েছিল। সোমনাথ ওসব বাড়াবাড়ি করেনি। তবে বউদি জোর করে ওর পকেটে কালীঘাটের জবাফুল গুঁজে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "রাখো সঙ্গে। মায়ের ফুল থাকলে পথে-ঘাটে বিপদ আসবে না।"

সোমনাথ এসব বিশ্বাস করে না। কিন্তু বউদির সঙ্গে তর্ক করতে ইচ্ছে হয়নি।

হল্-এর কাছাকাছি এসেই সোমনাথ কিন্তু আশা ছেড়ে দিয়েছিল। এ-যে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার বাড়া। হাজার-হাজার ছেলে আসছে। এবং তাও নাকি দফে-দফে ক'দিন ধরে পরীক্ষা। রোল নম্বরের দিকে নজর দিয়েই ব্যাপারটা বোঝা উচিত ছিল সোমনাথের। চব্বিশ হাজার কত নম্বর তার। আরও কত আছে কে জানে? হিন্দুস্থানী ফেরিওয়ালারা খবর পেয়েছে। তারা মুড়ি, বাদাম, পাঁউরুটি, চা ইত্যাদির বাজার বসিয়েছে।

দিনের শেষে মুখ শুকনো করে সোমনাথ বাড়ি ফিরলো। বউদি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন, জিজ্ঞেস করবেন কেমন পরীক্ষা হলো। কিন্তু সোমনাথের ক্লান্ত মুখ-চোখ দেখে কিছুই জানতে চাইলেন না। কাজের অছিলায় বাবাও নেমে এলেন। কায়দা করে জিজ্ঞেস করলেন, "ফেরবার সময় বাস পেতে অসুবিধে হয়নি তো?"

সোমনাথ সব বুঝতে পারছে। বাবা কেন নেমে এসেছেন তাও সে জানে। সে গম্ভীরভাবে বললো, "এইভাবে লোককে কষ্ট না দিয়ে চাকরিগুলো লটারি করলে পারে। ন'টা

পোস্টের জন্যে সাতাশ হাজার ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে। এর থেকে কে যোগ্য কীভাবে ঠিক করবে?”

বাবা ব্যাপারটা বুঝলেন। আর কথা না বাড়িয়ে আবার ওপরে উঠে গেলেন, যদিও প্রশ্নগুলো তাঁর দেখবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কোশ্চেন পেপার নিয়ে আসতে দেয়নি, পরীক্ষা হল্-এই ফেরত নিয়েছে।

পরের দিন সকালে সুকুমার আবার এসেছে। ওর মুখ-চোখের অবস্থা দেখে বউদি পর্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে তোমার? রাত্রে ঘুমোওনি?"

সুকুমার কষ্ট করে হাসলো। তারপর সোমনাথের খোঁজ নিলো। "কীরে? তোর পরীক্ষা কেমন হলো?"

সোমনাথ বিছানাতেই শুয়ে ছিল। উঠে বললো, "যা হবার তাই হয়েছে।"

সুকুমার বললো, "ইংরাজী রচনায় কোনো অলটারনেটিভ ছিল না। এম-এল-এ-দার কাছে শুনে গেলাম ‘গরিবী হটাও’ পড়বে। ওই প্রবন্ধটা এমন মুখস্থ করে গিয়েছিলাম যে চান্স পেলে ফাটিয়ে দিতাম। জীবেন মুখুজ্যে গোল্ড মেডালিস্টের লেখা।"

সোমনাথ চুপচাপ সুকুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। সুকুমার বললো, "আনএমপ্লয়মেণ্ট সম্বন্ধেও একটা রচনা খেটেখুটে তৈরি করেছিলাম। বেকার সমস্যা দূর করবার জন্যে অর্ডিনারি বইতে মাত্র ছ'টা কর্মসূচী থাকে তার জায়গায় আমি সতেরটা দফা ঢুকিয়েছিলাম। পড়লে ফাটিয়ে দিতাম। কিন্তু এমনই পোড়া কপাল যে রচনা এলো ‘ভারতীয় সভ্যতায় অরণ্যের দান’।"

মুখ কাঁচুমাচু করে সুকুমার জিজ্ঞেস করলো, "তুই কি লিখলি রে? তোর নিশ্চয় বিষয়টা তৈরি ছিল!"

"মুণ্ডু ছিল," সোমনাথ রেগে উত্তর দিলো।

"আমারও রাগ হচ্ছিল, কিন্তু চাকরি খুঁজতে এসে রাগ করলে চলবে না। তাই ফেনিয়ে ফেনিয়ে লিখে দিলুম, অরণ্য না থাকলে ভারতীয় সভ্যতা গোল্লায় যেতো—কেউ তাকে বাঁচাতে পারতো না।" সুকুমার অসহায়ভাবে বললো।

"তুই তো তবু লিখেছিস, আমি ছেড়ে দিয়ে এসেছি।"

সুকুমার সমস্ত বিষয়টাকে ভীষণ গুরুত্ব দিয়েছে। এবার মুখ কাঁচুমাচু করে বললো, “ভাই সোম, লাস্ট পেপারে এসে ডুবলাম। জেনারেল নলেজে ভীষণ খারাপ করেছি।"

সোমনাথের এসব বিষয় আলোচনা করতেই ভালো লাগছিল না। কিন্তু সুকুমার নাছোড়বান্দা।

সুকুমার বললো, "একটা মাত্র প্রশ্ন পেরেছি—ভারতে বেকারের সংখ্যা কত? মুখস্থ ছিল—পাঁচ কোটি। দু নম্বর কোনো বেটা আটকাতে পারবে না।"

“একশ'র মধ্যে দু নম্বর মন্দ কী?” ব্যংগ করলো সোমনাথ।

সুকুমারের মাথায় ওসব সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ঢুকলো না। সে বললো, "আরেকটা কোশ্চেনে দু নম্বর দিতেও পারে, নাও দিতে পারে। সেইটে নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেছি। ‘নীলগিরি’ সম্বন্ধে আমি ভাই লিখে দিয়েছি—দাক্ষিণাত্যের পর্বত। কিন্তু অন্য ছেলেরা বললো, আমাকে নম্বর দেবে না। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার চাকরি তো! লিখতে হবে ভারতের নতুন ফ্রিগেট।"

খুব দুঃখ করতে লাগলো সুকুমার। "আমার মাথায় সত্যিই গোবর। কাগজে বেরিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নিজে নীলগিরি জলে ভাসালেন—আর আমি কিনা ছাই লিখে ফেললাম নীলগিরি পর্বত।"

বউদি চা দিতে এসে ব্যাপারটা শুনলেন। বললেন, “আমার তো মনে হয় তুমিই ঠিক লিখেছো। নীলগিরি পর্বত তো চিরকাল থাকবে, যুদ্ধ জাহাজ নীলগিরির পরমায়ু ক'বছর?”

সুকুমার আশ্বস্ত হলো না। "আপনি ভুল করছেন বউদি। ফ্রিগেট নীলগিরি যে গভরমেণ্টের। গভরমেণ্টের কোম্পানিতে চাকরির চেষ্টা করবে আর গভরমেণ্টের জিনিস

ম্বন্ধে লিখবে না, এটা কেন চলবে? নেহাত আমাকে যদি বাঁচাতে চায়, এগজামিনার য়তো দু-এর মধ্যে এক নম্বর দেবে।"

"ওসব ভেবে কী হবে?" সোমনাথ এবার বন্ধুকে বোঝাবার চেষ্টা করে।

কিন্তু সুকুমার নিজের খেয়ালেই রয়েছে। বললো, "যা দুঃখু হচ্ছে না, মাইরি। পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট প্রজাতন্ত্রের নামটা জেনে যাইনি।"

"ডজন ডজন দেশ যখন রয়েছে, তখন তার মধ্যে একটা বৃহত্তম এবং একটা ক্ষুদ্রতম হবেই," সোমনাথের কথায় এবার বেশ শ্লেষ ছিল।

সুকুমার কিন্তু এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। বললো, "খবরের কাগজ অফিসের নকুল চ্যাটার্জির সঙ্গে বাসে দেখা হলো। উনি বলে দিলেন, উত্তর হবে, স্যান মেরিনো রাজ্য, ইটালির কাছে। দেশটার সাইজ কলকাতার মতো, মাত্র পনেরো হাজার লোক থাকে।" খুব দুঃখ করতে লাগলো সুকুমার। "আগে থেকে জেনে রাখলে আরও দু নম্বর পেতুম।"

সোমনাথ এবার রাগে ফেটে পড়লো। "আপিসের জেনারেল ম্যানেজার এইসব প্রশ্নের উত্তর জানে?"

সুকুমার এমনই বোকা যে ভাবছে ওরা নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানে, না হলে বড় বড় পোস্টে কী ভাবে বসলো?

সুকুমার বললো, "পরের কোশ্চেনটায় অবশ্য অনেকেই মার খাবে—পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণীর নাম। আমি তো ভাই সরল মনে হাতির নাম লিখে বসে আছি। নকুলবাবু বললেন, সঠিক উত্তর হবে ব্লু হোয়েল। এক-একটার ওজন দেড়শ' টন। হাতি সে তুলনায় শিশু!"

"চুলোয় যাক ওসব।" আবার তেড়ে উঠলো সোমনাথ। "করবি তো কেরানির চাকরি। তার জন্যে হাতির ডাক্তার হয়ে লাভ কী?"

বেচারা সুকুমার একটু মুষড়ে পড়লো। বললো, "তোর তো আমার মতো অবস্থা না। তুই এসব কথা বলতে পারিস। তুই মজাসে বাবা-দাদার হোটেলে আছিস। যে কোনো কোশ্চেন তুই ছেড়ে দিতে পারিস। আমার বাবাকে রিটায়ারের বিল্বিপত্তর শুঁকিয়ে দিয়েছে। সামনের মাস থেকে বাবার চাকরি থাকবে না। পরের মাস থেকে মাইনে পাবে না। প্রতি সপ্তাহে আটটা লোকের রেশন তুলতে হবে আমাদের। বাড়ি ভাড়া আছে। মায়ের অসুখ। সুতরাং সমস্ত কোশ্চেনের উত্তর আমাকে দিতে হবে। আমার যে একটা চাকরি চাই-ই।"

সুকুমার সেদিন চলে গিয়েছিল। যাবার পর সোমনাথের একটু দুঃখ হয়েছিল। দুনিয়ার ওপরে তার যে রাগ সেটা সুকুমারের ওপর ঢেলে দেওয়া উচিত হয়নি।

* * *

সুকুমার বেচারার কী যে হলো সেই থেকে। বিশেষ আসে না। দিনরাত নাকি সাধারণ জ্ঞান বাড়াচ্ছে। একদিন বিকেলে সুকুমার দেখা করতে এলো। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। বললো, "বাবার কাছে খুব বকুনি খেলাম। বোনটাও আবার দলে যোগ দিয়ে বললো, কোনো কাজকম্মই তো নেই। শুধু নমো-নমো করে একটা দশ টাকা মাইনের টিউশনি সেরে আসো। বসে না থেকে সাধারণ জ্ঞান বাড়াতে পারো না?"

সোমনাথকে কেউ এইরকম কথা বলেনি। কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন ভয় হলো সোমনাথের। এ-বাড়িতে তো একদিন এমন কথা উঠতে পারে।

সুকুমারের মন যে শক্ত নয় তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। ওর কীরকম ধারণা হয়ে যাচ্ছে, সাধারণ জ্ঞানটা ভালো থাকলেই ও সেদিনের চাকরিটা পেয়ে যেতো।

সুকুমার নিজেই বললো, "বাবা ঠিকই বলেছিলেন—সুযোগ রোজ রোজ আসে না। অত বড় সুযোগ এলো অথচ পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম রিপাবলিকের নামটা লিখতে পারলাম না। দোষ তো কারো নয়, দোষ আমারই। বাঙালীদের তো এই জন্যই কিছু হয় না। নিজেরা একদম চেষ্টা করে না, পরীক্ষার জন্যে তৈরি হয় না।"

সুকুমারের চোখ দুটো লাল হয়ে আছে। ঠিক গাঁজাখোরের মতো দেখাচ্ছে। "সুকুমার মিত্তির আর ভুল করবে না। সবরকমের জেনারেল নলেজ বাড়িয়ে যাচ্ছি। এবার চান্স পেলে ফাটিয়ে দেবো।"

"তা দিস। কিন্তু দাড়ি কাটছিস না কেন? বুরুশ কোম্পানিকে নিজের খোঁচা দাড়ি বিক্রি করবি নাকি?" সোমনাথ রসিকতা করলো।

ঠোঁট উল্টোলো সুকুমার। বললো, "সুকুমার মিত্তির বেকার হতে পারে কিন্তু এখনও বেটাছেলে আছে। সুকুমার মিত্তির প্রতিজ্ঞা করেছে বাপের পয়সায় আর দাড়ি কামাবে না। টিউশনির মাইনে দিতে দেরি করছে। তাই ব্লেড কেনা হচ্ছে না।"

সোমনাথ উঠে দাঁড়ালো। ঘরের কোণ থেকে একটা ব্লেড বার করে সুকুমারকে বললো, "নে। এটা তোর বাবার পয়সায় কেনা নয়।"

সুকুমার শান্ত হয়ে গেলো। প্রথমে ব্লেড নিলো। পকেটে পুরলো। তারপর কী ভেবে পকেট থেকে ব্লেডটা বার করে ফিরিয়ে দিলো। বললো, "কারুর বাবার ব্লেড আমি নেবো না।"

হন হন করে বেরিয়ে গেলো সুকুমার। বেশ মুষড়ে পড়লো সোমনাথ। যাবার আগে সুকুমার কি তাকেই অপমান করে গেলো? সকলের সামনে মনে করিয়ে দিয়ে গেলো, সোমনাথও রোজগার করে না, অন্যের পয়সায় দাড়ি কামায়।

সুকুমারের অবস্থা যে আরও খারাপ হবে তা সোমনাথ বুঝতে পারেনি।

মেজদা একদিন বললেন, "তোর বন্ধু সুকুমারের কী হয়েছে রে?"

"কেন বলো তো?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো।

মেজদা বললেন, "তোর বন্ধুর মুখে এক জঙ্গল দাড়ি গজিয়েছে। চুলে তেল নেই। পোস্টাপিসের কাছে আমার অফিসের গাড়ি থামিয়ে বললো, 'একটা আর্জেন্ট প্রশ্ন ছিল।' আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। ও নিজেই পরিচয় দিলো, 'আমি সোমনাথের বন্ধু সুকুমার।' আমি ভাবলাম সত্যিই কোনো প্রশ্ন আছে! ছোকরা বেমালুম জিজ্ঞেস করলো, 'চাঁদের ওজন কত?' আমি বললাম, জানি না ভাই। সুকুমার রেগে উঠলো। 'জানেন। বলবেন না তাই বলুন।' আমি বললাম, বিশ্বাস করো, আমি সত্যিই চাঁদের ওজন জানি না। ছোকরা বললো, 'এত বড় কোপানির অফিসার আপনি, চাঁদের ওজন জানেন না? হতে পারে?' তারপর ছোকরা কী বিড়বিড় করতে লাগলো, পুরো দুটো নম্বর কাটা যাবে।"

মেজদা বললেন, "এর পর আমি আর দাঁড়াইনি। অফিসের ড্রাইভারকে গাড়িতে স্টার্ট দিতে বললাম।" একটু থেমে মেজদা বললেন, "এর আগে ছোকরা তো এমন ছিল না। বদসঙ্গে আজকাল কী গাঁজা খাচ্ছে নাকি?"

সৎ কিংবা বদ কোনো সঙ্গীই নেই সুকুমারের। নিজের খেয়ালে সে ঘুরে বেড়ায়। গড়িয়াহাট ওভারব্রিজের তলায় সুকুমারকে দূর থেকে সোমনাথ একদিন দেখতে পেলো। খুব কষ্ট হলো সোমনাথের। কাছে গিয়ে ওর পিঠে হাত দিলো, "সুকুমার না?"

সুকুমারের হাতে একখানা শতচ্ছিন্ন হিন্দুস্থান ইয়ারবুক, একখানা জেনারেল নলেজের বই, আর কম্পিটিশন রিভিউ ম্যাগাজিনের পুরানো কয়েকটা সংখ্যা। একটা বড় পাথরের ওপরে বসে সুকুমার পাতা ওল্টাচ্ছিল। বিরক্ত হয়ে সোমনাথের দিকে তাকিয়ে সুকুমার

বললো, "মন দিয়ে একটু পড়ছি, কেন ডিসটার্ব করলি?"

"আঃ! সুকুমার," বকুনি লাগালো সোমনাথ।

সুকুমার বললো, "তোকে একটা কোশ্চেন করি। বল দিকিনি বেকার ক'রকমের?"

মাথা চুলকে সোমনাথ উত্তর দিলো, "শিক্ষিত বেকার এবং অশিক্ষিত বেকার।"

বেশ বিরক্ত হয়ে সুকুমার চিৎকার করে উঠলো, "তুই একটা গর্দভ। তুই চিরকাল ধর্মের ষাঁড় হয়ে বউদির দেওয়া ভুষি খেয়ে যাবি। তোর কোনোদিন চাকরি-বাকরি হবে না—তোর জেনারেল নলেজ খুবই পুওর।"

হাঁপাতে লাগলো সুকুমার। তারপর বললো, "টুকে নে—বেকার দু'রকমের। কুমারী অথবা ভার্জিন বেকার এবং বিধবা বেকার। তুই এবং আমি হলুম ভার্জিন বেকার—কোনোদিন চাকরি পেলুম না, স্বামী কি দোব্য জানতে পারলুম না। আর ছাঁটাই হয়ে যারা বেকার হচ্ছে তারা বিধবা বেকার। যেমন আমার ছাত্তরের বাবা। রাধা প্লাস ওয়ার্কসে কাজ করতো, দিয়েছে আর-পি-এল—রানিং পোঁদে লাথি। আমার বাকি মাইনেটা দিলো না—এখনও ব্লেড কিনতে পারছি না। আমার বাবাও বিধবা হবে, এই মাসের শেষ থেকে।"

সোমনাথ বললো, "বাড়ি চল। তোকে চা খাওয়াবো।"

সুকুমার রেগে উঠলো। "চাকরি হলে অনেক চা খাওয়া যাবে। এখন মরবার সময় নেই। জেনারেল নলেজের অনেক কোশ্চেন বাকি রয়েছে।"

একটু থেমে কী যেন মনে করার চেষ্টা করলো সুকুমার। তারপর সোমনাথের হাতটা ধরে বললো, "তুই জানিস 'পেরেডেভিক' কী? নকুলবাবু বললেন, পেরেডেভিক এক ধরনের সূর্যমুখী ফুলের বিচি—ওয়েস্টবেঙ্গলে আনানো হচ্ছে রাশিয়া থেকে, যাতে আমাদের রান্নার তেলের দুঃখ ঘুচে যায়। কিন্তু কোনো জেনারেল নলেজের বইতে উত্তরটা খুঁজে পাচ্ছি না! ভুল হয়ে গেলে দুটো নম্বর নষ্ট হয়ে যাবে।"

পাথরের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো সোমনাথ। সুকুমার বললো, "রাখ রাখ—এমন পোজ দিচ্ছিস যেন সিনেমার হিরো হয়েছিস। চাকরি যদি চাস আমার সঙ্গে জেনারেল নলেজে লড়ে যা। কোশ্চেন অ্যানসার দুই-ই বলে যাচ্ছি। কারুর মুরোদ থাকে তো চ্যালেঞ্জ করুক। ডং হা কোথায়?—দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিখ্যাত জেলা। গাম্বিয়া এবং জাম্বিয়া কী এক?—মোটেই না। গাম্বিয়া পশ্চিম আফ্রিকায়, আর পুরানো উত্তর রোডেশিয়ার নতুন নাম জাম্বিয়া।"

বন্ধুকে থামাতে গেলো সোমনাথ। কিন্তু সুকুমার বলে চললো, "শুধু পলিটিক্যাল সায়েন্স জানলে চলবে না। ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, স্বাস্থ্য, ফিজিকস্, কেমিসট্রি, ম্যাথামেটিকস্—সব বিষয়ে হাজার হাজার কোশ্চেনের উত্তর রেডি রাখতে হবে। আচ্ছা, বল দিকি শরীরের সবচেয়ে বড় গ্ল্যান্ডের নাম কী?"

চুপ করে রইলো সোমনাথ। প্রশ্নটার উত্তর সে জানে না।

"লিভার, লিভার," চিৎকার করে উঠলো সুকুমার। তারপর নিজের খেয়ালেই বললো, "ফেল করিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু হাজার হোক বউদির ধর্মশালায় আছিস, দেখলে দুঃখ হয়, তাই আর একটা চান্স দিচ্ছি। কোন্ ধাতু সাধারণ ঘরের টেমপারেচারে তরল থাকে?"

এবারেও সোমনাথকে চুপ করে থাকতে দেখে সুকুমার বললো, "তুই কি চিরকাল বৌদির আঁচল ধরে থাকবি? এই উত্তরটাও জানিস না? ওরে মূর্খ, 'পারা,'—মার্কারির নাম শুনিসনি?"

সুকুমার তারপর বললো, "দুটো ইমপর্টেন্ট কোশ্চেনের উত্তর জেনে রাখ। 'লাস্ট সাপার' ছবিটি কে এঁকেছিলেন? উত্তর: লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। দ্বিতীয় কোশ্চেন: 'বিকিনি' কোথায়? খুব শক্ত কোশ্চেন। যদি লিখিস মেমসায়েবদের স্নানের পোশাক, স্রেফ, গোল্লা পাবি। উত্তর হবে: প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ—এটম বোমার জন্যে বিখ্যাত হয়ে আছে।"

সোমনাথকে আরও অনেক কোশ্চেন শোনাতো সুকুমার। সোমনাথ বুঝলো, ওর মাথার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। মনের দুঃখে সে হাঁটতে আরম্ভ করলো। সুকুমার বললো, "তোর

আর কি! হোটেল-ডি-পাপায় রয়েছিস—পড়াশোনা না করলেও দিন চলে যাবে। আমাকে দশদিনের মধ্যে চাকরি যোগাড় করতেই হবে।"

চোখের সামনে সুকুমারের এই অবস্থা দেখে সোমনাথের চোখ খুলতে আরম্ভ করেছে। একটা অজানা আশঙ্কা ঘন কুয়াশার মতো অসহায় সোমনাথকে ক্রমশ ঘিরে ধরেছে। তার ভয় হচ্ছে, কোনোদিনই সে চাকরি যোগাড় করতে পারবে না। সুকুমারের মতো তার ভাগ্যেও চাকরির কথা লিখতে বিধাতা ঠাকুর বোধহয় ভুলে গেছেন।

* * *

মেজদা অফিসের এক বন্ধুকে সস্ত্রীক বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছে। জুনিয়রমোস্ট অ্যাকাউনটেন্ট কাজলের তুলনায় এই ভদ্রলোক অনেক বড় চাকরি করেন। কিন্তু কাজলের সঙ্গে ইনি মেলামেশা করেন। একবার বাড়িতে নেমন্তন্ন না করলে ভালো দেখাচ্ছিল না।

বুলবুলের বিশেষ অনুরোধে সোমনাথকে গড়িয়াহাটা থেকে বাজার করে আনতে হয়েছে।

হাতে কোনো কাজ-কর্ম নেই, তবুও আজকাল বাজারে যেতে প্রবৃত্তি হয় না সোমনাথের। অরবিন্দর সঙ্গে ওইখানে দেখা হয়ে যেতে পারে। এবং দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করবে, ফরেনে যাবার ব্যবস্থা কতদূর এগলো। বাজারে যাবার আগে বুলবুল বলেছিল, "তোমার মেজদাকে বাজারে পাঠিয়ে লাভ নেই। হয়তো পচা মাছ এনে হাজির করবেন।"

দূরে থেকে কমলা বউদি হাসতে-হাসতে বললেন, "দাঁড়াও, কাজলকে ডাকছি।"

বুলবুল ঘাড় উঁচু করে বললো, "ভয় করি নাকি? যা সত্যি, তাই বলবো। অফিসে ঠাণ্ডা ঘরে বসে হিসেব করা আর জিনিস বুঝে-শুনে সংসার করা এক জিনিস নয়।"

মেজদার কানে দুই বউয়ের কথাবার্তা এমনিতেই পৌঁছে গেলো। মাথার চুল মুছতে মুছতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বউদিকে অভিজিৎ জিজ্ঞেস করলো, "কী বলছো?"

বউদি রসিকতার সুযোগ ছাড়লেন না। বললেন, "আমাকে কেন? নিজের বউকেই জিজ্ঞেস করো।"

বউকে কিছুই জিজ্ঞেস করলো না মেজদা। বললো, "নিজে বাজারে বেরোলেই পারো।"

"কী কথাবার্তার ধরন! দেখলেন তো দিদি।" বুলবুল স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো কমলা বউদির কাছে!

সোমনাথের এইসব রস-রসিকতা ভালো লাগছে না। সে নিজের ঘরের ভিতর ঢুকে বসে রইলো।

এখান থেকেও ওদের সমস্ত কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। কমলা বউদি কাজলকে বললেন, "কেন তুমি বুলবুল বেচারার পিছনে লাগছো?"

বুলবুল সাহস পেয়ে গেলো। বরকে সোজা জানিয়ে দিলো, "ইচ্ছে হলে বাজার করতে পারি। কিন্তু অগ্নিসাক্ষী রেখে মন্তর পড়ে খাওয়ানো-পরানোর দায়িত্ব নিয়েছিলে কেন?"

স্বামী-স্ত্রীর এই খুনসুটি অন্য সময় মন্দ লাগে না সোমনাথের। বুলবুলের মধ্যে সখীভাবটা প্রবল, আর কমলা বউদির মধ্যে মাতৃভাব। কমলা বউদি দু-একবার সোমনাথকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, "বুলবুলও বউদি, ওকে বউদি বলবে।" ওই জিনিসটা পারবে না

সোমনাথ! ভূতপূর্ব কলেজ-বান্ধবীকে রাতারাতি বউদি করে নিতে পারবে না। বুলবুলও একই পথ ধরেছে। সোমনাথকে ঠাকুরপো বলে না, কলেজের নাম ধরেই ডাকে।

কমলা বউদি বলেছিলেন, "নিদেনপক্ষে সোমদা বোলো।"

বুলবুল তাতেও রাজী হয়নি—"আমার থেকে বয়সে তো বড় নয়। সুতরাং হোয়াই দাদা?"

কমলা বউদির গলা শোনা গেলো। "বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাত্রে ঝগড়া কোরো বুলা। এখন খোকনকে ছেড়ে দাও।"

সোমনাথের ঘরে ঢুকে বুলবুল বললো, "ভাই সোম, রক্ষে করো।"

সোমনাথ নিজেই এবার হাল্কা হবার চেষ্টা করলো। বললো, "দাদার হাত থেকে কী করে রক্ষে করবো? জেনেশুনেই তো বিয়ের মন্ত্র পড়েছিলে?"

দেওরের দিকে তির্যক দৃষ্টি দিলো বুলবুল। তারপর শাড়ির আঁচলে ভিজে হাতদুটো মুছলো। বললো, "তুমিও আমার পিছনে লাগছো সোম? অফিসের যে-লোকটা খেতে আসবে সে বেজায় খুঁতখুঁতে। বউটা তেমনি নাক উঁচু। যদি আপ্যায়নের দোষ হয় অফিসে কথা উঠবে। আর তোমার দাদা আমাকে আস্ত রাখবে না।"

সোমনাথ কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললো, "বাজারে আস্তর চেয়ে কাটার দাম বেশি।"

বুলবুল ছাড়লো না। আঁচলটা কোমরে জড়াতে জড়াতে বললো, "এর প্রতিশোধ একদিন আমিও নেবো, সোম। তোমারও বিয়ে হবে এবং বউকে আমাদের খপ্পরে পড়তে হবে।"

রসিকতায় খুশী হতে পারলো না সোমনাথ। এ-বাড়ির বেকার সোমনাথের বিয়ের কথা তোলা যে ব্যঙ্গ তা মোক্ষদা ঝিও জানে।

বুলবুল বললো, "ইলিশ এবং ভেটকি দু রকমই মাছ নিও, সোম। ওরা আবার আমাদের চিংড়ি মাছও খাইয়েছিল। আমি কিন্তু টেক্কা দেবার চেষ্টা করবো না।"

বাজার ঠিকমতো করেছিল সোমনাথ। কিন্তু বাড়িতে অতিথি আসবে শুনলেই সে অস্বস্তি বোধ করে। অতিথির সঙ্গে পরিচয়ের পর্বটা সোমনাথ মোটেই পছন্দ করে না। দুপুরবেলা হলে সোমনাথ কোথাও চলে যেতো—ন্যাশনাল লাইব্রেরির দরজা তো বেকারদের জন্যেও খোলা রয়েছে। কিন্তু অতিথি আসছেন রাত্রিবেলাতে।

অতিথি পরিচয়ের আধুনিক বাংলা কায়দাটা সোমনাথের কাছে মোটেই শোভন মনে হয় না। নমস্কার, ইনি অভিজিৎ ব্যানার্জির ভাই, বললেই পর্বটা চুকে যাবে না। একটা অলিখিত প্রশ্ন বিরাট হয়ে দেখা দেবে। 'ভাই তো বুঝলাম, কিন্তু ইনি কী করেন?' কলকাতার তথাকথিত ভদ্রসমাজে এ-প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই।

অতিথিরা সন্ধ্যা সাড়ে-সাতটার সময় এলেন। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস এম কে নন্দীকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে বুলবুল এক্সট্রা স্পেশাল সাজ করে সময় গুণছিল। এই সাজের পিছনে বুলবুলের অনেক চিন্তা আছে। মেজদার সঙ্গে জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। বুলবুলকে দেখে কমলা বউদি মন্তব্য করলেন, "এতো ভেবে-চিন্তে শেষ পর্যন্ত এই সাধারণ কাজ হলো!"

বুলবুল উত্তর দিলো, "আর বলেন কেন, দিদি। এইটাই নাকি এখনকার চালু স্টাইল। নিজের বাড়ি তো—খুব ব্রাইট কোনো শাড়ি পরলে এবং লাউড মেক-আপ থাকলে ভাববে ইনি নিজেই বাইরে নেমন্তন্ন রাখতে যাচ্ছেন! তাই মেক-আপ খুব টোন-ডাউন করতে হবে এবং শাড়িটা যেন সাধারণ মনে হয়। কিন্তু শাড়ির দামটা যে মোটেই সাধারণ নয় তা যেন অভ্যাগতরা বুঝতে পারেন। ভাবটা এমন, এতোক্ষণ রান্নাঘরেই ছিলাম, আপনারা এসেছেন শুনে আলতোভাবে মুখের ঘামটা মুছে দ্রুত চলে এসেছি। অতিথি আপ্যায়নের সময় কী নিজের সাজ-গোজের কথা খেয়াল থাকে?"

সোমনাথের হাসি আসছিল। অফিসার হয়েও তাহলে শান্তি নেই—কত রকমের অভিনয় করতে হয়। বুলবুল অবশ্য পারবে—ওর এইসব ব্যাপারে বেশ ন্যাক আছে।

মিস্টার-মিসেস নন্দীকে গেটেই কাজল ও বুলবুল অভ্যর্থনা করলো। এ-বাড়ির রীতি

অনুযায়ী অতিথি দম্পতিকে একবার ওপরে বাবার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। বাবার সঙ্গে দু-একটা কথার পর মিস্টার-মিসেস নন্দী নিচে নেমে এলেন।

মুখে মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে বুলবুল বললো, "আমার ভাশুরের সঙ্গে আপনার আলাপ হলো না। উনি এখন ট্যুরে রয়েছেন।"

মেজদা বললো, "বউদিকে ডাকো।" কমলা বউদিকে ধরে আনবার জন্যে বুলবুল বেরিয়ে যেতেই মিস্টার নন্দীকে মেজদা বললো, "দাদা ব্রিটিশ বিস্কুট কোম্পানিতে আছেন। কয়েক সপ্তাহের জন্যে বোম্বাই গিয়েছেন। ওদের কোম্পানির নাম পাল্টাচ্ছে—ইন্ডিয়ান বিস্কুট হচ্ছে।"

মিস্টার নন্দী বললেন, "হতেই হবে। সমস্ত জিনিসই আমাদের ক্রমশ দিশী করে ফেলতে হবে, মিস্টার ব্যানার্জি।"

"রাখো তোমার স্বদেশী মন্তর," মিসেস নন্দী স্বামীকে বকুনি লাগালেন। "তোমাদের আপিসের সব সায়েবগুলো চলে গিয়ে যখন হরিয়ানী বসবে তখন মজা বুঝতে পারবে।"

মিস্টার নন্দী যে বউয়ের বকুনিতে অভ্যস্ত তা বোঝা গেলো। বেশ শান্তভাবে ইন্ডিয়া কিং সিগারেট ধরিয়ে বউকে তিনি বললেন, "হরিয়ানা এবং স্বদেশীয়ানা যে একই জিনিস তা এখন অনেকেই হাড়ে-হাড়ে বুঝছে। কিন্তু মিনু, সায়েবদের চলে যেতে বলছে কে? শুধু খোলস পাল্টাতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।"

মিসেস নন্দী বললেন, "কোম্পানির পার্টিতে যেতে আমার মোটেই ভালো লাগে না। কিন্তু বাধ্য হয়ে প্রেজেন্ট থাকতে হয়।"

"কী করবেন বলুন। যে-পুজোর যে-মন্ত্র," সুদর্শনা ও সুসজ্জিতা মিসেস নন্দীকে সান্ত্বনা দিলো অভিজিৎ।

মিসেস নন্দী বললেন, "সেদিনের ককটেল পার্টিতেও স্বদেশীর কথা উঠেছিল। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস চোপরা তিনমাস ফরেন বেড়িয়ে এসে ভীষণ স্বদেশী হয়ে উঠেছেন। বললেন, মেয়েদের কস্‌মেটিক্‌স এবং ছেলেদের স্কচ্‌ হুইস্কি ছাড়া আর সব জিনিস স্বদেশী হয়ে গেলে তাঁদের কোনো আপত্তি নেই।"

বুলবুল সেদিন পার্টিতে উপস্থিত ছিল। পার্টির শেষের দিকে বেশ কয়েক পেগ ফরেন হুইস্কি পান করে মিসেস চোপরা আরও উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। বুলবুলের কোমরে হাত রেখে পঞ্চাশ বছরের যুবতী মিসেস চোপরা বলেছিলেন, "দেশের মঙ্গলের জন্যে ইম্‌পোর্টেড কস্‌মেটিক্‌স আনা কয়েক বছর বন্ধ হলে তাঁর আপত্তি নেই।"

বুলবুলের কথা শুনে হা-হা করে হেসে উঠলেন মিস্টার নন্দী। "মিসেস ব্যানার্জি আপনি সত্যিই খুব সরল প্রকৃতির মানুষ। আপনি মিসেস চোপরার কথা বিশ্বাস করলেন? উনি বলবেন না কেন? এবার ফরেন থেকে ফেরবার সময় মহিলা যা কস্‌মেটিক্‌স এনেছেন তাতে ওঁর সমস্ত জীবন সুখে কেটে যাবে।"

"ও মা!" মিসেস নন্দী স্কুলের কিশোর বালিকার মতো বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

মিস্টার নন্দী বললেন, "এসব ভিতরের খবর। বিশ্বাস না-হলে, ট্র্যাভেল ডিপার্টমেন্টের অ্যারো মুখার্জিকে জিজ্ঞেস করবেন। কাস্টমসের নাকের সামনে দিয়ে বিনা-ডিউটিতে ওই মাল ছাড়িয়ে আনতে বেচারার ব্লাড-প্রেসার বেড়ে গিয়েছে। উপায়ও নেই—রিজিওন্যাল ম্যানেজারের বউ। লিপস্টিকের ওপর ডিউটি ধরলে অ্যারো মুখার্জির চাকরি থাকবে না।"

"ওমা? তুমি তখন বললে না কেন চুপি চুপি।" মিসেস নন্দী আবার বালিকা-বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

"কেন মিসেস নন্দী? সি-বি-আইকে খবর পাঠাতেন নাকি?" অভিজিৎ রসিকতা করলো।

"কিছুই করতাম না। শুধু মহিলাকে নেশার ঘোরে ভুলিয়ে-ভালিয়ে দু-একটা লিপস্টিক হাতিয়ে নিতাম," মিসেস নন্দী আপসোস করলেন।

মিস্টার নন্দী সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন, "সে-মুরোদ তোমাদের নেই। মিসেস চোপরার কালচারে মানুষ হলে চক্ষুলজ্জা থাকতো না, তখন হেসে কেঁদে কিংবা স্রেফ অঙ্গভঙ্গী

দেখিয়ে ঠিক ম্যানেজ করে আনতে। ওরা যেমন নির্লজ্জভাবে বড়কর্তাদের জন্যে তেল পাম্প করে, তেমনি নির্দয়ভাবে নিচু থেকে তেলের সাপ্লাই প্রত্যাশা করে।"

একতলা ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে চারজনের মধ্যে কথা হচ্ছে। নিজের ঘরে বসেই সোমনাথ এসব স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

ঘুরতে ঘুরতে ওরা যে এবার সোমনাথের ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছে তা সোমনাথ বুঝতে পারলো। দরজাটা অর্ধেক খোলা ছিল। অভিজিৎ একটা আলতো টোকা মারলো। সোমনাথ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো।

"উঠবেন না, উঠবেন না, বসুন।" হাঁ-হাঁ করে উঠলেন মিস্টার নন্দী।

মেজদা বললো, "আমার ইয়ংগেস্ট ভাই সোমনাথ।" তারপর সোমনাথকে বললো, "খোকন, আমাদের অফিসের ট্রেনিং অ্যান্ড স্টাফ ম্যানেজার মিস্টার নন্দী।"

সোমনাথ সম্পর্কে শূন্যস্থান পূরণের জন্যে মিসেস নন্দী স্বভাবসিদ্ধ কৌতূহলী দৃষ্টিতে বুলবুলের দিকে তাকালেন। বুলবুলের বুঝতে বাকি রইলো না, মিসেস নন্দী কী জানতে চাইছেন। বুলবুলের বেশ অস্বস্তি লাগছে।

অভিজিৎও অস্বস্তি বোধ করছে। কিন্তু সে কায়দা করে উত্তর দিলো, "সামনে ওর নানা পরীক্ষা রয়েছে। বাড়ির ছোট ছেলে তো, আমরা তাই একটু বেশি করে ভাবছি।"

"ঠিক করছেন মশায়," উৎসাহিত হয়ে উঠলেন মিস্টার নন্দী। "মার্চেন্ট ফার্মে অফিসার পোস্টে ঢুকিয়ে ওর জীবনটা বরবাদ করে দেবেন না। তার থেকে আই-এ-এস-টেস অনেক ভালো।"

কান লাল হয়ে উঠেছিল সোমনাথের। অপমান ও উত্তেজনার মাথায় সে হয়তো কিছু বলেই ফেলতো। কিন্তু মিস্টার নন্দী বাঁচিয়ে দিলেন। বুলবুলকে বললেন, "ওঁর পড়াশোনায় ডিসটার্ব করে লাভ নেই। চলুন আমরা অন্য কোথাও যাই।"

সোমনাথের মুখটা যে কালো হয়ে উঠছে, তা দাদা ছাড়া কেউ লক্ষ্য করলো না।

কমলা বউদি ভিতরে খাবারের ব্যবস্থা করছেন। আর বাইরের ঘরে ওঁরা চারজন এসে বসলেন। ওঁদের সব কথাবার্তা সোমনাথ এখান থেকে শুনতে পাচ্ছে।

মিস্টার নন্দী অভিযোগ করলেন, "জিনিসপত্তরের দাম যেভাবে বাড়ছে তাতে আর চলছে না, মিস্টার ব্যানার্জি। আপনারা অ্যাকাউনটেন্টরা দেশের যে কী হাল করলেন।"

"আমরা কী করলাম? দেশের ভার তো অ্যাকাউনটেন্টদের হাতে দেওয়া হয়নি, তাহলে ইন্ডিয়া'র এই অবস্থা হতো না!" অভিজিৎ হাসতে-হাসতে উত্তর দিলো।

"পার্সোনেল অফিসারদের হাতেও দেশটা নেই। থাকলে, অন্তত স্কুলে-কলেজে, পথে-ঘাটে, কল-কারখানায়, অফিসে-আদালতে ডিসিপ্লিনটা বজায় রাখা যেতো।" দুঃখ করলেন মিস্টার নন্দী।

"তাহলে দেশটা রয়েছে কার হাতে?" একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করলেন মিসেস নন্দী।

"মা জননীদের হাতে!" রসিকতা করলেন মিস্টার নন্দী। "সঙ্গে তালিম দিচ্ছেন কয়েকজন ব্রীফলেস উকিল এবং টেক্সট-বুক পড়া প্রফেসর। ম্যানেজমেন্টের 'ম' জানেন না এঁরা।"

এবার তুলনামূলক সমালোচনা আরম্ভ করলেন মিসেস নন্দী। "পার্সোনেল অফিসারদের থেকে আপনারা অনেক ভালো আছেন, মিস্টার ব্যানার্জি।"

"এতো দুঃখ করছেন কেন, মিসেস নন্দী?" বুলবুল জিজ্ঞেস করলো।

"অনেক কারণে ভাই। বাড়িতে পর্যন্ত শান্তি নেই। লোকে যেমনি শুনলো পার্সোনেল অফিসার, অমনি চাকরির তদ্বির শুরু হয়ে গেলো।"

মিস্টার নন্দীও সায় দিলেন। "বন্ধুর বাড়ি, বিয়ে বাড়ি, এমনকি বাজার-হাটেও যাবার উপায় নেই। চেনা-অচেনা হাজার-হাজার চাকরির জন্যে খাই-খাই করছে। চাকরি কি মশাই আমি তৈরি করি?"

মিসেস নন্দী বললেন, "আগে ওঁর ঠাণ্ডা মাথা ছিল, লোকের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলতেন—এখন চাকরির নাম শুনলে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন।"

"ধৈর্য থাকে না, মিস্টার ব্যানার্জি." এম কে নন্দীকে বলতে শোনা গেলো।

"মেয়ের বিয়ে এবং ছেলের চাকরির জন্যে বাঙালীরা তো চিরকালই ধরাধরি করে এসেছে, মিস্টার নন্দী." বুলবুল হঠাৎ বলে ফেললো। পরে বুলবুলের মনে হলো কথাটা মিস্টার নন্দীর মনঃপূত নাও হতে পারে।

"বাঙালী ছেলেদের চাকরি!" আঁতকে উঠলেন মিস্টার নন্দী। তারপর বললেন. "কিছু যদি মনে না করেন, তাহলে সত্যি কথাই বলি। বাংলার শিক্ষিত বেকাররা বিধাতার এক অপূর্ব সৃষ্টি। এরা স্কুল-কলেজে দুলে দুলে কিছু মানে-বই মুখস্থ করেছে—কিন্তু এক লাইন ইংরিজি স্বাধীনভাবে লিখতে শেখেনি। বারো-চোদ্দ বছর ধরে প্রতিদিন স্কুলে এবং কলেজে গিয়ে এরা এবং এদের মাস্টারমশায়রা যে কী করেছেন ভগবান জানেন! পৃথিবীর কোনো খোঁজই এরা রাখে না। এরা জানে না মোটর গাড়ি কীভাবে চলে; কোন্ সময়ে ধান হয়, সিপিয়া রংয়ের সঙ্গে লাল রংয়ের কী তফাত। এরা কলমের থেকে ভারী কোনো জিনিস তিন-পুরুষের মধ্যে তোলেনি। এরা রাঁধতে জানে না, খাবার খেয়ে নিজেদের থালাবাসন ধুতে পারে না, মায় নিজেদের জামা-কাপড়ও কাচতে পারে না। অন্য লোকে ঝাঁটা না ধরলে এদের ঘরদোর পরিষ্কার হবে না। দৈহিক পরিশ্রম কাকে বলে এরা জানে না। এরা কোনো হাতের কাজ শেখেনি. ম্যানার জানে না. কোনো অভিজ্ঞতা নেই এদের। এরা শুধু আন-এমপ্লয়েড নয়, আমাদের প্রফেশনে বলে আন-এমপ্লয়েব্‌ল। এদের চাকরি দিয়ে কোনো লাভ নেই।"

এ-ঘরে বসে সোমনাথ ভাবছে. মেজদা কিছু মতামত দিচ্ছে না এই যথেষ্ট।

মিস্টার নন্দী বোধহয় একটা সিগারেট ধরালেন। কারণ দেশলাই জ্বালানোর শব্দ হলো। তাঁর গলা আবার শোনা গেলো। "এই ধরনের লক্ষ লক্ষ অদ্ভুত জীব আমাদের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জগুলোতে নাম লিখিয়ে চাকরির আশায় বাড়িতে কিংবা পাড়ার রকে বসে আছে। হাজার পঞ্চাশেক স্কুল-কলেজ আরও কয়েক লাখ একই ধরনের জীবকে প্রতিবছর চাকরীর বাজারে উগরে দিচ্ছে। অথচ এই সব অভাগাদের জন্যে দেশের কারও কোনো মাথা-ব্যথা নেই। এরা সমাজের কোন্ কাজে লাগবে বলতে পারেন? স্কুল-কলেজে এমন ধরনের অপদার্থ বাবু আমরা কেন তৈরি করছি পৃথিবীর কেউ জানে না।"

"আমাদের সমাজই তো এদের এইভাবে তৈরি করছে, মিস্টার নন্দী," অভিজিৎ গভীর দুঃখের সঙ্গে মৃদু প্রতিবাদ করলো।

মিস্টার নন্দী বোধহয় সিগারেটে টান দিলেন। তারপর বললেন, "ইনটারভিউতে বসে এইসব বেঙ্গলী ছেলেদের তো দেখছি আমি। চোখ ফেটে জল আসে। উগ্রপন্থীরা যে বলতো স্কুল-কলেজ বোমা মেরে বন্ধ করে দাও, তার মধ্যে কিছু লজিক ছিল মিসেস ব্যানার্জি। কারণ স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এইসব ছেলেদের স্বয়ং ভগবানও এই সমাজে প্রোভাইড করতে পারবেন না।"

"দোষটা তো এই ছেলেদের নয়।" অভিজিতের গলা শোনা গেলো।

"সেইটাই তো আরো দুঃখের। এরা জানে না, এদের কি সর্বনাশের পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। যে-হারে নতুন চাকরি হচ্ছে তাতে ইতিমধ্যেই যারা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের লিস্টে নাম লিখিয়েছে তাদের ব্যবস্থা করতে আশি-পঁচাশি বছর লেগে যাবে। অর্থাৎ, এখন যদি বাইশ-তেইশ বছর বয়স হয়, চাকরির চিঠি আসবে একশ' দুই বছর বয়সে।"

মিস্টার নন্দী বললেন, "শতখানেক সরকারী চাকরির জন্যে লাখদশেক অ্যাপ্লিকেশন পড়তে পারে এমন খবর পৃথিবীর কেউ কোথাও কোনোদিন শুনেছে? সবচেয়ে দুঃখের কথা, গভরমেন্টও এদের কাছে বেমালুম মিথ্যা কথা বলছে। ওরে বাবা, মুরোদ থাক-না-থাক অন্তত সত্যবাদী হও। ইয়ংমেনদের কাছে স্বীকার করো, এ-সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা কোনো সরকারের নেই। তাহলে ছেলেগুলোর অন্তত চৈতন্যোদয় হয়, নিজের ব্যবস্থা নিজেরা করে ফেলতে পারে।"

"নিজের ব্যবস্থা আর কী করবে, মিস্টার নন্দী?" অভিজিৎ দুঃখের সঙ্গে বললো।

"যাদের কেউ নেই, তাদের করতেই হয়," মিস্টার নন্দী উত্তর দিলেন। "আপনি

কলকাতার চীনেদের দেখুন। তিন-চারশ' বছর ধরে তো ওরা কলকাতায় রয়েছে। ওদের ছেলেপুলেরাও তো লেখাপড়া শিখছে। কিন্তু কখনও এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে কোনো চীনেকে দেখেছেন? ওদের যে চাকরির দরকার নেই এমন নয়। কিন্তু ওরা জানে, এই সমাজে কেউ ওদের দেখবে না, কেউ ওদের সাহায্য করবে না, নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে। তাই নীরবে সেই অবস্থার জন্যে ছেলেদের ওরা তৈরি করেছে। এবং খুব দুঃখে-কষ্টে নেই ওরা।"

মিসেস নন্দী একটু বিরক্ত হলেন। "আমরা তো আর চীনে নই—সুতরাং বারবার চীনের কীর্তন গেয়ে কী লাভ?"

হেসে ফেললেন মিস্টার নন্দী। "গিন্নির ধারণা আমি প্রো-চাইনীজ।"

"আমরাও প্রো-চাইনীজ—বিশেষ করে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে।" অভিজিৎ মন্তব্য করলো।

একবার হাসির হুল্লোড় উঠলো।

মিস্টার নন্দী বললেন, "সুইডেনের প্রফেসর জোরগেনসেন এসেছিলেন কিছুদিন আগে। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত। এই চাকরি-বাকরির ব্যাপারে নানা দেশে অনেক গবেষণা করেছেন। আমার সঙ্গে এক ডিনারে আধঘণ্টার জন্যে দেখা হয়ে গেলো। তিনি বললেন, অর্থনীতি এবং রাজনীতির অনেক প্রাথমিক আইনই তোমাদের এই বেঙ্গলে খাটে না। অন্য দেশে বেকার বললেই একটা ভয়াবহ ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একটা রুক্ষ মেজাজের সর্বনাশা চেহারার লোক—যার কোনো সামাজিক দায়দায়িত্ব নেই, যে প্রচণ্ড রেগে আছে। ইংলন্ডের কিছু-কিছু প্রি-ওয়ার উপন্যাসে এদের পরিচয় পাবে। লোকটা বোমার মতন—কারণ সে অনাহারে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তার আশ্রয় নেই, জামা-কাপড় নেই। যে-কোনো মুহূর্তে সে ফেটে পড়তে পারে।"

একটু থামলেন মিস্টার নন্দী। তারপর আরম্ভ করলেন, "প্রফেসর জোরগেনসেন বললেন, তোমাদের এই বেঙ্গলে এসে কিন্তু তাজ্জব বনে গেলাম। রাস্তায় রাস্তায় পাড়ায় পাড়ায় এমন কি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়েও বেকার সমস্যার বাহ্যিক ভয়াবহতা দেখলাম না। অথচ তোমাদের এখানে যত বেকার আছে তার এক-দশমাংশ কর্মহীন অন্য যে-কোনো সভ্য দেশকে লণ্ডভণ্ড করে দিতো। তোমাদের বেকাররা অস্বাভাবিক শান্ত। আর বেকারি ভাতা না থাকলেও তোমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলি এদের সর্বনাশ করে দিচ্ছে। অনেকেরই যেন-তেন উপায়ে খাওয়া জুটে যাচ্ছে। তোমাদের পারিবারিক জীবন এই বোমাগুলোকে ফিউজ করে দিচ্ছে—এরা ফেটে পড়তে পারছে না। নতুন জীবনের অ্যাডভেঞ্চারেও নামতে পারছে না এরা। তাই সমস্যা সমাধানে কোনো তাড়া নেই—নাউ অর নেভার, একথা কারও মুখে শোনা যাচ্ছে না।"

মিস্টার নন্দী থামলেন না। বললেন, "জানেন মিস্টার ব্যানার্জি, প্রাইভেট ফার্মে চাকরি না করলে বলতাম—বেকারি অনেকটা ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বরের মতো। এখনই মৃত্যুভয় নেই, কিন্তু আস্তে আস্তে জীবনের প্রদীপ শুকিয়ে আসছে। পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ যুগে যুগে যৌবনকে জয়টীকা পরিয়েছে। ক্যাপিটালিস্ট বলুন, সোসালিস্ট বলুন, কম্যুনিস্ট বলুন, সবদেশে যৌবনের জয়জয়কার। আর আমাদের এই পোড়া বাংলায় যুবকদের কি অপমান। লাখ লাখ নিরপরাধ শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের যৌবন কেমন বিষময় হয়ে উঠেছে দেখুন। ওরা যদি বলতো, সমাধান আজই চাই। আজ সমাধান না হলে, কাল সকালেই যা হয় করবো—তাহলে হয়তো দেশের ভাগ্য পাল্টে যেতো।"

মিস্টার নন্দীর কথাগুলো শুনতে শুনতেই সোমনাথের রক্তে আগুন ধরে যাচ্ছিল। একবার মনে হলো, তাকে শোনাবার জন্যেই যেন গোপন ষড়যন্ত্র করে নন্দীকে আজ এ-বাড়িতে আনা হয়েছে।

কিন্তু এ-সমস্ত কথা যে সোমনাথের কানে যাচ্ছে তা মেজদা এবং বুলবুল কল্পনাও করতে পারেনি। সোমনাথের ঘরে ঢুকে বুলবুল একবার বলতে এলো, "সোম, তুমিও এসো। সবাই একসঙ্গে খেয়ে নেওয়া যাবে।"

সোমনাথ রাজী হলো না। বললো, "আজকে খাওয়াটা বাদ দেবো ভাবছি। পেটের অবস্থা খারাপ।"

বুলবুল চলে গেলো। খবর পেয়ে কমলা বউদি এলেন। "কখন পেট খারাপ করলো? আগে বলোনি তো।"

সোমনাথ বললো, "এমন কিছু নয়, আপনি অতিথিদের দেখুন।"

কমলা বউদি বললেন, "ফ্রিজে রুই মাছ রয়েছে—একটু পাতলা ঝোলের ব্যবস্থা করে ফেলি?"

"পাগল হয়েছেন," সোমনাথ আপত্তি করলো। "একদিন শাসন করলেই ঠিক হয়ে যাবে। পেটকে অনেকদিন আস্কারা দিয়ে এই অবস্থা হয়েছে।"

* * *

সোমনাথ মনস্থির করে ফেলেছে। কিন্তু বাড়ির লোকেরা বুঝতে পারেনি। সেদিন সকালে বেরোবার সময় বউদি আবার সোমনাথকে মনে করিয়ে দিলেন, "বাবা বলছিলেন, আজ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড রিনিউ করবার দিন।"

সোমনাথের যে এ-বিষয়ে আগ্রহ নেই তা বউদি বুঝলেন—তাই বললেন, "বাবা বলছিলেন আজ, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড না থাকলে অনেক অফিসে কথাই শুনবে না।"

সোমনাথ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে সকালটা কাটালো। ওখান থেকে বেরুবার সময়ে বিশুবাবুর সংগে দেখা হয়ে গেলো।

বিশুবাবুর সঙ্গে ফুটবল খেলার মাঠে আলাপ। সুকুমারই বিশুবাবুর সঙ্গে প্রথম ভাব জমিয়েছিল। ভদ্রলোক ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিশ্বস্ত ভক্ত। বিশুবাবু বিজনেস করেন, এ-খবরও খেলার মাঠে অনেকবার শুনেছে সোমনাথ।

বিশুবাবুর কালো আবলুশ কাঠের মতো গায়ের রং। মাথার চুলগুলো কপালের দিক থেকে পাতলা হতে আরম্ভ করেছে। তার ফলে কপালটা চওড়া মনে হয়। মধ্যপ্রদেশেও ঈষৎ মেদ জমতে শুরু করেছে বিশুবাবুর। বয়স চুয়াল্লিশ-প'য়তাল্লিশ হবে।

হাতে একটা ফোলিও ব্যাগ নিয়ে বিশুবাবু রাস্তার হিন্দুস্থানী দোকান থেকে বাংলা পান কিনছিলেন। সোমনাথকে দেখে বিশুবাবু চিৎকার করে উঠলেন, "কী মোহনবাগান? খবর কী?"

সোমনাথের মতামত না নিয়েই বিশুবাবু আর একটা পানের অর্ডার দিলেন। পান নিতে সোমনাথ একটু ইতস্তত করছিল। বিশুবাবু বকুনি লাগালেন। "এটা জেনে রাখবে পানের কোনো সময় নেই। যে-কোনো সময় যতগুলো ইচ্ছে চিবোতে পারো—শুধু ওই লাল মসলাগুলো খেয়ো না।"

পানওয়ালার কাছে নিজের গুণ্ডিমোহিনী বিশুবাবু আলাদাভাবে চেয়ে নিলেন। তারপরে বললেন, "মোহনবাগানের কতগুলো অপয়া ছেলে কালকে ইস্টবেংগল-স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলা দেখতে এসেছিল। উদ্দেশ্য ইস্টবেংগলের একটা পয়েন্ট খাওয়া। দিস্ ইজ ব্যাড।" মতামত দিলেন বিশুবাবু। "তোমার ক্লাবকে তোমার সাপোর্ট করবার রাইট আছে, কিন্তু গায়ে-পড়া অপয়া ছেলেকে অন্য ক্লাবের সাপোর্টে পাঠিয়ে তাদের পয়েন্ট খাওয়া মোটেই স্পোর্টসম্যান-লাইক নয়।"

অন্য সময় হলে ফিক করে হেসে ফেলতো সোমনাথ। এমনকি বিশুবাবুর সঙ্গে তর্ক করে বলতো শত্রুকে হারাবার জন্যে কোনো চেষ্টাই অন্যায় নয়। সত্যি কথা বলতে কি, সুকুমারের প্ররোচনায় সোমনাথ একবার ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট খেয়ে এসেছে। আজকে এসব প্রসঙ্গের অবতারণা করবার মতো মনের অবস্থা নেই সোমনাথের।

পান চিবোতে চিবোতে বিশুদা জানতে চাইলেন, "হোয়ার ইজ ইওর ফ্রেন্ড সুকুমার?"

সুকুমার গোল্লায় যেতে বসেছে। আজ সকালেও বাসস্ট্যান্ডের কাছে সুকুমারকে দেখতে পেয়েছে সোমনাথ। এক ভদ্রলোককে মোটর সাইকেল থেকে নামিয়ে জিজ্ঞেস করছে, পৃথিবীর ওজন কত?

সোমনাথ ছুটে না-এলে ভদ্রলোক হয়তো বেচারা সুকুমারকে মেরে বসতেন। মারের হাত থেকে বেঁচে সুকুমার বললো, "দেখছিস তো, কোনো লোক জেনারেল নলেজে হেল্প করতে চায় না। আমার চাকরি হলে তোমার কি ক্ষতি বাবা?" কোনোরকমে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সোমনাথ ওকে যাদবপুরের বাসে তুলে দিয়েছিল। কন্ডাকটরের হাতে বাসের ভাড়া দিয়ে বলেছিল সুলেখা স্টপেজের পরেই নামিয়ে দিতে।

বিশুবাবুর কাছে সোমনাথ এসব কিছুই বললো না।

"তোমার খবর কী?" বিশুবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

সঙ্কোচ কাটিয়ে সোমনাথ এবার জিজ্ঞেস করলো, "বিশুদা, যাদের চাকরি-বাকরি হয় না তাদের কী করা উচিত?"

পানের পিচটা হজম করে নিয়ে জাঁদরেল বিশুদা বললেন, "ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। সামনে যা পাওয়া যায় তাই পাকড়ে ধরতে হয়।" একটু ভেবে একগাল হেসে বিশুদা বললেন, "এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে লাইন মেরে বিরক্তি ধরে গিয়েছে বুঝি? বোম কালী কলকাত্তাওয়ালী বলে ঝাঁপিয়ে পড়ো!"

"কোথায় ঝাঁপাবো?" সোমনাথ একটু ঘাবড়ে যায়।

"ঘাবড়াবার কিছুই নেই," বিশুদা সোমনাথের পিঠে এক আলতো চাপড় লাগালেন। "চলো আমার সঙ্গে।"

বিশুবাবুর সঙ্গে হাঁটতে আরম্ভ করলো সোমনাথ। জি পি ও, রাইটার্স বিল্ডিংস এবং লালবাজার পেরিয়ে ওরা দুজনে এবার চিৎপুর রোডে পড়লো। আরও একটু এগিয়ে ডানদিকে পোদ্দার কোর্ট। তারপরে বাগড়ি মারকেট। বিশুবাবু বললেন, "ব্যাটাছেলের কোনো ইচ্ছে হলে সঙ্গে সঙ্গে কাজে নেমে পড়তে হয়।"

সোমনাথ বললো, "আচ্ছা বিশুদা, বিজনেস করতে হলে কত টাকা লাগে?"

বিশুদা হেসে ফেললেন। বললেন, "হোল বিজনেস লাইফে এমন ডিফিকাল্ট কোশ্চেন আমাকে কেউ করেনি। এর উত্তর হলো—দশ পয়সা থেকে দশ কোটি টাকা। ঐ যে কলা-ওয়ালা দেখছো ওর দু টাকাও পুঁজি নেই। আর সামনে পোদ্দার কোর্ট দেখছো, বুঝতেই পারছো কত টাকা খরচ হয়েছে বাড়িটা করতে। টাটা-বিড়লাদের টাকার যদি হিসেব চাও তাহলে মাথায় হাত দিয়ে বসবে। ওদের কোম্পানিগুলোর ব্যালান্সসীট থেকে ফিগার বার করে যোগ দিতে গেলে স্রেফ হেদিয়ে যাবে।"

"টাকা না-হলেও বিজনেস হতে পারে?" সোমনাথ একটু ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞেস করলো।

"আলবৎ হয়! এই যে কলকাতার সব লক্ষপতি, কোটিপতি গোয়েঙ্কা, জালান, থাপার, কানোরিয়া, বাজোরিয়া, সিংহানিয়া দেখছো এরা সব কি রাজস্থান, হরিয়ানা থেকে লাখ লাখ টাকা পকেটে নিয়ে কলকাতায় বিজনেস করতে এসেছিল? খোঁজ নিলে দেখা যাবে, মূলধন বলতে অনেকেরই আদিতে রয়েছে ওয়ান লোটা এবং ওয়ান কম্বল।"

বিশুদা বললেন, "অন্য লোক কেন? আমার নিজেরই কেস দ্যাখো না। পার্টিশনের সময় যশোর থেকে চলে এসেছিলাম। ক্যাপিটাল বলতে পৈতৃক এই গতরটি। বিদ্যেরও জাহাজ—টি টি এম পি অর্থাৎ কিনা টেনে-টুনে-ম্যাট্রিক পর্যন্ত। কলকাতায় হাইকোর্ট বিল্ডিং ছাড়া কিছুই চিনি না। ওই বাড়িটা নেহাত প্রত্যেক বাঙালকেই তখন চিনতে হতো, ঘটিরা প্রথম চান্সেই বাঙালকে হাইকোর্ট দেখিয়ে দিতো। এই শহরে কে তখন আমাকে

চাকরি দেবে! তাই জয়-মা-কালী কলকাত্তাওয়ালী বলে ব্যবসায় লেগে গেলুম। তারপর কোয়ার্টার-অফ-এ সেঞ্চুরি তো ম্যানেজ হয়ে গেলো।”

বিশুদা এরপর সোমনাথকে কানোরিয়া কোর্টে তাঁর অফিসে নিয়ে গেলেন। বললেন, “এ আর-এক অজানা জগৎ, বুঝলে ব্রাদার। সত্তর-আশিখানা ঘর আছে এই বাড়িতে। আবার প্রত্যেক ঘরে যে কতগুলো করে কোম্পানি আছে তা ভগবানই জানেন। পনেরো বছর আগে তখন আমার রমরমা অবস্থা চলছিল, সেই সময় ছ'তলার বাহাত্তর নম্বর ঘরখানা বাড়িওয়ালার দরোয়ানকে আড়াই হাজার টাকা সেলামী দিয়ে ম্যানেজ করেছিলুম। এখনও চালাচ্ছি সেই অফিস থেকে।”

এই বাড়িতে একটা প্রাগৈতিহাসিক লিফট আছে। লিফটের সামনে বিরাট লাইন। বিশুদা বললেন, “সর্বদাই ভিড় লেগে রয়েছে। আগে দিনকাল ভালো ছিল। মাসে পাঁচ টাকা বকশিশ পেলে লিফটম্যান সুন্দরলাল প্রেফারেন্স দিয়ে নিয়ে যেতো। বলতো মালিকের আদমী। এখন সে-উপায় নেই। বাবু থেকে আরম্ভ করে বেয়ারা পর্যন্ত সবাই আপত্তি তোলে। সুতরাং লাইনে দাঁড়াতে হয়। অনেক সময় লেগে যায়।”

সোমনাথ অবাক হয়ে শুনছিল বিশুদার কথা। বিশুবাবু বললেন, “জানো ব্রাদার, বিজনেসম্যান হলেই সোজা পথে কিছু করতে ইচ্ছে হয় না। তাড়াতাড়ি ম্যানেজ করবার জন্যে ছটফটানি লেগে থাকে! হয় লাইন ভেঙে এগিয়ে যাবো, দু-চার পয়সা দিয়ে ম্যানেজ করবো—আর তা যদি সম্ভব না হয় সিঁড়ি বেয়েই উঠবো।”

এরপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাওয়ার প্রস্তাব করলেন বিশুদা। সোমনাথের আপত্তি নেই। হাঁপাতে হাঁপাতে ছ'তলায় উঠে বিশুবাবু বললেন, “বুঝতে পারছি বয়স হচ্ছে—এখন ছ'তলায় উঠতেই কষ্ট হয়। তোমাদের আর কি ইয়ংম্যান—কেমন তরতর করে উঠে এলে।”

ছ'তলাটাও একটা ছোটোখাটো পাড়ার মতো। অসংখ্য সরু গলি এদিক-ওদিক চলে গিয়েছে। সোমনাথ বললো, “এর মধ্যে লোকে নিজেদের অফিস খুঁজে পায় কী করে?”

বিশুবাবু হেসে উত্তর দিলেন, “প্রথম প্রথম আমারও তাই মনে হতো। নিজের অফিসই খুঁজে পেতাম না! তারপর অভ্যাস হয়ে গেলো।”

বাহাত্তর নম্বর ঘরের সামনে এসে বিশুবাবু বললেন, “এই আমার অফিস।”

বিশুবাবু আরও যা বললেন তার থেকে জানা গেলো অফিসটা একসময় পুরোপুরি বিশুবাবুর ছিল। এখন তিনি অনেককে সাবলেট করেছেন। এই ঘরখানার মধ্যেই গোটা কুড়ি কোম্পানি চালু রয়েছে। এরা কিছু কিছু ভাড়া দেয় বিশুদাকে। তার থেকে বাড়িওয়ালার পাওনা চুকিয়েও বিশুবাবুর সামান্য লাভ থেকে যায়।

বিশুবাবু বলছেন এতোগুলো অফিস। কিন্তু ঘরে লোকজন তেমন দেখা গেলো না। গোটা দশেক টেবিল অবশ্য রয়েছে। বিশুবাবু হাসলেন। বললেন, “প্রত্যেক টেবিলে দুখানা করে কোম্পানি। এক কোম্পানি এধারে এবং আরেক কোম্পানি ওধারে। অফিসে বসে থাকলে তো পেট চলবে না। মালিকরা সবাই বাজারে মাছ ধরতে বেরিয়েছেন।”

বিশুবাবুর ওখানেই আর একটি লোকের সঙ্গে আলাপ হলো। বিশুবাবু বললেন, “ইনিই আমাদের কমান্ডার-ইন-চীফ ফকিরচন্দ্র সেনাপতি। নামে সেনাপতি কাজেও সেনাপতি। আমার সঙ্গে লাস্ট বাইশ বছর আছে। বাবা সেনাপতি, সোমনাথবাবু নতুন এলেন, একটু চা খাওয়াবি নাকি?”

সেনাপতি এতোক্ষণ পিটপিট করে সোমনাথের দিকে তাকাচ্ছিল। সে ময়লা একটা ধুতি পরেছে, তার ওপর ধরে-কাচা পরিষ্কার কিন্তু ইস্তিরিবিহীন খাকি কোট। সেনাপতির ঠোঁট লাল, দাঁতে পানের ছোপ। ফকিরচন্দ্র কেটলি হাতে নিয়ে বিশুবাবুর দিকে ইঙ্গিত করে কী যেন জানতে চাইলো।

বিশুবাবু হাসতে হাসতে বললেন, “ও-হরি ভুলেই গিয়েছিলুম। তিন নম্বর চা নিয়ে আয়।”

সেনাপতি চলে যেতেই বিশুবাবু বললেন, “এই নম্বরের ব্যাপারটা বুঝলে না নিশ্চয়। তিন নম্বর হলো ভালো চা উইথ ওমলেট অ্যান্ড টোস্ট। দু নম্বর হলো ভালো চা উইথ

বিস্কুট। এবং এক নম্বর হলো স্রেফ অর্ডিনারি চা। যে-কোনো ভদ্র জায়গায় হলে অর্ডিনারি চায়ের নম্বর হতো তিন। কিন্তু এটা বিজনেসের জায়গা। কাস্টমার বা গেস্ট কিছুই বুঝতে পারবে না—ভাববে মিস্টার বোস এক নম্বর কায়দাতেই আপ্যায়ন করছেন।"

ফকির সেনাপতি চা ও খাবার নিয়ে আসতেই বিশুবাবু বললেন, "এই শ্রীমানকেই দেখো। আগে যেখানে কাজ করতো সেখানে সবাই ফকির বলে ডাকতো। ব্যাপারটা আমার ভালো লাগলো না। বিজনেসে আমরা কেউ ফকির হতে আসিনি। এখানে সব সময় ঐ অপয়া ডাক মোটেই ভালো লাগলো না। তখন থেকে শ্রীমানকে সেনাপতি করে দিলুম।"

লাজুক-লাজুক মুখভঙ্গিতে ফকিরচন্দ্র ফিক করে হাসলো। বিশুবাবু বললেন, "শ্রীমানের গুণের শেষ নেই। সব ক্রমশ জানতে পারবে। মিঃ সেনাপতি এই ঘরে রাত্রে থাকেন এবং এই অফিসের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।"

ফকির সেনাপতি আবার ফিক করে হাসলো।

বিশুবাবু এবার সোমনাথকে বললেন, "তোমার যদি ইচ্ছে হয় বিজনেসে লেগে যাও। আমার ঘরটা তো রয়েছে। ছ'নম্বর টেবিলের এগারো নম্বর সীট খালি পড়ে আছে। নোপানি নামে এক ছোকরা ভাড়া নিয়েছিল। মাস তিনেক তার কোনো পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। খবর নেবার জন্যে নোপানির বাড়িতে সেনাপতিকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সেখান থেকেও শ্রীমান কেটে পড়েছেন। সুতরাং তুমি ইচ্ছে করলে শূন্য চেয়ারে বসে পড়তে পারো।"

বিশুবাবু বললেন, "আমার খুব ইচ্ছে বাঙালীরা বিজনেস লাইনে আসুক। কিন্তু আসে কই? তুমি যদি সাহস দেখাতে পারো খুব খুশী হবো। তিনটে মাস ট্রাই করে দ্যাখো না? ওই তিন মাস আমি ভাড়া চার্জ করবো না। কিন্তু তারপর আশি টাকা করে নেবো। আশি টাকা ড্যাম চিপ বলতে পারো। এর মধ্যে বাড়ি ভাড়া, ফার্নিচার ভাড়া, সেনাপতির সার্ভিস এবং আলো-পাখার সব খরচ থাকবে। বাইরে থেকে কল এলে টেলিফোনও ফ্রি। শুধু এখান থেকে ফোন করলে কল পিছু চল্লিশ পয়সা চার্জ। সঙ্গে সঙ্গে পয়সা দিতে হবে না, সেনাপতি খাতায় লিখে নেবে। টেলিফোনে চাবি মারা থাকে—সেনাপতিকে বললেই খুলে দেবে।"

সোমনাথ একটু ভরসা পাচ্ছে। চাকরি পাবার ইচ্ছেটা যদিও পুরোপুরি মন থেকে মুছে যাচ্ছে না, তবু সে ভাবছে ব্যবসা জিনিসটা মন্দ কি?

বিশুবাবু বললেন, "বসে থেকো না ব্রাদার। বসে থাকলেই মরচে পড়ে। বিবেকানন্দ স্বামী বলতেন, মরচে পড়ে পড়ে খতম হওয়ার থেকে ঘষে ঘষে শেষ হয়ে যাওয়া শতগুণে ভালো।"

ঘড়ির দিকে তাকালেন বিশুবাবু। বললেন, "আজ আমার বাজারে একটু কাজ আছে। তুমি যদি কালকে এখানে মুখ দেখাও তাহলে বুঝবো বিজনেসে ইচ্ছে আছে। না হলে যেমন মাঠে দেখা হচ্ছে তেমন হবে।"

কানোরিয়া কোর্ট থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ডালহৌসি স্কোয়ারে এসেছে সোমনাথ। পথের দুধারে অনেক লোককে দেখে সে একটু ভরসা পাচ্ছে। এরা সবাই তো চাকরি করে না, কিন্তু মোটামুটি খেয়ে-পরে বেঁচে আছে। তাহলে সোমনাথের একবার চেষ্টা করে দেখতে আপত্তি কি?

পাঁচ নম্বর বাসে বসেও সোমনাথ ভেবেছে। ওর মনে পড়ে গেলো, কিছুদিন আগে কমলা বউদিকে নিয়ে ট্রেনে চড়ে শ্রীরামপুর গিয়েছিল। ফেরবার পথে ইলেকট্রিক ট্রেনে এক ছোকরা চিৎকার করে ভারি মজার কথা বলেছিল: "আমার নাম নিশীথ রায়। বয়স তেইশ। পড়াশোনা স্কুল ফাইনাল। আমি নিজের চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে নিজে সই করেছি অ্যাজ ম্যানেজিং ডিরেকটর। আমার কর্মচারি হিসেবে আমার মাইনে ঠিক করি। গত মাসে দিয়েছি ছিয়াশি টাকা। নিশীথ রায় যদি খাটতে পারে তাহলে তাকে ঠকাবো না। দেড়শ-দু'শ-আড়াইশ পর্যন্ত মাইনে করে দেবো।" এরপর ছোকরা পকেট থেকে কিছু ফাউনটেনপেন বার করেছিল বিক্রির জন্যে।

বাড়ি ফিরে এসে চুপচাপ ঘরে ঢুকে পড়লো সোমনাথ। কমলা বউদি চা নিয়ে এলেন। বললেন, "বাবা চিন্তা করছিলেন। নিশ্চয় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে বিরাট লাইন পড়েছিল?"

"না, ওখানে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে কাজ শেষ," সোমনাথ বললো।

কমলা বউদি খবরের কাগজ থেকে দুখানা কাটিং দিলেন, "বাবা আজ কেটে রেখেছেন।"

কাটিং দুটো সোমনাথ হাতে নিলো, কিন্তু তাকিয়েও দেখলো না।

বউদি জিজ্ঞেস করলেন, "রোদে ঘুরেছো নাকি? মুখ শুকিয়ে গেছে।" দেওরের জন্যে বউদির যে খুব মায়া হচ্ছে তা যে-কেউ বলে দিতে পারে।

সোমনাথ বউদির মুখের দিকে তাকালো। কিন্তু কোনো উত্তর দিলো না।

বউদি বললেন, "দুপুরে সুকুমার এসেছিল। তোমার জন্যে দুখানা জেনারেল নলেজের কোশ্চেন রেখে গেছে, সঙ্গে চিঠি। বলেছে যেখান থেকে পারো উত্তর যোগাড় করে রাখবে।"

সুকুমারের ইংরেজী চিঠিটা পড়লো সোমনাথ। সুকুমার অত্যন্ত জরুরীভাবে জানতে চেয়েছে, সমুদ্রের জল কেন লোনা? এবং ফরাসী বিপ্লবের সময় কোন্ নেতা স্নানের টবে খুন হয়েছিলেন।

বউদি বললেন, "বেচারা। ওর কী হয়েছে বলো তো? আমাকেও একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলো। বললো, আমাকে উত্তর যোগাড় করে দিতেই হবে।"

বেশ উদ্বিগ্নভাবে সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো, "কী প্রশ্ন?"

কমলা বউদি বললেন, "সুকুমার জিজ্ঞেস করলো, দশরথের চার পুত্র রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নের নাম সবাই জানে, কিন্তু তাঁর মেয়ের নাম কী?"

"আপনাকে এভাবে জ্বালাতন করার মানে?" সোমনাথ একটু চিন্তিত হয়ে উঠলো।

কমলা বউদি বললেন, "উত্তরটা আমার জানা ছিল, মায়ের কাছে শুনেছিলাম, রামচন্দ্রের বোনের নাম শান্তা। সেই শুনে খুব খুশী হলো সুকুমার। বললো, 'আপনাকে আর চিন্তা করতে হবে না। আমি কালই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠিয়ে দেবো'।"

বন্ধ পাগল হয়ে উঠেছে সুকুমারটা। কিন্তু কী করতে পারে সোমনাথ? আপনি পায় না খেতে আবার শংকরাকে ডাকে।

সোমনাথ বললো, "আপনাকে তাহলে খুব জ্বালিয়ে গেছে।"

বউদি চুপ করে রইলেন। কারুর সমালোচনা করা তাঁর স্বভাব নয়।

সোমনাথ বললো, "আমি কিন্তু পাগল হচ্ছি না, বউদি।"

"বালাই-ষাট। তুমি কোন্ দুঃখে পাগল হতে যাবে? মা নিজে বলে গেছেন, তোমার ভাগ্য খুব ভালো।"

"কবে কে একজন কী বলে গেছে, তা আপনি বিশ্বাস করেন বউদি?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো।

"কেন করবো না? মায়ের কোনো কথা তো মিথ্যে হয়নি," বউদি বললেন।

বউদির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো সোমনাথ। তারপর গভীর কৃতজ্ঞতায় বললো, "আমি যদি শরৎ চাটুজ্যে হতাম তাহলে আপনাকে নিয়ে মস্ত একখানা নবেল লিখতাম।"

"থাক্! আগে তবু বউদির জন্যে দু-একটা কবিতা লিখতে—এখন তাও বন্ধ করে দিয়েছো!" বউদি দেওরকে বকুনি লাগালেন। বাবা ডাকছেন। কমলা বউদি এবার ওপরে গেলেন।

এ-বাড়িতে কমলা বউদিই একমাত্র সোমনাথকে অ্যাডমায়ার করতেন। মা তখনো বেঁচে। অঙ্কের খাতায় সোমনাথ একটা কবিতা লিখেছিল। তার জন্যে মায়ের কি বকুনি। "অঙ্কের খাতায় কবিতা লিখে তুমি রবিঠাকুর হবে?"

বউদি কিন্তু ছোট দেওরকে তুচ্ছ করেননি। গোপনে দাদাকে দিয়ে অক্সফোর্ডের দোকান থেকে নরম চামড়ায় মোড়া কালো রংয়ের একটা সুন্দর খাতা কিনে আনিয়েছিলেন। তার প্রথম পাতায় নিজের হাতে লিখেছিলেন 'একজন তরুণ কবিকে—তার বউদি', খাতাটা হাতে দিয়ে সোমনাথকে বউদি অবাক করে দিয়েছিলেন। বউদি বলেছিলেন, "কবিতা আমার খুব

ভালো লাগে, ঠাকুরপো। যত তাড়াতাড়ি পারো ভরিয়ে ফেলবে, তারপর আবার খাতা দেবো।"

সোমনাথের দুঃখ, কমলা বউদি অপাত্রে আস্থা স্থাপন করেছিলেন এবং আজও অপাত্রে নিজের ভালোবাসা অপচয় করে চলেছেন।

ছোটবেলায় সেই খাতাটা সোমনাথ দ্রুত বোঝাই করে ফেলেছিল। অনেকগুলো কবিতা লিখেছিল সোমনাথ। দুপুর বেলায় সবাই যখন শুয়ে পড়তো তখন বউদির সাথে সোমনাথের কাব্য আলোচনা চলতো। সোমনাথ বলতো, "স্কুলে দু-একটা কবিতা শুনিয়েছি বউদি। কিন্তু মাস্টারমশাই বললেন কিস্‌সু হয়নি।" বউদি দমতেন না—"বলুক গে যাক। তোমার কবিতা আমার খুব ভালো লাগে। লিখতে লিখতে তোমার কবিতা নিশ্চয় আরও ভালো হবে। তখন দেশের সবাই তোমার নাম করবে।"

খাতাটা যত্ন করে রাখতে বলেছিলেন বউদি। বউদি কোথায় শুনেছিলেন, কবিদের প্রথম কবিতার খাতা পরে অনেক দামে বিক্রি হয়।

সোমনাথ কিছু বলেনি। কিন্তু খাতার এক কোণে তার অলিখিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গটা লিখে রেখেছিল। যদি কখনও বই ছাপা হয়, তাহলে প্রথমেই লেখা থাকবে—যিনি আমাকে কবি বলে প্রথম স্বীকার করেছেন তাঁকে।

বউদি বলেছিলেন, "এর মানেটা সন্দেহজনক। কারণ মোক্ষদাও হতে পারে। তুমি যখনই মোক্ষদাকে কবিতা শুনিয়েছো সে শুনেছে। ঐতিহাসিকরা প্রমাণ করে দেবে তখন এ-বাড়িতে আমার বিয়ে হয়নি।"

সোমনাথ হেসেছিল। বলেছিল, "ঐতিহাসিকদের কে পাত্তা দিচ্ছে? নিজের জীবন-স্মৃতিতে সমস্ত গোপন কথা ফাঁস করে দেবো, মোক্ষদার স্বীকৃতির পিছনে রীতিমতো লোভ ছিল। দু-আনা পয়সার পান-দোক্তা প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি না পেলে সে কিছুতেই কবিতা শুনতে বসতো না। অথচ বৌদির স্বীকৃতিতে কোনো স্বার্থ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-লক্ষ্মী এবং সোমনাথের কাব্যকমলা।"

বউদি তখনও ছোট্ট মেয়ের মতো সরল ছিলেন। জিনিসটাকে রসিকতা ভেবে পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারেননি। আন্তরিক বিশ্বাস ছিল দেওরটির ওপর। বলেছিলেন, "তুমি বিখ্যাত কবি হলে গ্র্যান্ড হয়। কবি সোমনাথের সঙ্গে আমারও নাম হয়ে যাবে।"

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার সময়েও কবিতা লিখেছে সোমনাথ। কবিতার নেশা না থাকলে সে হয়তো পরীক্ষায় ভালো করতে পারতো। কারণ ইনটেলিজেন্সের কোনো অভাব ছিল না সোমনাথের। কলেজে ঢুকেও অজস্র কবিতা লিখেছে সোমনাথ। বেশ কয়েকটা খাতা কখন যে কবিতায় বোঝাই হয়ে উঠেছে তা সোমনাথ নিজেই বুঝতে পারেনি।

কিন্তু কলেজ থেকে বেরিয়ে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের খাতায় নাম লেখানো মাত্রই কবিতার ধারা অকস্মাৎ শুকিয়ে গেলো। সোমনাথ আর খাতা-কলম নিয়ে বসে না। বউদি কতবার অভিযোগ করেছেন, কিন্তু সোমনাথ লিখতে পারে না। বেকার সোমনাথের জীবন থেকে কাব্যলক্ষ্মী বিদায় নিয়েছেন। যে বেকার এ-সংসারে তার কিছুই মানায় না।

কেন এমন হলো, সোমনাথ ভেবেছে। যেসব মানুষের আত্মপ্রত্যয় থাকে সোমনাথ তাদের দলে নয়। যতটুকু আত্মবিশ্বাস ছিল, হাজারখানেক চাকরির চিঠি লিখে তা উধাও হয়েছে। যে-মানুষের আত্মবিশ্বাস নেই সে কেমন করে কবি হবে?

সোমনাথের এই মানসিক অবস্থার কথা একমাত্র সুকুমার জানতো। সুকুমার বলেছিল, "দাঁড়া না। চাকরি যোগাড় করি আমরা—তখন ম্যাজিকের মতো আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে। তখন তুই কিন্তু কুঁড়েমি করিস না—আমাকে নিয়েও একটা কবিতা লিখিস। বাবা, মা, ভাই, বোন সবাইকে শুনিয়ে দেবো--চড়চড় করে প্রেস্টিজ বেড়ে যাবে!"

বাবার সঙ্গে কথা বলে বউদি আবার ফিরে এলেন। সোমনাথ বললো, "বউদি, আপনার সঙ্গে খুব গোপন কথা আছে।"

বউদি হেসে ফেললেন, "গোপন কথা শুনতে আমার ভয় হয়। যা পেট-আলগা মানুষ, শেষে যদি কাউকে বলে ফেলি?"

সোমনাথ বললো, "আপনাকে ছাড়া আর কাউকে বলবো না, বউদি। আপনিও চুপচাপ থাকবেন।" তারপর বিজনেসের ব্যাপারটা সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে সোমনাথ বললো, "ট্রেনের সেই ছোকরার মতো নিজের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নিজেই সই করে দেখি।"

বউদি বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "বাবাকে বলতে আপত্তি কী।"

সোমনাথ রাজী হলো না। "কি হয় তার ঠিক নেই। আবার হয়তো লোক হাসাবো। আগে নেমে দেখি, ভালো করলে তখন বাবাকে জানাবো।"

বউদি রাজী হয়ে গেলেন। হেসে বললেন, "তোমার দাদার কাছে মিথ্যে কথা বলা মুশকিল। কিন্তু সে-সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে। উনি আরও মাসখানেক বম্বেতে থেকে যাচ্ছেন। কে একজন ছুটিতে যাবেন, তাঁর কাছে ট্রেনিং নিচ্ছেন।"

বউদি বললেন, "বাবার কথাও শুনো কিন্তু। যেখানে অ্যাপ্লিকেশন পাঠাতে বলেন, পাঠিয়ে দিও। আর বাকি সময়টা নতুন লাইনে যথাসাধ্য চেষ্টা কোরো।"

"জানেন বউদি, ব্যবসা জিনিসটা অনেকটা লটারির মতো। অনেকে তাড়াতাড়ি বড়লোক হয়ে যায়।"

প্রবল উৎসাহে বউদি বললেন, "তুমি হঠাৎ বিজনেসে দাঁড়িয়ে গেলে বেশ মজা হবে! বাবা তো বিশ্বাসই করতে চাইবেন না। আমাকেই তখন বকুনি খেতে হবে। বলবেন, বউমা সব জেনে-শুনে আমার কাছে চেপে গেলে কেন?"

ভবিষ্যতের রঙীন কল্পনায় দুজনে একসঙ্গে খুব হাসলো। বউদি জানতে চাইলেন, "বিজনেস করতে গেলে টাকার দরকার হয় না, খোকন?"

এ-ব্যাপারটা এখনও পর্যন্ত খেয়ালই হয়নি সোমনাথের। মাথা চুলকে বললো, "আগে হতো। এখন সম্ভবত দরকার হয় না। শিক্ষিত বেকারদের ধার দেবার জন্যে ব্যাঙ্কগুলো উঁচিয়ে বসে আছে।"

কমলা বউদির বিশ্বাস এতো বেশি যে ওসবের মধ্যে তেমন ঢুকলেন না। শুধু বললেন, "মায়ের টাকাটা তো তোমার এবং আমার জয়েন্ট নামে ব্যাঙ্কে পড়ে আছে। পাশ বইটা দেখবে? তা তিন হাজার টাকা তো হবেই!"

এই টাকার কথা সোমনাথের খেয়ালই ছিল না।

◆

বউদি চলে যাবার একটু পরেই বুলবুল ঘরে ঢুকলো।

যত বয়স বাড়ছে মেজদার বউ তত খুকী হচ্ছে। বাড়িতেও আজকাল ডলপুতুলের মতো সেজেগুজে বসে থাকতে ভালোবাসে। এই দীপান্বিতা ঘোষাল আবার কলেজে ইউনিয়ন ইলেকশনের অন্যতম নায়িকা ছিল! ভোটের জন্যে দীপান্বিতা তখন সোমনাথকেও ধরেছিল। "দেশকে যদি ভালোবাসেন, যদি শোষণ থেকে মুক্তি চান তাহলে আমাদের দলকে ভোট দেবেন," এইসব কী কী যেন তখনকার দীপান্বিতা ঘোষাল তড়বড় করে বলেছিল। বিয়ে করে ঐসব বুলি কোথায় ভেসে গিয়েছে। এখন বর, বরের চাকরি এবং নিজের শাড়ী ব্লাউজ ছাড়া কিছুই বোঝে না ভূতপূর্ব ইউনিয়ন-নেত্রী বুলবুল ঘোষাল।

বুলবুল নিজে পড়াশোনায় ভালো ছিল না। সোমনাথ ও সুকুমার দুজনের থেকেই খারাপ রেজাল্ট করেছিল। কিন্তু বুলবুলের রূপ ছিল—মেয়েদের ওইটাই আসল। মোটামুটি

ভালোভাবে বি-এ পাস করেও সোমনাথ ও সুকুমার জীবনের পরীক্ষায় পাস করতে পারলো না। আর বি-এতে কমপার্টমেন্টাল পেয়েও বুলবুল কেমন জিতে গেলো। কেউ তাকে প্রশ্ন করে না কেন পরীক্ষায় ভালো করোনি? মেয়েদের মলাটই ললাট!

বুলবুলের হাতে একটা ইনল্যান্ড চিঠি। সোমের চিঠি, কোনো মহিলার হস্তাক্ষর। বুলবুল বললো, "এই নাও! লেটার বক্সে পড়েছিল। আমি তো ভুলে খুলেই ফেলেছিলাম!" এই বলে বুলবুল আবার ফিক করে হাসলো।

এই হাসির মাধ্যমে বুলবুল যে একটা মেয়েলী প্রশ্ন করছে, তা সোমনাথ বুঝতে পারে। কিন্তু মেজদার বউকে সে বেশি পাত্তা দিলো না।

খামের ওপর হাতের লেখাটা সোমনাথ আবার দেখলো। তারপর চিঠিটা না-খুলেই বালিশের তলায় রেখে দিলো।

"আমার সামনে এসব চিঠি পড়বে না, আমি যাচ্ছি," একটু অভিমানের সুরে বললো বুলবুল।

বুলবুল চলে যাবার পরেও সোমনাথ একটু অস্বস্তি বোধ করলো। চিঠিটা কারুর হাতে না-পড়লেই খুশী হতো সোমনাথ। খামটার দিকে সে আর-একবার তাকালো। এই চিঠি লেখবার মতো মেয়ে পৃথিবীতে একটি আছে। তার হাতের লেখার সঙ্গে সে পরিচিত। কিন্তু যার চাকরি নেই, ভবিষ্যৎ নেই, যে বাবার এবং দাদাদের গলগ্রহ সে তো এমন চিঠি পাবার যোগ্য নয়। এ ধরনের চিঠি সোমনাথকে মানায় না।

চিঠিটা খুলতে সাহস হচ্ছে না সোমনাথের। এক কাজল চোখের খেয়ালী মেয়ের নিষ্পাপ মুখচ্ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর চোখের এই মেয়ের নাম কে যে রেখেছিল তপতী? ওকে দেখেই ঘরে বাইরে উপন্যাসের বিমলার মায়ের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল সোমনাথের। "আমাদের দেশে তাকেই বলে সুন্দর যার বর্ণ গৌর। কিন্তু যে আকাশ আলো দেয় সে নীল।"

আঙুল দিয়ে খামটা এবার খুলে ফেললো সোমনাথ। তপতী লিখেছে: "একেবারেই ভুলে গেলে নাকি? এমন তো কথা ছিল না। গতকাল ইউ-জি-সি স্কলারশিপের খবরটা এসেছে। এর অর্থ—সরকারী প্রশ্রয়ে ডি-ফিল করার স্বাধীনতা। ভাবলাম, খবরটা তোমারই প্রথম পাওয়া উচিত। কেমন আছো? ইতি তপতী।"

ইতি এবং তপতীর মধ্যে একটা কথা লেখা ছিল। কিন্তু লেখার পরে কোনো কারণে যত্ন করে কাটা হয়েছে। কথাটা কী হতে পারে? সোমনাথ আন্দাজ করার চেষ্টা করলো। চিঠিটা আলোর সামনে ধরে কাটা কথাটা পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করলো সোমনাথ। মনে হচ্ছে লেখা ছিল 'তোমারই'। যদি সোমনাথের আন্দাজ ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে কথাটা তপতী কেন কাটতে গেলো? 'তোমারই তপতী' লিখতে তপতী কী আজকাল দ্বিধা করছে? নিজের চিঠি থেকে যে-কোনো অক্ষর কেটে দেবার অধিকার অবশ্যই তপতীর আছে। কিন্তু তাহলে চিঠি লেখার কী প্রয়োজন ছিল? তার ইউ-জি-সি স্কলারশিপের খবর প্রথম সোমনাথকেই দেওয়ার কথা ওঠে কেন?

এদিকে বাবা নিশ্চয় সোমনাথের জন্য অপেক্ষা করছেন। ভাবছেন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের সমস্ত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা সোমনাথের কাছ থেকে শোনা যাবে। কত লোক লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল? কতক্ষণ সময় লাগলো? অফিসার ডেকে কোনো কথা বললেন কি না? অথবা কেরানিরাই কার্ড রিনিউ করে দিলো।

ও বিষয়ে ছেলের কিন্তু বিরক্তি ধরেছে। এক্সচেঞ্জ অফিসের সামনে সাড়ে-পাঁচ ঘণ্টা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার অপমানকর অভিজ্ঞতা সে ভুলতে চায়। সমবয়সিনী এক বালিকার মিষ্টি চিঠি বুকে নিয়ে সে শুয়ে থাকতে চাইছে। তপতীর সঙ্গে অনেকদিন যোগাযোগ করেনি সোমনাথ। ওর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে হয়েছে অনেকবার। ভবানীপুরের রাখাল মুখার্জি রোড তো বেশি দূর নয়। কিন্তু দ্বিধা ও সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারেনি সোমনাথ।

যাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, তার চিঠিই আজকে তাকে কাছে নিয়ে আসছে। চিঠিটা আরেকবার পড়তে বেশ ভালো লাগলো। অথচ ছোট্ট চিঠি। যা ভালো লাগছে তা এই চিঠির

না-লেখা অংশগুলো—যেমন শূন্যস্থান একমাত্র সোমনাথের পক্ষেই পূরণ করা সম্ভব। যেমন তপতীর চিঠিতে কোনো সম্বোধন নেই। এখানে অনেক কিছুই বসিয়ে নেওয়া যায় : সবিনয় নিবেদন—খোকন—সোমনাথ—সোমনাথবাবু—প্রীতিভাজনেষু—প্রিয়বরেষু...। আরও একটা শব্দ তপতীর মুখে শুনতে ইচ্ছে করে, হাতের লেখায় দেখতে প্রবল লোভ হয়। শব্দটার প্রতিচ্ছবি তপতীর শ্যামলী মুখে সোমনাথ অনেকবার দেখেছে। কিন্তু বড় গম্ভীর এবং কিছুটা চাপা স্বভাবের মেয়ে। কেউ কেউ আছে যা অনুভব করে তার ডবল প্রকাশ করে ফেলে। তপতী যা অনুভব করে তার থেকে অনেক কম জানতে দেয়। তবু কাল্পনিক সেই কথাটা সোমনাথ চিঠির ওপরেই আন্দাজ করে নিলো। তপতীর অনভ্যস্ত বাংলা হাতের লেখায় প্রিয়তমের কথাটা কী রকম আকার নেবে তা কল্পনা করতে সোমনাথের কোনোরকম অসুবিধে হচ্ছে না।

তারপর তপতী লিখেছে : একেবারেই ভুলে গেলে নাকি? তপতীর ছোট্ট নরম গোল গোল হাত দুটো দেখতে পাচ্ছে সোমনাথ। লেখার সময় বাঁ হাত দিয়ে এই চিঠির কাগজটা তপতী নিশ্চয়ই চেপে ধরেছিল। এই হাতে সুন্দর একগাছি সোনার কাঁকন পরে তপতী—অনেকটা বউদির কাঁকনে যে-রকম ডিজাইন আছে।

তপতীর ডান হাতের কড়ে আঙুলের নখটা বেশ বড় আকারের। এই নখটা নিয়ে ছাত্র-জীবনে সোমনাথ একবার রসিকতা করেছিল। "মেয়েরা শখ করে নখ রাখে কেন?" তপতী প্রথমে লজ্জা পেয়েছিল—ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিটি খুঁটিনাটি কেউ অডিট করছে এই বোধটাই ওর অস্বস্তির কারণ। তপতীর সঙ্গে সেদিন বান্ধবী শ্রীময়ী রায় ছিল। ভারি সপ্রতিভ মেয়ে। শ্রীময়ী বলেছিল, "অনেক দুঃখে মেয়েরা আজকাল নখ রাখছে, সোমনাথবাবু। মেয়ে হয়ে ট্রামে-বাসে যদি কলেজে আসতেন তাহলে বুঝতেন। কিছু লোক যা ব্যবহার করে—সভ্য মানুষ না জঙ্গলের জানোয়ার বোঝা যায় না।"

শ্রীময়ীর কথার ভঙ্গীতে তপতী ভীষণ লজ্জা পেয়েছিল। বন্ধুকে থামাবার চেষ্টা করেছিল। "এই চুপ কর। ওদের ওসব বলে লাভ নেই, ওরা কী করবে।"

জন-অরণ্য কথাটা সোমনাথের মনে তখনই এসেছিল। কবিতা লেখার উৎসাহে তখনও ভাঁটা পড়েনি। কলেজের লাইব্রেরীতে বসে সোমনাথ একটা কবিতা লিখে ফেলেছিল। বিশাল এই কলকাতা শহরকে এক শ্বাপদসঙ্কুল গহন অরণ্যের সঙ্গে তুলনা করেছিল সোমনাথ—যেখানে অরণ্যের আইনই ভদ্রতার কোট পরে চালু রয়েছে। কেউ এখানে নিরাপদ নয়। সুতরাং অরণ্যের আদিম পদ্ধতিতেই আত্মরক্ষা করতে হবে। প্রকৃতিও তাই চায়—না হলে সুদেহিনী সুন্দরীর কোমল অঙ্গেও কেন তীক্ষ্ণ নখ গজায়। দন্ত কৌমুদীতেও কেন আদিম যুগের শাণিত ক্ষুরধারের সহ অবস্থান?

কবিতার প্রথম কয়েকটা লাইন এখনও সোমনাথের মনে পড়ছে : "এও এক আদিম অরণ্য শহর কলকাতা/অগণিত জীব পোশাক-আশাকে মানুষের দাবিদার/প্রকৃতি তালিকায় জন্তু মাত্র—।" কবিতার নাম দিয়েছিল : জন-অরণ্য।

কোনো নকল না-রেখেই কবিতাটা খাতার পাতা থেকে ছিঁড়ে তপতীর হাতে দিয়েছিল সোমনাথ। সেই ছেঁড়া পাতাটা তপতী যত্ন করে রেখে দিয়েছিল।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড-হোল্ডার সোমনাথ হাসলো। কলেজের সেই সবুজ দিনগুলোতে তপতী প্রত্যাশা করেছিল সোমনাথ মস্ত কবি হবে। জন-অরণ্য সে মুখস্থ করে ফেলেছিল। কলেজ থেকে বেরিয়ে রাস্তায় বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে তপতী বলেছিল, "একটা কবিতা শুনুন। 'এও এক আদিম অরণ্য শহর কলকাতা...।' ।" সমস্ত কবিতাটা সে আবৃত্তি করে ফেললো। তপতীর মুখে কী সুন্দর শোনাচ্ছিল কবিতাটা।

শ্রীময়ী রায় কাছেই দাঁড়িয়েছিল। তপতীর মুখে কবিতা শুনে সে অবাক হয়ে গেলো। জিজ্ঞেস করলো, "তোর আবার কবিতায় আগ্রহ হলো কবে? আমি তো জানতাম হিস্ট্রি ছাড়া কোনো বিষয়ে তোর হুঁস নেই।"

তপতী লজ্জা পেয়েছিল। শ্রীময়ী জিজ্ঞেস করেছিল, "কবিতাটা কার লেখা?" তপতী

ও সোমনাথ দুজনেই উত্তরটা চেপে গেলো। তপতী বলেছিল, "কবিতা ভালো লাগলে পড়ি। কবির নাম-টাম আমার মনে থাকে না।"

শ্রীময়ী অন্য বাসে রিজেন্ট পার্কে চলে গিয়েছিল। দু নম্বর বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে তপতী বলেছিল, "আপনার কবিতা ভালো হয়েছে—কিন্তু নেগেটিভ। বিরক্ত হয়ে আপনি আঘাত করেছেন, কিন্তু সমাজের মধ্যে আশার কিছু লক্ষ্য করেননি।"

কবি সোমনাথ মনে মনে ধন্য হলেও প্রতিবাদ জানিয়েছিল। লাবণ্যময়ী তপতীর ঝলমলে দেহটার ওপর চোখ বুলিয়ে মৃদু হেসে বলেছিল, "দাঁত, নখ এগুলো তো আঘাতেরই হাতিয়ার।"

ওর স্বরের গাঢ়তা তপতী উপভোগ করেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল, "মেয়েদের আপনি কিছুই বোঝেননি। নখ কি কেবল আঁচড়ে দেবার জন্যে? মেয়েরা নখে তাহলে রং লাগায় কেন?"

উত্তরটা খুব ভালো লেগেছিল সোমনাথের। তপতীর বুদ্ধির দীপ্তি অকস্মাৎ ওর মসৃণ কোমল দেহে ছড়িয়ে পড়েছিল। মুগ্ধ সোমনাথ বলেছিল, "এখন বুঝতে পারছি, লম্বা সরু এবং ধারালো নখ দিয়ে কোনো কবির কলমও হতে পারে!"

এমন কিছু নিবিড় পরিচয় ছিল না দুজনের মধ্যে। ফস করে এই ধরনের কথা বলে ফেলে সোমনাথ একটু বিব্রত হলো। হঠাৎ দু-নম্বর বাস আসছে দেখে তপতী দ্রুত এগিয়ে গিয়ে রাষ্ট্রীয় পরিবহনের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলো—সে বিরক্ত হলো কিনা সোমনাথ বুঝতে পারলো না।

পরের দিন কলেজের প্রথম পিরিয়ডে তপতী সাইড বেঞ্চির প্রথম সারিতে বসেছিল। দূর থেকে ওর গম্ভীর মুখ দেখে সোমনাথের চিন্তা আরও একটু বেড়েছিল—ফলে অধ্যাপকের লেকচার কানেই ঢুকলো না সোমনাথের। প্রায় পনেরো মিনিট নজর রাখার পর দুজনের চোখাচোখি হলো। দৃষ্টিতে বিশেষ কোনো বিরক্তির চিহ্ন ধরা না পড়ায় নিশ্চিন্ত হলো সোমনাথ। তপতীর সর্দি হয়েছে। মাঝে মাঝে রুমাল বার করে নিজেকে সামলাচ্ছে।

দুপুরবেলায় দুজনে আবার দেখা হয়েছিল। ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসে যাবার পথে তপতী দ্রুত ওর হাতে একটা ছোট্ট প্যাকেট গুঁজে দিয়ে উধাও হয়েছিল। বন্ধুদের সতর্ক দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে কলেজের লাইব্রেরিতে গিয়ে প্যাকেট খুলেছিল সোমনাথ। একটা পাইলট পেন—সঙ্গে ছোট্ট চিরকুট। কোনো সম্বোধনই নেই—লেখিকার নামও নেই। শুধু লেখা: "নখকে কলম করা নিতান্তই কবির কল্পনা। কবিতা লিখতে হয় কলম দিয়ে।"

সবুজ রংয়ের সেই কলম আজও সোমনাথের হাতের কাছে রয়েছে। তপতীর সেই প্রত্যাশার সম্মান রাখতে পারেনি সোমনাথ। কবিতা না লিখে, বস্তা বস্তা আবেদনপত্র বোঝাই করে করে কলমকে ভোঁতা করে ফেলেছে সোমনাথ। অসুস্থ কলমটা মাঝে মাঝে বমি করে—হঠাৎ বিনা কারণে ভক্-ভক্ করে কালি বেরিয়ে আসে। সোমনাথ ব্যানার্জির এই পরিণতি হবে জানলে, তপতী নিশ্চয় তাকে কলম উপহার দিতো না। কলম দিয়ে তপতীর চিঠির ওপর হিজিবিজি দাগ কাটতে কাটতে নানা অর্থহীন চিন্তার জালে সোমনাথ জড়িয়ে পড়লো।

সকাল দশটা। হাতে অ্যাটাচি কেস নিয়ে নতুন জীবন আরম্ভ করতে বেশ লাগছে সোমনাথের। অ্যাটাচি কেসটা কমলা বউদি জোর করে হাতে ধরিয়ে দিলেন—বড়দার নাকি একাধিক আছে, কোনো কাজে লাগছে না।

এবারেও ওর পকেটে ফুল গুঁজে দিলেন কমলা বউদি। আশীর্বাদ করে বললেন, "তুমি মানুষ হবে—আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

সোমনাথ মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করলো, মানুষ হওয়া কাকে বলে? তারপর ওর মনে হলো, নিজের অন্ন নিজে জুটিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা মানুষ হবার প্রাথমিক পদক্ষেপ।

সোমনাথ বুঝতে পারছে, বেশ দেরি হয়ে গিয়েছে। এখনও নিজের পায়ে না দাঁড়ালে আর মনুষ্যত্ব থাকবে না।

কানোরিয়া কোর্টের বাহাত্তর নম্বর ঘরে বিশুবাবু বসেছিলেন। সোমনাথকে দেখেই উৎফুল্ল বিশুবাবু বললেন, "এসো এসো।"

সোমনাথ তখনও বুঝতে পারছিল না, হৃদয়হীন উদাসী সময় তাকে কোন্ পথে নিয়ে চলেছে।

এসব চিন্তা তার মাথায় হয়তো আজ আসতো না, যদি-না বাস স্ট্যান্ডের কাছে সুকুমারের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতো। সোমনাথের ফর্সা জামাকাপড় দেখে সুকুমার বললো, "বেশ বাবা! লুকিয়ে লুকিয়ে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছিস।"

সুকুমারের রুক্ষ চাহনি ও খোঁচাখোঁচা দাড়ি দেখে কষ্ট হচ্ছিল সোমনাথের। সুকুমার বললো, "মিনিট দশেক দাঁড়া—জামাকাপড় পাল্টে আমিও তোর সঙ্গে ইন্টারভিউ দিয়ে আসবো।"

সোমনাথকে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুকুমার কাতরভাবে বললো, "আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি লাট সাহেব, চীফ মিনিস্টার, টাটা, বিড়লা কেউ আমার সঙ্গে জেনারেল নলেজে পেরে উঠবে না।"

সোমনাথ ওর হাত দুটো ধরে বললো, "বিশ্বাস কর, আমি ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি না।"

"তুইও আমাকে মিথ্যে কথা বলছিস?" হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো সুকুমার। তারপর অকস্মাৎ কান্নায় ভেঙে পড়লো সে। বললো, "আমার যে একটা চাকরি না হলে চলছে না, ভাই।"

সোমনাথের গম্ভীর মুখ দেখে বিশুবাবু ভুল বুঝলেন। বললেন, "কী ব্রাদার। অফিসার না হয়ে বিজনেসম্যানদের খাতায় নাম লেখাতে হলো বলে মন খারাপ নাকি?"

সোমনাথ বললো, "চাকরি যখন আমাকে চাইছে না, তখন আমি চাকরিকে চাইতে যাবো কেন?"

বিশুবাবু বললেন, "পাকিস্তানে সব খুইয়ে যখন এসেছিলুম তখন আমার অবস্থা শোচনীয়। মুরগীহাটায় মুটেগিরি করেছিলুম ক'দিন। তারপর চড়া সুদে দশ টাকা ধার করে একঝুড়ি কমলালেবু কিনতে গেলাম। আনাড়ী লোক, ফলের বাক্সর ওপর লাল-নীল সাঙ্কেতিক দাগ থেকে কী বুঝবো? আমার অবস্থা দেখে চিৎপুর পাইকারী বাজারে এক বুড়ো মুসলমানের দয়া হলো। দেখে-শুনে কমলালেবুর একটা বাক্স ভদ্রলোক কিনিয়ে দিলেন। প্রথম দিন বেশ মাল বেরুলো। পাঁচ ঘণ্টা রাস্তায় বসে দু টাকা নেট লাভ করে ফেললুম—মনের আনন্দে নিজের অজান্তে দুটো লেবুও খেয়ে ফেলেছি। চড়া সুদ-কোম্পানির

গোঁফওয়ালা ষণ্ডামার্কা যে লোকটা সন্ধ্যেবেলায় পাওনা টাকা আদায় করতে আসতো, সে তো অবাক। ভেবেছিল আমি টাকা শোধ করতে পারবো না। দশ টাকা দশ আনা তাকে ফেলে দিলুম। রইলো এক টাকা ছ' আনা।"

নিজের গল্প বন্ধ করলেন বিশুবাবু। বললেন, "থাক ওসব কথা। এখন তোমার হাতে-খড়ির ব্যবস্থা করি। মল্লিকবাবুকে ডেকে পাঠাই।"

সেনাপতি ছুটলো মল্লিকবাবুকে ডাকতে। একটু পরেই চোখে একটা হ্যান্ডেল-ভাঙা চশমা লাগিয়ে হাজির হলেন বুড়ো মল্লিকবাবু। পরনে ফতুয়া, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। ভদ্রলোক এ-পাড়ার ছাপাখানা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করেন।

বিশুবাবু বললেন, "মল্লিকমশাই, সোমনাথের লেটার হেড এবং ভিজিটিং কার্ডের ব্যবস্থা করে দিন। আমার ঘরের নাম্বার এবং টেলিফোন দিয়ে দেবেন।"

"নাম কী হবে?" মল্লিকবাবু ঝিমোতে ঝিমোতে জিজ্ঞেস করলেন।

"সত্যি তো, নাম একটা চাই," বিশুবাবু বললেন। "কিছু প্রিয় নাম-টাম আছে নাকি?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

প্রিয় নাম একটা আছে—কমলা। কিন্তু এই জীবনের জটের সঙ্গে তাঁকে শুধু শুধু জড়িয়ে ফেলে কী লাভ? তার থেকে বরং দায়িত্বটা পুরোপুরি নিজের ওপরেই থাক—কোম্পানির নাম দেওয়া যাক : সোমনাথ উদ্যোগ।

নাম শুনেই বিশুবাবু বললেন, "ফার্স্ট ক্লাস। এই উদ্যোগ কথাটা মাড়ওয়ারীরা খুব ব্যবহার করছে। আর তোমার নিজের নামখানিও খাসা। কার সাধ্য ধরে বাঙালীর কারবার? প্রয়োজন হলে গুজরাতী কনসার্ন বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে। সোমনাথ নামটা গুজরাতীদের খুব প্রিয়—ওদের সেন্টিমেন্টেও লাগে। সোমনাথ মন্দিরটা কতবার যে বিদেশীরা এসে ঝেড়েঝুড়ে সাবাড় করে দিলো।"

মল্লিকবাবু চলে যেতেই বিশুবাবু বললেন, "এই যে পাড়া দেখছো, এখানে লাখ-লাখ কোটি-কোটি টাকা উড়ে বেড়াচ্ছে। যে ধরতে জানে সে হাওয়া থেকেই টাকা করছে। এসব গল্প কথা নয়—দু-দশটা লাখপতি এই কলকাতা শহরে এখনও প্রতিমাসে তৈরি হচ্ছে। আমি বাপু তোমাকে জলে ছেড়ে দিলুম, কিন্তু সাঁতার নিজে থেকেই শিখতে হবে। ঝিনুকে করে এই লাইনে দুধ খাওয়া শেখানো হয় না।"

বিশুবাবু কথা বলতে বলতেই ঘরের মধ্যে কম বয়সী এক ছেকারা ঢুকলো। বয়স সতেরো-আঠারোর বেশি নয়। বিশুবাবু বললেন, "অশোক আগরওয়ালা। ওর বাবা শ্রীকিষণজী আমার ফ্রেন্ড। রাজস্থান ক্লাবের অন্ধ ভক্ত। তবে শীল্ডে রাজস্থান হেরে যাবার পর ইস্টবেঙ্গলকে সাপোর্ট করে।"

অশোককে ডাকলেন বিশুবাবু। "অশোক কেমন আছো? পিতাজীর তবিয়ত কেমন?"

পিতাজী যে ভালো আছেন, অশোক বিনীতভাবে বিশুবাবুকে জানালো। বিশুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "অশোক তুমি কার সাপোর্টার?"

অশোক নির্দ্বিধায় বললো, "রাজস্থান অ্যান্ড ইস্টবেঙ্গল।"

"রাজস্থান তো বুঝলাম। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল কেন, আমার ফ্রেন্ড মিস্টার সোমনাথকে একটু বুঝিয়ে বলো তো।"

অশোকের উত্তরে জানা গেলো, ইস্টবেঙ্গল তার বাবার জন্মস্থান। নারায়ণগঞ্জে তাদের পাটের কারবার ছিল। তাই ওরা ভালো বাংলা জানে। শ্রীকিষণজী তো বাংলা নবেলও পড়েন।

ওদের দুজনের আলাপ হয়ে গেলো। অশোক ছেলেটি বেশ ভালো। বিশুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আজ কিছু জালে পড়লো?"

অশোক বললো, "বাজার খারাপ, কিছুই হচ্ছিল না। শেষপর্যন্ত চল্লিশখানা ফ্ল্যাট ফাইলের অর্ডার ধরেছি। মাত্র চার টাকা থাকবে।"

অশোকের হাতে একটা বড় কাগজের প্যাকেট। অশোক বললো, "ট্যাক্সি চড়তে গেলে কিছুই থাকবে না। তাই বাসের ভিড় কম থাকতে থাকতে ডেলিভারি দিয়ে আসবো ভাবছি।"

ফাইলের তাড়া নিয়ে অশোক বেরিয়ে গেলো। বিশুবাবু বললেন, "ওর বাবা টাকার পাহাড়ে বসে আছেন। দু-তিনটে বড় বড় কোম্পানির মালিক। তিন-চারশ' লোক ওঁর আন্ডারে কাজ করে। আবার একটা কেমিক্যাল ফ্যাকর্টরি বানাচ্ছেন। অশোক মর্নিং ক্লাসে বি-কম পড়ে। বাবা কিন্তু ছেলেকে দুপুরবেলায় ধান্দায় লাগিয়ে দিয়েছেন।"

সোমনাথ শুনলো অশোকের জন্যে নিজের কোম্পানিতে স্থান করেননি শ্রীকিষণ আগরওয়ালা। ছেলের হাতে আড়াইশ' টাকা দিয়ে চরে খেতে পাঠিয়েছেন। শ্রীকিষণজী চান ছেলে নিজের খুশী মতো বিজনেস করুক। বিশুবাবুর অফিসে বসে অশোক। আর বাজারে একলা ঘুরে ঘুরে ঠিক করে কোন্ বিজনেস করবে।

"বাঙালী বড়লোকেরা এসব ভাবতে পারে?" বিশুবাবু দুঃখ প্রকাশ করলেন। "তাঁদের ছেলেদের গায়ে একটু রোদ লাগলে ননী গলে যাবে।"

অশোকের উৎসাহ আছে। নিজের কলেজেই বিজনেসের সুযোগ নিয়েছে। ওখানেই ফাইলগুলো সাপ্লাই করবে।

বিশুবাবু বললেন, "বিজনেসের অনেক জিনিস গোপন রাখতে হয়। সুতরাং তোমাকে আমি রোজ পাখি-পড়া করাবো না। নিজের ময়লা নিজে সাফ করবে, নিজের গোলমাল নিজে মেটাবে। আমি জিজ্ঞেস করতেও আসবো না।"

বিশুবাবুর নিজের কিন্তু তেমন ব্যবসায় মন নেই। কোনোরকমে চালিয়ে নেন। সেনাপতি বলে, "সায়েবের আর কী? বিয়ে-থা করেননি। সংসারের টান বলতে মা ছিলেন। দু-বছর হলো মা দেহ রেখেছেন। এখন দুর্বলতা বলতে ওই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবটুকু। ইস্টবেঙ্গলের খেলা থাকলে মাঠে যাবেনই। তাতে বিজনেস থাকুক আর যাক।"

বিশুবাবুর আর একটা দোষ আছে। সন্ধেবেলা একটু ড্রিঙ্ক করেন বিশুবাবু। ওঁর ভাষায়, "রাত্রে একটু আহ্নিকে বসতে হয় ব্রাদার। ব্যাড্ হ্যাবিট হয়ে গিয়েছে। ঐ এলফিনস্টোন বার-এ গিয়ে বসি। ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে দুটো প্রাণের কথা হয়। ওখান থেকেও মাঝে মাঝে দু-চারটে বায়না এসে যায়। গত সপ্তাহে এলফিনস্টোন বার-এ শুনলাম এক ভদ্রলোক একখানা লরি বেচবেন। শ্রীকিষণজীর একখানা লরি কিছুদিন আগে ধানবাদের কাছে অ্যাক্সিডেন্টে নষ্ট হয়ে গিয়েছে শুনেছিলাম। এলফিনস্টোন বার থেকে পোদ্দার কোর্টে শ্রীকিষণজীকে ফোন করলুম। তারপর গডেস কালীর নাম করে দুই পার্টিকে ছাঁদনাতলায় হাজির করিয়ে দিলুম। পকেটে পাঁচশ' টাকা এসে গেলো উইদাউট এনি ইনভেস্টমেন্ট। এর নাম ভগবানের বোনাস। হঠাৎ হয়তো বিশ্বনাথ বোসের কথা মনে পড়ে গেলো ভগবানের—ভাবলেন, হতভাগার জন্যে অনেকদিন কিছু করা হয়নি।"

বিশুবাবু এরপর সোমনাথকে নিয়ে বাজারে বেরিয়েছিলেন। ভিড় ঠেলে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বিশুবাবু বলছিলেন, "দুনিয়াতে যত ব্যবসা আছে তার মধ্যে এই অর্ডার সাপ্লায়ের ব্যবসাটা সবচেয়ে সহজ। সুখেরও বলতে পারো—অবশ্য যদি চলে।"

ব্যাপারটা কি জানতে চাইলো সোমনাথ। বিশুবাবু বললেন, "অপরের শিল অপরের নোড়া, তুমি শুধু কারুর দাঁতের গোড়া ভেঙ্গে টু-পাইস করে নিলে।"

এরপর বিশুবাবু ব্যাখ্যা করলেন, "অপরের ঘরে মাল রয়েছে। তুমি খোঁজখবর করে দাম জেনে নিলে। তারপর যদি একটা খদ্দের খুঁজে বার করতে পারো যে একটু বেশি দামে নিতে রাজী আছে—তা হলেই কম্ম ফতে।"

"তাহলে দাঁড়ালো কী?" বিশুবাবু প্রশ্ন করলেন। "বাজারে কোন্ জিনিস কত সস্তায় কার ঘরে পাওয়া যায় জানতে হবে। তারপর সেই মাল কাকে গছানো যায় খবর করতে হবে। ব্যস—আমার কথাটি ফুরলো, নোটের তাড়াটি পকেটে এলো!"

এই নতুন জগতে সোমনাথ এখনও বিশেষ ভরসা পাচ্ছে না। কোনো অজানা জগতে বেপরোয়াভাবে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের মনস্কামনা সিদ্ধি করবার মতো মানসিকতা সোমনাথের নেই। থাকবেই বা কী করে? বড় নিরীহ প্রকৃতির মানুষ সে। কলকাতার লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের মতোই সে মানুষ হয়েছে—জন-অরণ্যে নিরীহ মেষশাবক ছাড়া আর কিছুর সঙ্গেই এদের তুলনা করা চলে না।

বিশুবাবু এসব নিয়ে মাথা ঘামান না। আপন মনে তিনি বললেন, "বিজনেসের ডেফিনিশন দিতে গিয়ে যে-ভদ্রলোক বলেছিলেন—ব্যবসা মানে সস্তায় কেনা এবং বেশি দামে বেচা, তাঁকে অনেকে সমালোচনা করে। কিন্তু সার সত্যটি এর মধ্যেই আছে।"

কয়েকটা লোক দেখিয়ে বিশুবাবু বললেন, "এই বাজারের হাজার হাজার লোক অর্ডার সাপ্লায়ের ওপর বেঁচে আছে। অফিসের আলপিন থেকে আরম্ভ করে চিড়িয়াখানার হাতি পর্যন্ত যা বলবে সব সাপ্লাই করবে এরা। তবে মার্জিন চাই।"

হাতির কথা শুনে বোধহয় সোমনাথের মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল। বিশুবাবু বললেন, "হাসছো? বিশ্বাস হচ্ছে না? চলো শ্যামনাথবাবুর কাছে।"

একটা ছোট্ট আপিসে মুখ শুকনো করে বসে আছেন শ্যামনাথ কেদিয়া। মোটা-সোটা মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। একটু তোতলা। বিশুবাবুকে দেখে কেদিয়াজী মৃদু হাসলেন। বললেন, "কী বোসবাবু, কুছ এনকোয়ারি পেলেন?"

বিশুবাবু বললেন, "না কেদিয়াজী, দুটো-তিনটে সার্কাস কোম্পানির খবরাখবর করলাম—কিন্তু হাতির বাজার খুব নরম। সামনে বর্ষা, কেউ এখন স্টকে হাতি তুলতে চাইছে না।"

কেদিয়াজী ঠোঁট উল্টে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, "এখোন লিচ্ছে না—পরে আফসোস করবে। একই হাতি তিন হাজার রুপীয়া জাদা দিয়ে লিতে হোবে।"

বিশুবাবু বললেন, "সার্কাস কোম্পানি তো—মাথায় অত বুদ্ধি নেই। আপনি বরং হাতিটাকে শোনপুরের মেলায় পাঠিয়ে দিন। ওখানে এক গ্রোস হাতি বিক্রি করতেও অসুবিধা হবে না।"

"সোব জায়গায় গন্ডগোল। হাতির ওয়াগন মিলতেই বহুত টাইম লেগে যাচ্ছে," দুঃখ করলেন কেদিয়াজী।

"আপনি তাহলে এক্সপোর্টের চেষ্টা করুন। পৃথিবীর অন্য জায়গায় হাতির খুব কদর।" বিশুবাবু মতলব দিলেন।

কেদিয়াজী সে-খোঁজও নিয়েছিলেন। ওয়েলিংটন বলে এক সাহেব মাঝে মাঝে জন্তু-জানোয়ার কিনতে কলকাতায় আসেন। তিনি এলেই কেদিয়াজী সাডার স্ট্রীটে ফেয়ারল্যান্ড হোটেলে লোক পাঠাবেন। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের আগে ওয়েলিংটন সায়েবের কলকাতায় আসবার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া 'ফরেন' মার্কেটে কেবল বেবি হাতির কদর। এরোপ্লেনে পাঠাতে খরচ কম। পকেট থেকে প্লেন ভাড়া দিয়ে কয়েক টন ওজনের ধাড়ি হাতি বিদেশে পাঠাতে হলে ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাবে।

বিশুবাবু এবার সোমনাথের পরিচয় দিয়ে কেদিয়াজীকে বললেন, "ইয়ং মিস্টার ব্যানার্জি হাই সোসাইটিতে ঘোরেন। ওঁর আত্মীয়স্বজন সব বড় বড় কোম্পানির বড় বড় পোস্টে রয়েছেন।"

কেদিয়াজী এবার বিশুবাবুকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে কি সব আলোচনা করলেন। তারপর ফিরে এসে কেদিয়াজী ফিক-ফিক করে হাসতে লাগলেন। সোমনাথকে বললেন, "আচ্ছা কোনো কোম্পানিকে আপনি হাতিটা সেল করুন। আচ্ছা কমিশন মিলবে।"

"বড় বড় কোম্পানি কেন হাতি কিনতে যাবে?" বিজনেসে অনভ্যস্ত সোমনাথ খোলাখুলি সন্দেহ প্রকাশ করলো।

এ-লাইনে কোনো সেলসম্যান এইভাবে প্রশ্ন করে না। কিন্তু কেদিয়াজী বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। বললেন, "জানা-শোনা থাকলে ফোরেন কোম্পানির বড় সায়েবরা সোব চিজ লিয়ে লিবে।"

কেদিয়াজীর ওখান থেকে বেরিয়ে বিশুবাবু বললেন, "অতি লোভে কেদিয়া ডুবতে বসেছেন। ইলেকট্রিক্যাল গুডসের দালালি করে হাজার পঁচিশেক কামিয়েছিলেন লাস্ট ইয়ারে। এ-বছরের গোড়ার দিকে এক হিন্দী সিনেমা কোম্পানির খপ্পরে পড়েছিলেন। ওরা একটা হাতি কিনে শুটিং করছিল। শুটিং-এর শেষে ফিল্ম কোম্পানি বোম্বাইতে হাতি ফিরিয়ে নিয়ে গেলো না। জলের দামে হাতি পাচ্ছেন ভেবে কেদিয়া কিনে ফেললেন। তখন

এক সার্কাস কোম্পানির দালালের সঙ্গে কেদিয়াজীর যোগাযোগ ছিল, সে লোভ দেখিয়েছিল মোটা দামে হাতি বেচে দেবে।”

যা জানা গেলো সেই দালালই কেদিয়াজীকে ডুবিয়েছে। হাতির বাজারে উন্নতির জন্যে কেদিয়াজী মাস কয়েক অপেক্ষা করতে তৈরি ছিলেন। কিন্তু হাতির খোরাক যোগাতে প্রতিদিন যে পঞ্চাশ-ষাট টাকা খরচ করতে হবে, এই হিসেবটা তিনি ধরেননি।

“খোঁজখবর না নিয়ে হাতির ব্যবসায়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে এই হয়,” বিশুদা বললেন। “এখন হাতির খরচ এবং একটা মাহুতের মাইনে গোনো! তার ওপর পুলিশের হাঙ্গামা। হাতির জন্যে যে লাইসেন্স করতে হয় তাও জানতেন না কেদিয়াজী।” হাতি বাজেয়াপ্ত হতে বসেছিল। জানা-শোনা এক পুলিশের সাহায্যে বিশুদা ক’দিন বহু চেষ্টা করে ম্যানেজ করে দিয়েছেন। কিন্তু এবার হাতি সরাতেই হবে। তাই জলের দামে হাতি বেচে দিতে চাইছেন কেদিয়াজী।

বিশুদা নিজেও মুচকি হাসলেন। তারপর বললেন, “আমরা হাসছি—কিন্তু সিরিয়াসলি কাজ করলে এর থেকেও হাজার খানেক টাকা রোজগার করতে পারো। বলা যায় না, বড় কোনো কোম্পানির পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট প্রচারের জন্যে হাতি লিজ নিতে পারে। তারপর পুজো নাগাদ শিক্ষিত হাতির দাম বেশ উঠে যাবে। সার্কাস কোম্পানিদের তখন ঘুম ভাঙবে।”

সমস্ত ব্যাপারটা রসিকতা মনে হয়েছিল তখন। কিন্তু পরের দিন বিকেলেই সোমনাথ শুনলো কেদিয়াজীর হাতি বিক্রি হয়ে গিয়েছে। কোনো এক দালাল দশ পারসেন্ট কমিশনে হাতি হাওয়া করে দিয়েছে। কেদিয়াজী অবশ্য প্রতিজ্ঞা করেছেন যে-লাইনে অভিজ্ঞতা নেই সে ব্যবসায় তিনি আর হাত বাড়াবেন না।

* * *

মল্লিকবাবু ছাপানো প্যাডগুলো দিয়ে গেলেন। কিন্তু যাবার সময় বললেন, “একখানা মাত্র কোম্পানি করবেন?”

মল্লিকবাবু ভেবেছেন কী? সোমনাথ কি মস্ত ব্যবসায়ী? “একটা কোম্পানি সামলাতে পারি কিনা দেখি।” সোমনাথ সলজ্জভাবে মল্লিকবাবুকে বললো।

অনভিজ্ঞ সোমনাথের কথা শুনে হেসে ফেললেন মল্লিকবাবু। চশমার মোটা কাঁচের ভিতর দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, “ফরটি ইয়ারস এ লাইনে হয়ে গেলো—একটা কোম্পানি করলে বিজনেসে টেঁকা যায় না।”

“মানে?” একটু অবাক হয়েই সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো।

“আপনি বাঙালীর ছেলে, তাই বলছি। অন্তত তিনখানা কোম্পানি চাই। না হলে কোটেশন দেবেন কী করে? পারচেজ অফিসারকে পোষ মানাবেন আপনি—কিন্তু তিনি তো নিজের গা বাঁচিয়ে চলবেন। পোষ মানাবার পরে পারচেজ অফিসার নিজেই আপনাকে বলবে, তিনটে কোম্পানির নামে কোটেশন নিয়ে আসুন। দুটো কোটেশনে বেশি দাম লেখা থাকবে—আর আপনারটায় দাম কম লেখা থাকবে।”

অর্ডার সাপ্লাই লাইনের গোড়ার কথাটাই যে সোমনাথ এখনও জানে না তা আবিষ্কার করে বৃদ্ধ মল্লিকবাবু বেশ কৌতুক বোধ করলেন।

"শুধু আলাদা কোম্পানি হলে তো চলবে না। ঠিকানাও তো আলাদা চাই?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো।

"সে তো একশোবার," মল্লিকবাবু একমত হলেন। "সাপ ব্যাঙ দুটো ঠিকানা লাগিয়ে দিলেই হলো। কলকাতায় ঠিকানার অভাব? অনেকে তো আমার ছাপাখানার ঠিকানা লাগিয়ে দিতে বলে।" বিজ্ঞের মতো মল্লিকবাবু বললেন, "আপনি তিনখানার কথা ভাবছেন! আর আপনার পাশের শ্রীধরজীর এগারোখানা কোম্পানি। এগারো রকমের চালান, এগারো রকমের বিল, এগারো রকমের রসিদ, এগারো রকমের চিঠির কাগজ। আমার দুটো পয়সা হয়।"

সোমনাথের মুখের অবস্থা দেখে মল্লিকবাবু বললেন, "টাকাকড়ির টানাটানি থাকলে এখন একটা কোম্পানিই করুন। তেমন আটকে গেলে আমার কাছে আসবেন, দু-চারখানা পুরানো কোম্পানির লেটারহেড এমনি দিয়ে দেবো। কত কোম্পানি হচ্ছে, কত কোম্পানি আবার ডকে উঠছে—আমার কাছে অনেক চিঠির কাগজের স্যাম্পেল থেকে যাচ্ছে।"

মল্লিকবাবু যে শ্রীধরজীর কথা বললেন তিনি ফিনফিনে পাঞ্জাবি, ফর্সা ধুতি এবং চপ্পল পরে সকালের দিকে মিনিট পনোরোর জন্যে অফিসে আসেন। চিঠিপত্তর কিছু এসেছে কিনা খোঁজখবর করেন। তারপর গোটাচারেক পান একসঙ্গে গালে পুরে বাজারে বেরিয়ে যান।

শ্রীধরবাবুর এক পার্টটাইম খাতা রাখার বাবু আছেন। তিনি দু-তিনবার অফিসে ঘুরে যান। এঁর নাম আদকবাবু। রোগা পাকানো চেহারা। বহু লোকের হিসেব রেখে বেড়ান। সোমনাথ শুনলো, এ-লাইনে আদকবাবুর খুব নামডাক—বিশেষ করে সেল্‌স ট্যাক্স সমস্যা নাকি গুলে খেয়েছেন। লোকে বলে সেল্‌স ট্যাক্সের বিধান রায়! যত মর-মর কেসই হোক, আদকবাবু ঠিক পার্টিকে বাঁচিয়ে দেবেন।

আদকবাবু একদিন সোমনাথকে বললেন, "আপনি চালিয়ে যান। বেচাকেনা করে পয়সা আনুন—তারপর তো খাতা তৈরির জন্যে আমি আছি।"

সোমনাথ চুপচাপ ওঁর কথা শুনে যাচ্ছিল। কোথায় বিজনেস তার ঠিক নেই, এখন থেকে সেল্‌স ট্যাক্স ইনকাম ট্যাক্সের চিন্তা! আদকবাবু বোধহয় একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। সোমনাথকে বললেন, "বিজনেসে যখন নেমেছেন তখন এই খাতা জিনিসটাকে ছোট ভাববেন না, স্যর। আপনার ওই টেবিলেই তো মোহনলাল নোপানি বসতো। বিজনেসের কূটবুদ্ধি তো খুব ছিল। বম্বে থেকে প্লাস্টিক পাউডার আনিয়ে তার সঙ্গে ভেজাল মিশিয়ে বেশ টু-পাইস করছিল। কিন্তু হঠাৎ ঘটিবাটি ফেলে নোপানিকে উধাও হতে হলো কেন?"

উত্তরটা আদকবাবু নিজেই দিলেন। "খাতা ঠিক মতো রাখেনি। ভেবেছিল ওটাও নিজে ম্যানেজ করবে। এখন ইনকাম ট্যাক্স ও সেল্‌স ট্যাক্সের—শনি রাহু দুজনেই একসঙ্গে ছোকরার ওপর নজর দিয়েছেন!"

নোপানির কথাই তো বিশুবাবু বলেছিলেন, সোমনাথের মনে পড়লো। "মিস্টার বোস তো সেনাপতিকে ভদ্রলোকের বাড়িতেও পাঠিয়েছিলেন। নোপানি সেখানে নেই। কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছেন।" সোমনাথ বললো।

পানের ছোপধরা দাঁতের পাটি বার করে আদকবাবু হাসলেন। ফিসফিস করে বললেন, "বাড়ি না ছেড়ে উপায় আছে? সাতাশ হাজার টাকার প্রেমপত্তর নিয়ে সেল্‌স ট্যাক্স ঘোরাঘুরি করছেন। প্রেমপত্তর বোঝেন তো?" আদকবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

না বুঝে উপায় আছে? তপতীর চিঠিখানা গতকালই তো পাঁচবার পড়েছে সোমনাথ। কপাল কুঞ্চিত করে আদকবাবু বললেন, "আমাদের লাইনে প্রেমপত্তর মানে সার্টিফিকেট। ট্যাক্সো ঠিক সময় না দিলে আলিপুরের সার্টিফিকেট অফিসার ঘটিবাটি বাজেয়াপ্ত করার জন্যে এই সার্টিফিকেট ইস্যু করে। সার্টিফিকেট অফিসের বেলিফ রসময় হাজরাকে তো দেখেননি—সাক্ষাৎ চেঙ্গিজ খাঁ! টাকা না দিলে ভাতের হাঁড়ি পর্যন্ত ঠেলাগাড়িতে চাড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে। কোনো মায়াদয়া করে না।"

কোনোরকম রোজগার না করেই সার্টিফিকেট অফিসের পেয়াদা রসময় হাজরার

কাল্পনিক কালাপাহাড়ী মূর্তি সোমনাথকে একটু বিমর্ষ করে তুললো। এতোদিন সার্টিফিকেট বলতে বেচারা পরীক্ষার সার্টিফিকেট এবং ক্যারেকটার সার্টিফিকেট বুঝতো। আলিপুরের সার্টিফিকেট অফিসারের নাম সে কোনোদিন শোনেইনি। আদকবাবু ফিসফিস করে খবর দিলেন, "আপনি ভাবছেন, নোপানি চম্পট দিয়েছে কলকাতা থেকে? একেবারে বাজে কথা। এই কলকাতাতেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে এখন যদি নোপানি বলে ডাকেন চিনতেই পারবে না। নাম নিয়েছে, প্রেমনিধি গুপ্ত!"

খাতা লেখা বন্ধ রেখে আদকবাবু বললেন, "আপনাকে সত্যকথা বলছি, এখন লুকিয়ে লুকিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করছে, আমার হাতে ধরছে। বলছে, 'আদকবাবু, বাঁচান।' রোগী মরে যাবার পর খবর দিলে ডাক্তার কী করবে বলুন?"

আদকবাবু ওঁর চশমার ফাঁক দিয়ে সোমনাথের দিকে তাকালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "কী বুঝলেন?"

"বুঝলুম নোপানি ফ্যাসাদে পড়েছে।"

সোমনাথের উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন না আদকবাবু। বললেন, "নোপানি হচ্ছে জাত ব্যবসাদার—ওর বিপদ ও ঠিকই সামলাবে। আপনি কী বুঝলেন? আপনাকে দেখে শিখতে হবে—ঠেকে শিখতে গেলে এ লাইনে স্রেফ গাড়ী চাপা পড়ে যাবেন। শিক্ষাটা হলো এই যে শুধু রোজগারের চেষ্টা করলে হবে না—সেই সঙ্গে হিসেবের খাতাখানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে যেতে হবে।"

বুড়ো আদকবাবুর যে সোমনাথের ওপর মায়া পড়েছে তা সেনাপতি দরজার কাছে বসে থেকেই বুঝতে পারছে। আদকবাবু ফিসফিস করে বললেন, "যে-লাইনে এসেছেন—টু-পাইস আছে। অনেকে এখন রাতারাতি লাল হচ্ছে। এই যে শ্রীধরজী—কেমিক্যাল বেচে বেশ কামাচ্ছেন! কিন্তু এগারোখানা কোম্পানি—এর টুপি ওর মাথায় এমন কায়দায় পরিয়ে যাচ্ছেন যে আপনার মনে হবে রামকৃষ্ণ মিশনের অ্যাকাউন্ট। সেল্‌স ট্যাক্স অফিসার নাক দিয়ে শুঁকলে ধুপধুনোর গন্ধ পাবে!"

এ-লাইনের প্রথম বউনি আদকবাবুর অনুগ্রহেই হলো। জয়সোয়ালদের স্টেশনারি দোকানের খাতা উনি রাখেন। ওখানকার ব্রিজবাবুর সঙ্গে সোমনাথের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন আদকবাবু। বলেছিলেন, "বসে থাকবেন কেন? চেষ্টা করুন।"

ব্রিজবাবু খুব বেশি ভরসা করেননি ছোকরা সোমনাথের ওপর। তবে বলেছিলেন, "ডুপ্লিকেটিং কাগজ এবং খামের স্টক রয়েছে। দেখুন যদি সেল করতে পারেন। আদকবাবু যখন এর মধ্যে রয়েছেন তখন আপনাকে অবিশ্বাস করবো না।"

রাস্তায় বেরিয়ে সোমনাথ একশ' রিম ডুপ্লিকেটিং কাগজ এবং লাখখানেক খাম বারবার চোখের সামনে দেখতে লাগলো। একলক্ষ খাম কোথায় বেচবে সে ভেবেই পেলো না। সোমনাথের মাথায় নানা অদ্ভুত চিন্তা আসছে। একলক্ষ খাম মানে একলাখ চিঠি। সে কি সোজা ব্যাপার!

লালবাজারের সামনে বি কে সাহার প্রখ্যাত চায়ের দোকানের পাশে রেস্তরাঁয় বসে এক কাপ চা খেতে খেতে সোমনাথ হিসেব করতে লাগলো : নিজের সঙ্কোচ কাটিয়ে তপতীকে যদি প্রতিদিন একখানা চিঠি লেখে তাহলেও বছরে মাত্র ৩৬৫ খানা খাম লাগবে। দশ বছর ধরে অবিশ্রান্ত চিঠি লেখা চালিয়ে গেলেও মাত্র ৩৬৫০ খানা খাম খরচ হবে। অলরাইট—তপতীকেও যদি সোমনাথ কিছু খাম পাঠিয়ে দেয় এবং সেও যদি রোজ একখানা করে চিঠি লেখে তাহলে সামনের দশ বছরে আরও ৩৬৫০ খানা খাম কাজে লাগবে। অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে সাত হাজার তিনশ' খাম। অঙ্কটা নেশার মতো সোমনাথের মাথার ওপর চেপে বসেছে। একশ' বছরেও তাহলে একলাখ খাম খরচ হচ্ছে না—লাগছে মাত্র তিয়াত্তর হাজার খাম।

আরও এক চুমুক চা খেলো সোমনাথ। না, হিসেব ঠিক হচ্ছে না—কোথায় যেন ভুল থেকে যাচ্ছে। একশ' বছরে অন্তত পঁচিশটা লিপ-ইয়ার পড়বে—তার অর্থ, বাড়তি পঁচিশ দিন, হুইচ মিনস আরও পঞ্চাশখানা চিঠি।

হিসেবের ভারে মাথাটা যখন বেশ গরম হয়ে উঠেছে তখন হঠাৎ বাইরের দিকে নজর পড়লো সোমনাথের। একজন ছোকরা কোটপ্যান্ট পরে লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টারের গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছে। কলেজবান্ধবী শ্রীময়ীর নববিবাহিত হাজবেন্ড।

ভদ্রলোক বি কে সাহার দোকানের কাছে দাঁড় করানো একটা গাড়ির সামনে দাঁড়াতেই সোমনাথ দোকান থেকে বেরিয়ে এলো। "মিস্টার চ্যাটার্জি না? চিনতে পারছেন?"

অশোক চ্যাটার্জি গাড়ির মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিল। সোমনাথের গলা শুনেই থমকে দাঁড়ালো। সোমনাথের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসিমুখে অশোক চ্যাটার্জি বললো, "খুব চিনতে পারছি। আপনিই তো মিস্টার ব্যানার্জি? গড়িয়াহাটের মোড়ে সেদিন শ্রীময়ী আলাপ করিয়ে দিলো।"

লালবাজারের সামনে গাড়ি দাঁড়াতে দেয় না। তাই অশোক চ্যাটার্জি এবার সোমনাথকে গাড়ির মধ্যে তুলে নিলো।

মিশন রোয়ের ওপরেই ওদের অফিস। ওখানকার ভালো একটা পোস্টে রয়েছে অশোক চ্যাটার্জি। ভালো পোস্টে না থাকলে শ্রীময়ীর মতো চালু মেয়ে কেন অকালে টাক-পড়া শ্যামবর্ণের এই নাদুস-নুদুস ছোকরাকে বিয়ে করতে যাবে। কলেজ-জীবনে শ্রীময়ী যার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতো সেই সমর ছিল সত্যিই সুদর্শন। তপতীর কাছে শুনেছিল, শ্রীময়ী বলতো ছেলেরা সুদর্শন না হলে তার কথা বলতে ইচ্ছে করে না। আপেলের মতো টুকটুকে ফর্সা, স্মার্ট, লম্বা ছেলে ছাড়া শ্রীময়ী কিছুতেই বিয়ে করবে না। সিনেমার হিরোর মতো চেহারা ছিল সমরের, কিন্তু সে এ-জি-বেঙ্গলের লোয়ার-ডিভিসন কেরানি হয়েছে।

অশোক চ্যাটার্জির গাড়িতে বসে শ্রীময়ীর ভূতপূর্ব বন্ধুদের কথা সোমনাথের ভাবা উচিত হচ্ছে না। সে বললো, "সেদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগলো।"

গাড়ি চালাতে চালাতে অশোক বললো, "একদিন বাড়িতে আসতে হবে। শ্রীময়ী খুব খুশী হবে। কিন্তু একলা এলে হবে না—গিন্নিকে আনা চাই।"

হেসে ফেললো সোমনাথ। অশোক অপ্রস্তুত হলো। বোকা-বোকা হেসে বললো, "ওই পাট এখনও চোকানো হয়নি বুঝি?"

সোমনাথ এবার জিজ্ঞেস করলো, "আপনাদের অফিসে স্টেশনারি পারচেজ করেন কে?"

"আমি করি না। তবে যিনি করেন, তিনি আমার বিশেষ ফ্রেন্ড।" অশোক বললো।

"ওঁর সঙ্গে একটু আলাপ করিয়ে দেবেন? পার্টটাইম বিজনেস করছি। বিজনেস ছাড়া বাঙালীদের মুক্তি নেই বুঝতেই তো পারছেন, মিস্টার চ্যাটার্জি।"

"সে কথা বলতে?" অশোক উৎসাহ দিলো।

ছেলেটি সত্যিই ভালো। সোজা সোমনাথকে নিয়ে গেলো মিস্টার গাঙ্গুলীর কাছে। বললো, "আমার বিশেষ পরিচিত। যদি সম্ভব হয়, একটু সাহায্য করবেন।"

ভাগ্য ভালো। মিস্টার গাঙ্গুলী কাগজের নমুনা দেখলেন। পঁচিশ রিম এখনই দরকার। রেট জানতে চাইলেন। মল্লিকবাবুর ছাপানো প্যাড বার করে সোমনাথ একটা কোটেশন ওখানেই লিখে দিলো।

মিস্টার গাঙ্গুলী কর্মচারীকে ডেকে বললেন, "দেখুন তো গতবার আমরা কী দামে কাগজ কিনেছিলাম।" ভদ্রলোক একটা ফাইল এনে মিস্টার গাঙ্গুলীর সামনে ধরলেন। দামটা গোপনে দেখে নিয়ে গাঙ্গুলী বললেন, "আপনার রেট ভালোই আছে। আমরা নগদ টাকায় কিনে নেবো।"

খামের ব্যাপারে একটু সময় লাগবে। নমুনা এবং কোটেশন রেখে যেতে বললেন। স্টকের অবস্থা যাচাই করতে হবে।

বেলা পাঁচটার মধ্যে ব্যবসা খতম। সব হাঙ্গামা চুকিয়ে খরচখরচা বাদ দিয়ে কড়কড়ে তিনখানা দশ টাকার নোট হাজির হয়েছে সোমনাথ উদ্যোগ-এর মালিক সোমনাথ চ্যাটার্জির পকেটে। জীবনে প্রথম রোজগার। প্রথম প্রেমের মতোই সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। কলকাতা শহরের বিবর্ণ রূপ মুছে গিয়ে হঠাৎ সমস্ত শরীরটা সোমনাথের চোখের সামনে ঝকঝক করছে। ব্যবসায় যে রস আছে, তা সোমনাথ এবার বুঝতে পারছে। উত্তেজনা চাপতে

না পেরে মানিব্যাগ বার করে সোমনাথ টাকাটা আবার গুণলো।

অফিসে ফিরে এসে বিশুবাবুর খোঁজ করলো সোমনাথ। তিনি নেই—কোনো এক কাজে কলকাতার বাইরে গেছেন। আদকবাবু আসতেই মিষ্টি আনতে দিচ্ছিলো সোমনাথ। হাঁ-হাঁ করে উঠলেন আদকবাবু। "এই জন্যে বাঙালীর বিজনেস হয় না। এই তো আপনার প্রথম নিজস্ব ক্যাপিটাল হলো। এখনই খেয়ে উড়িয়ে দিলে চলবে কেন?—আগে হাজার দশেক টাকা হোক—তারপর আপনার কাছ থেকে জোর করে মিষ্টি খাবো।"

সোমনাথ খুশী মনে রয়েছে। বললো, "দেখুন না! যদি খামের কোটেশনটা লেগে যায়, তাহলে আমাকে পায় কে।"

ব্রিজ জয়সোয়ালের টাকাও যে সে মিটিয়ে দিয়েছে, তা সোমনাথ এবার আদকবাবুকে জানিয়ে দিলো। "উনি কী বললেন?" আদকবাবু জানতে চাইলেন।

"খুব খুশী হলেন। কীভাবে কোথায় বিক্রি করলাম সব বললুম ওঁকে।"

"অ্যাঁ!" আঁতকে উঠলেন আদকবাবু। "করলেন কি মশায়। আপনার পার্টির নাম ব্রিজবাবুকে বলে দিলেন?"

তাতে মহাভারতের কী অশুচি হয়েছে সোমনাথ বুঝতে পারলো না। আদকবাবু বেশ বিরক্তভাবে বললেন, "আপনি বড় ফ্যামিলির ছেলে, বিজনেস করতে এসেছেন, আর আমি গরীব মানুষ খাতা লিখে খাই—আমার মুখে সব কথা মানায় না। তবু বলছি, এ-লাইনে কখনও নিজের তাসটি অন্য কাউকে দেখাবেন না। কাকে সাপ্লাই করছেন, তা ভুলেও কাউকে বলবেন না। যেখানে ঘোরাঘুরি করছি আমরা—এটা বাজারও বটে, জঙ্গলও বটে।"

ইতিমধ্যে তিরিশ টাকা রোজগার হয়েছে শুনে বেজায় খুশী হয়েছেন কমলা বউদি। লুকিয়ে বউদিকে খাওয়াতে চেয়েছিল সোমনাথ। বউদি রাজী হলেন না। খুব ধরাধরি করতে বউদি বললেন, "তার বদলে গাড়িটা বার করে আমাকে কবীর রোডে মামার বাড়িতে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এসো।" দাদা সেল্‌ফ ড্রাইভ করেন। গাড়িটা মাঝে মাঝে স্টার্ট দিয়ে চালু রাখার কথা বউদিকে লিখেছেন। সোমনাথের অসুবিধে নেই। গাড়ি চালানোটা বউদি ও সোমনাথ দুজনে একসঙ্গে শুরু করেছিল। কমলা বউদি দু-দিন চালিয়ে আর সাহস পাননি। কিন্তু সোমনাথ ড্রাইভিং লাইসেন্স করিয়ে ফেলেছিল সেই বি-এ পড়ার সময়েই।

বউদিকে সেদিন মামার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে একঘণ্টা পরে আবার ফিরিয়ে আনলো সোমনাথ। পথে লেকের ধারে গাড়ি থামিয়েছিল। সোমনাথ জোর করে বউদিকে কোকাকোলা খাওয়ালো—কোনো আপত্তি শুনলো না। দেওরের প্রথম উপার্জনের পয়সায় কোকাকোলা খেতে কমলা বউদির খুব আনন্দ হচ্ছিলো। ওঁর ইচ্ছে, বাবার জন্যেও একটু মিষ্টি কেনা হোক। সোমনাথ কিন্তু এই অবস্থায় বাড়িতে কিছুই জানাতে চায় না। বউদিও সব ভেবে জোর করলেন না। বিজনেস লাইনে শেষ পর্যন্ত যদি সোমনাথ হেরে যায়, এবং সবাই যদি তা জানতে পারে, তাহলে বেচারার আত্মবিশ্বাস চিরদিনের মতো নষ্ট হয়ে যাবে। ওর আত্মসম্মানে আঘাত লাগুক এমন কিছু করতে কমলা বউদি রাজী নন।

তবে শেষপর্যন্ত একটা রফা হলো! সোমনাথের পয়সায় বাবার জন্যে একশ' গ্রাম ছানা কেনা হবে, কিন্তু কে পয়সা দিয়েছে বাবাকে বলা হবে না। এই ব্যবস্থায় সোমনাথের আপত্তি নেই।

জোড়ে-জোড়ে তরুণ-তরুণীদের লেকের ধারে ঘুরে বেড়াতে দেখে, কমলা বউদির একটু রসিকতা করতে ইচ্ছে হলো দেওরের সঙ্গে। কমলা বউদির খুব ইচ্ছে কম বয়সেই সোমনাথের বিয়ে দেন। কিন্তু বিয়ের প্রসঙ্গ তুলতে সাহস হলো না। যা দিনকাল, ছেলেদের কপালে বিধাতাপুরুষ কী লিখে রেখেছেন কে জানে?

পাইপের মধ্য দিয়ে কোকাকোলা টানতে টানতে কমলা বউদি বললেন, "আমার মন বলছে ব্যবসাতে তোমার খুব নাম হবে।"

"আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক বউদি।" সোমনাথ আন্তরিকভাবে বললো।

বউদি বললেন, "আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমি যদি বিরাট বিজনেসম্যান হও কী করবে?"

মাথা চুলকে সোমনাথ বললো, "আপনাকে কোম্পানির চেয়ারম্যান করবো। আর বেচারা সুকুমারকে একটা বড় পোস্ট দেবো। সুকুমার তদ্বির করে আমাকে একটা ইন্টারভিউ পাইয়ে দিয়েছিল। আমি ওর জন্যে কিছুই করতে পারিনি।"

কমলা বউদি বললেন, "শুনেছি ওদের বড্ড অভাব। ওর সঙ্গে দেখা হলে বোলো, চাকরির অ্যাপ্লিকেশনের জন্যে টাকাকড়ি লাগলে যেন আমাকে বলে। তোমার দাদার কাছ থেকে মাসে তিরিশ টাকা করে হাতখরচা আদায় করছি।"

আদকবাবুর কথা যে মিথ্যে নয়, তা তিনদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলো সোমনাথ। অশোক চ্যাটার্জির অফিস থেকে খামের অর্ডারটা পাবে এ সম্বন্ধে সে প্রায় নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু মিস্টার গাঙ্গুলী গম্ভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন, "হলো না। আপনার দামটা অনেক বেশি।"

মুখ শুকনো করে যখন সোমনাথ বেরিয়ে আসছিল, তখন মিস্টার গাঙ্গুলীর ডিপার্টমেন্টের সেই ক্লার্কের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। শিক্ষিত বেকারকে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে দেখে ভদ্রলোকের বোধহয় একটু মায়া হলো। তিনি বলেই ফেললেন, "জয়সোয়াল কোম্পানির কাছে থাম কিনে বুঝি সাপ্লাই করছেন? ওরাই তো আপনার থেকে সস্তা কোটেশন দিয়ে গেল। বললো, সোজা ওদের কাছ থেকে নিলে আমাদের লাভ।"

সোমনাথ তাজ্জব। ব্রিজবাবুকে জিজ্ঞেস করতে তিনি আকাশ থেকে পড়লেন! ব্যাপারটা মোটেই স্বীকার করলেন না। বরং বললেন, "বিজনেসে আমরা সবাই ভাই-ভাই। আমি কি করে আপনার পেছনে ছুরি লাগাবো?"

কুণ্ডুবাবু বলে এক কর্মচারি চুপচাপ ওদের কথাবার্তা শুনছিল। ব্রিজবাবু চলে যেতেই ফিসফিস করে বললেন, "উনিই তো লোক পাঠিয়েছেন। কেন পাঠাবেন না? এইটাই তো বিজনেসের নিয়ম। আপনি যদি ব্রিজবাবুর থেকে কম দামে অন্য কোথাও খাম পেতেন—ছাড়তেন?"

সব শুনে আদকবাবু বললেন, "এ তো আমি জানতাম। আপনি যদি জয়সোয়ালকে উচিত শিক্ষা দিতে চান তাহলে ঐ মিস্টার গাঙ্গুলীকে ম্যানেজ করুন। ব্রিজবাবুর কাছে যদি প্রমাণ করতে পারেন আপনি না থাকলে ঐ কোম্পানি থেকে কিছুতেই অর্ডার আসবে না—তাহলে উনি আবার আপনার জুতোর সুখতলা হয়ে থাকবেন!"

"ওঁর অপমান হবে না?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করে।

"দূর মশায়! মান থাকলে তবে তো অপমান হবে? এটা তো বাজার, ল্যাং দেওয়া-নেওয়া চলবে জেনেই তো এরা মার্কেটে এসেছে।"

বেশ রাগ হচ্ছে সোমনাথের। ব্রিজবাবুকে যোগ্য শিক্ষা দেবার একটা প্রচণ্ড লোভ হচ্ছে। কিন্তু আদকবাবু যে মতলব দিচ্ছেন তা সোমনাথ পারবে না। মিস্টার গাঙ্গুলী কেন তার কথা শুনবেন? তাছাড়া কম দামে যেখানে মাল পাওয়া যায় সেখান থেকে কেনবার জন্যেই তো কোম্পানি মিস্টার গাঙ্গুলীকে রেখেছেন।

আদকবাবু ওসব বুঝলেন না। বললেন, "এ-লাইনে অনেকদিন হলো। পারচেজ অফিসারের কত গল্প কানে আসে। ওঁরা ইচ্ছে করলে যা খুশী তাই করতে পারেন।"

বাড়িতে ফিরে বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় ব্রিজবাবুকে হারিয়ে দেবার ব্যাপারটা সোমনাথের মাথায় ঘুরছে। বউদিকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে লাভ হলো না। সোমনাথ জানতে চেয়েছিল, প্রতিহিংসা জিনিসটা কেমন? বউদি যথারীতি মায়ের কথা তুললেন। মা বলতেন, কুকুর তোমাকে কামড়াতে এলে তুমি কুকুরকে তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু তুমি কুকুরকে কামড়াতে পারো না।

তবু সোমনাথের মনটা শান্ত হচ্ছে না।

দেওর ব্যবসা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে দেখে কমলা বউদি ভরসা পেলেন।

সোমনাথ পরের দিন অশোক চ্যাটার্জির অফিস পর্যন্ত গিয়েছিল। ভাবলো একবার

শ্রীময়ীকে ফোনে ধরবে কিনা। নববিবাহিতা বধূ কোনো অনুরোধ করলে অশোক চ্যাটার্জি তা ফেলতে পারবে না। কিন্তু ইচ্ছে করলো না সোমনাথের। যেখানে সন্ধ্যা হয় সেইখানেই বাঘের ভয়। অফিসের দরজার গোড়ায় অশোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বরটি ভালোই ম্যানেজ করেছে শ্রীময়ী। মনটি বেশ উদার। সোমনাথের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় হলো।

অশোক চ্যাটার্জি আজও সৌজন্য প্রকাশ করলো—ব্যবসার খোঁজখবর নিলো। কিছু অর্ডার পেয়েছে শুনে খুশী হলো—কিন্তু সোমনাথ খামের কথাটা তুলতে পারলো না।

আদকবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "জয়সোয়ালকে একটু শিক্ষা দিলেন?"

সোমনাথ পরাজয় স্বীকার করলো। বললো, "মিস্টার গাঙ্গুলীর কাছে ছোট হতে পারলাম না।"

আদকবাবু বললেন, "এ-লাইনে যদি কিছু করতে চান পারচেজ অফিসারদের সঙ্গে ভাব করুন।"

চার নম্বর টেবিলের উমানাথ যোশী বেশ মনমরা হয়ে বসে আছে। ছোকরা কোনো লাইনেই তেমন সুবিধে করতে পারছে না। রাঠী নামে এক ভদ্রলোকের কোম্পানিতে সে কাজ করতো। মন কষাকষি হওয়ায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে। কিন্তু হাতে তেমন কাজকম্ম নেই।

যোশী যে-লাইনে কাজ-কারবার করে সেই একই লাইনে ব্যবসা করছেন দু নম্বর টেবিলের সুধাকর শর্মা। অথচ সুধাকরবাবুর নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। একজন পার্টটাইম টাইপিস্ট রেখেছেন। কিন্তু সে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। সুধাকরবাবু একটা সারাক্ষণের টাইপিস্ট রাখবার কথা ভাবছেন। অনেক টেলিফোন আসে সুধাকরবাবুর নামে। ফকির সেনাপতি বারবার হাঁক দেয়—সায়েব আপনার টেলিফোন।

সুধাকর শর্মার সাফল্যের রহস্যটা বুঝতে পারে না সোমনাথ। যোশীর কাজকম্ম নেই তেমন—তাই সোমনাথের সঙ্গে মাঝে মাঝে গল্প করে। যোশী বলে, "শর্মাজী জাদু জানেন। পারচেজ অফিসারকে মন্তর দিয়ে বশ করে ফেলেন!"

শর্মাজীর কাজ করেন না আদকবাবু। উনি বলেন, "পারচেজ অফিসার যদি গোখরো সাপ হয়—শর্মাজী হচ্ছেন সাপুড়ে। যতই ফণা তুলুক, অফিসারকে ঠিক বশ করে শর্মাজী নিজের ঝাঁপিতে পুরে ফেলবেন!"

কিসের যে ব্যবসা করেন না সুধাকরজী তা সোমনাথ বুঝতে পারে না। ঝোলাগুড় থেকে আরম্ভ করে, সাবান, টয়লেট, পেপার, কাঁচের গেলাস সব কিছুই সাপ্লাই করেন।

যোশী বলে, "সুধাকরজীর লক্ষ্মী হলো কোন্নগরের এক কারখানা। সেখানে সাড়ে-আটশ' পিস সাবান প্রতি মাসে সাপ্লাই করতেন ভদ্রলোক। ওঁর গিন্নির সঙ্গে ওখানকার ম্যানেজারবাবুর দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা আছে। আগে প্রত্যেক ওয়ার্কারকে হাত ধোবার জন্যে প্রতি মাসে একখানা সাবান দেওয়া হতো। এরপর সুধাকরজী নাকি ইউনিয়নের কোনো পাণ্ডাকে পাকড়াও করেন। ওরা প্রতিমাসে দু'খানা সাবান দাবি করলো—কোম্পানি দিতে বাধ্য হয়েছে। সুধাকরজী মাসে সতেরোশ' পিস সাবান সাপ্লাই করতে আরম্ভ করলেন। তারপর কীভাবে অন্য অনেককে ম্যানেজ করেছেন। সুধাকরজীর কাজ এত বেড়েছে যে নিজের আলাদা আপিসের কথা ভাবছেন।"

সোমনাথ মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখছে সেও সুধাকর শর্মার মতো কাজকর্ম বাড়িয়ে চলেছে। কিন্তু কী যে মন্তর সুধাকরবাবু জানেন—সে বুঝতেই পারে না। টো টো করে সেও সারাদিন অফিসে অফিসে ঘুরছে, কিন্তু সুবিধে করতে পারছে না।

সুধাকর শর্মা কোনো প্রশ্নের উত্তর দেন না। শুধু ফিক করে হাসেন। আর সন্ধ্যা হলেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েন। ফকির সেনাপতি বলে, "শর্মাজী মাঝে মাঝে অনেক রাতে ফিরে আসেন। তখন নাকি একটু বেসামাল অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় তাঁকে।" সেনাপতি বিরক্ত হতে পারে না। কারণ সুধাকর শর্মা তাকে আলাদা করে প্রতি মাসে পঁচিশ টাকা

দেন। অবশ্য সেনাপতিকে তার বদলে একশ টাকার ভাউচার সই করতে হয়। কিন্তু সেনাপতির তাতে আপত্তি নেই। কিছু টাকা তো মিলছে।

সুধাকর শর্মার জামাকাপড় বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বুশ শার্ট এবং টেরিলিন প্যান্ট পরেন। অফিসের আলমারিতে একটা কোট এবং টাইও আছে। বড় কোনো পার্টির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে অনেক সময় কোট চড়িয়ে নেন। সেনাপতি একটা ব্রাশ দিয়ে সুধাকরের কোট ঝেড়ে দেয়।

◆

পাশের ঘরের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে সোমনাথের। এদের দু-একজনের নিজস্ব গোডাউন আছে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিয়ে এরা অনেক জিনিস গুদামে রেখে দেয়। একেবারে পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে ব্যবসার স্তর এরা পেরিয়ে এসেছে। কলকাতা ছাড়াও, উড়িষ্যা এবং আসামের দূর দূর প্রান্তে এদের বেচাকেনা চলে।

ঐ ঘরে টিমটিম করে হীরালাল সাহা বলে এক বাঙালী ভদ্রলোক জ্বলছেন। হীরালাল সাহা রেল আপিসে কাজ করতেন। একবার সাইড বিজনেস হিসেবে কিছু পুরানো রেলওয়ে স্লিপার নিলাম ডাকে কিনেছিলেন। তাতে পাঁচ হাজার টাকা লাভ করেছিলেন। সেই সময় শ্যামবাজারে একখানা পুরানো বাড়ি ভাঙা হচ্ছিলো। ওই বাড়ির ইঁট কাঠ জানালা দরজা সব কিনেছিলেন হীরালাল সাহা। অফিসের সহকর্মীরা পিছনে লাগলো, হীরালালবাবু চাকরি ছেড়ে দিলেন।

হীরালালবাবু বলেন, “গডেস মঙ্গলচণ্ডীর কাইন্ডনেসে করে খাচ্ছি। জানেন মিস্টার ব্যানার্জি, বাঙালীদের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো বাঙালীরা। আমি দেখুন চাকরিও করছিলাম, বিজনেস থেকেও টু-পাইস আনছিলাম—তা আমার বাঙালী বন্ধুদের সহ্য হলো না। আর এই বিজনেস পাড়ায় দেখুন—গুজরাতী গুজরাতীকে, সিন্ধি সিন্ধিকে দেখছে। মারোয়াড়ীদের তো কথাই নেই। যে-আপিসে মারোয়াড়ী আছে সেখানে পারচেজ বলুন, বিক্রির এজেন্সি বলুন জাতভাইদের জামাই আদর।”

হীরালালবাবু খবরাখবর রাখেন। বললেন, “আপনি তো জয়সোয়ালদের জিনিস বেচতে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছেন? আপনাকে দুটো পয়সা দিতে ওদের গায়ে লাগলো। অথচ আমি জানি নিজের গাঁয়ের তিন-চারটে ছোঁড়াকে ওরা ছ'মাসের ধারে মাল দিচ্ছে।”

হীরালালবাবুর সময়টা এখন ভালো যাচ্ছে। বললেন, “বউবাজারের কাছে গডেস মঙ্গলচণ্ডী আছেন। ওঁকে মাঝে মাঝে নিজের দুঃখ জানিয়ে আসবেন—মা কোনো কষ্টই রাখবেন না। মায়ের করুণায় পর-পর দুখানা সায়েব বাড়ির কড়ি বর্গা টালি কিনলুম। দু'মাসের মধ্যে টু-পাইস এসেছে, কেন মিথ্যে বলবো।”

হীরালালবাবু বললেন, “সারাদিন এখন মশাই টো-টো করে রাস্তায় ঘুরি। একখানা ভাঙবার মতো বাড়ির সন্ধান পেলেই বেশ কিছু হয়ে যাবে। এমন কিছু হাঙ্গামা নেই। ব্যবস্থা পাকা করে খবরের কাগজে একখানা বিজ্ঞাপন দিই—‘সায়েব বাড়ি ভাঙা হইতেছে। অতি মূল্যবান কাঠকাঠরা ও ভিনিসিয়ান টালি বিক্রয়। অমুক ঠিকানায় খোঁজ করুন।’ একখানা বোর্ডও করিয়ে রেখেছি। তাতেও লেখা থাকে—‘সেল! সেল! সেল! সায়েব বাড়ি ভাঙা হইতেছে। ভিতরে খোঁজ করুন।’ আমার একটি হিন্দুস্থানী দারোয়ান আছে। সে

ভাঙা বাড়িতেই বসে থাকে—ওইখানেই ইঁট কাঠ দরজা জানালা, মায় সায়েবদের ব্যবহার করা পুরানো কমোড পর্যন্ত বিক্রি হয়ে যায়।"

হীরালালবাবু বললেন, "সায়েব বাড়ির কোনো খোঁজখবর থাকলে বলবেন। আপনাকে 'সুইটেবল' কমিশন দেবো।"

ভাঙা বাড়ির কথায় সোমনাথ বললো, "দাঁড়ান একটু ভেবে দেখি!"

গতকাল তপতীদের বাড়িতে যাবে কিনা ভাবছিল সোমনাথ। হাঁটতে হাঁটতে এলগিন রোডের ওপর একটা পুরানো বাড়ির দিকে সোমনাথের নজর পড়েছিল। সেখানে বোধহয় নতুন কোনো ফ্ল্যাটবাড়ি উঠবে—কারণ কুলিরা লরি থেকে নতুন একটা সাইনবোর্ড নামাচ্ছিল। সোমনাথ ঠিকানাটা হীরালালবাবুকে দিয়ে দিলো।

"দেখো মা চন্ডী," বলে হীরালালবাবু তখনই ছুটলেন। সারাদিন আর দেখা নেই।

দু-দিন পরে সকালে হীরালালবাবুর খোঁজ পাওয়া গেল। ভীষণ খুশী মনে হচ্ছে তাঁকে। সোমনাথের পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "গডেস চন্ডী দয়া না করলে এ-সুযোগ আসতো না, মিস্টার ব্যানার্জি! ঠিক দেখেছেন—একেবারে সায়েব বাড়ি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত বর্মা টিকে সাজানো। আজকেই বায়না করে এলাম।"

হীরালালবাবু বললেন, "আপনি শ'দেড়েক টাকা রাখুন। যদি তেমনি প্রফিট করতে পারি আরও দু'শ টাকা দেবো।"

সোমনাথ টাকাটা নিতে চাচ্ছিলো না। কিন্তু হীরালালবাবু নাছোড়বান্দা। বললেন, "খবর দেওয়াটাও বিজনেস তো মশাই। গডেস মঙ্গলচন্ডী কী ভাববেন, যদি আপনাকে আপনার প্রাপ্য না দিই? আরও খবরটবর রাখবেন। তবে জেনুইন সায়েব বাড়ি হওয়া চাই। বাঙালী বাড়ি ভেঙে সুখ নেই মশাই—জল ঢেলে ঢেলে বাড়ির কিছু রাখে না।"

জেনুইন সায়েব বাড়ি কাকে বলে জানবার লোভ হলো সোমনাথের।

হীরালালবাবু বললেন, "সায়েবদের জন্যে যেসব বাড়ি তৈরি হয়েছিল।" এবার দাঁত বার করে হাসলেন তিনি। বললেন, "সায়েব বাড়ি কলকাতায় একখানাও থাকবে না। আমরা সব ভেঙে বেচে ফেলবো। জমির দাম যে অনেক বেড়ে গেছে। একখানা সায়েব বাড়িতে বড়-জোর দুজন সায়েব ভাড়া থাকতো। তার বদলে সেই জায়গায় পঁচিশ-তিরিশটা ফ্ল্যাট তৈরি হবে—অনেক ভাড়া উঠবে।"

হীরালালবাবু বললেন, "তাহলে নজর রাখতে ভুলবেন না, মশাই। এই এলগিন রোড ধরেই আমি গতমাসে দুবার ঘুরেছি—অথচ এই বাড়িটা হাত-ছাড়া হয়ে যাচ্ছিলো।"

টাকাটা পকেটে পুরে এই দুপুরবেলায় কলেজের সেই শ্যামলী মেয়েটার কথা সোমনাথের মনে পড়ে যাচ্ছে। ব্যবসার সময়ে অন্য কারুর কথা এখানে কেউ ভাবে না। কিন্তু সোমনাথ সত্যিই কি শেষপর্যন্ত এদের একজন হতে পারবে? আশা-নিরাশার মধ্যে দোল খাচ্ছে সে। বিকেলে মিটিং আছে মিস্টার মাওজীর সঙ্গে। তার আগে অফুরন্ত সময়।

অফিসের টেলিফোনটা এই সময় বেজে উঠলো। সেনাপতি তার নিজস্ব কায়দায় ফোন ধরলো। তারপর সোমনাথকে অবাক করে দিলো, "বাবু, আপনার ফোন।" সোমনাথকে কে ফোন করতে পারে?

ফোনের ওপাশে তপতী রয়েছে সোমনাথ ভাবতেও পারেনি।

কলেজ স্ট্রীট থেকে ফোন করছে তপতী। আজ হঠাৎ রিসার্চের কাজ থেকে ছুটি পাওয়া গেছে।

তপতীকে যে এখনই আসতে বলা উচিত তা সোমনাথ বুঝতে পারছে। তপতী নিশ্চয় কিছু বলতে চায়, না হলে কেন সে ফোন করবে?

ফোনে সোমনাথ বললো, "যদি সময় থাকে, চলে আসতে পারো।"

খুঁজে খুঁজে তপতী আধঘণ্টার মধ্যে কানোরিয়া কোর্টের বাহাত্তর নম্বর ঘরে হাজির হলো। সোমনাথ অন্য কোথাও তাকে আসতে বলতে পারতো। অন্তত মেট্রো সিনেমার তলায় দাঁড়ালে ওর অনেক সুবিধে হতো। কিন্তু ইচ্ছে করেই সোমনাথ এখানকার কথা বলেছিল। তপতীকে ঠকিয়ে লাভ নেই। সে নিজের চোখে সোমনাথের অবস্থা দেখুক।

দূর থেকে তপতীকে কাছে আসতে দেখে সোমনাথের বুকটা অনেকদিন পরে দুলে উঠলো।

তপতীর ডানহাতে বেশ কয়েকখানা বই। একটা ছাপানো-মিলের শাড়ি পরেছে তপতী। সঙ্গে সাদা ব্লাউজ। ওর শ্যামলিমার সঙ্গে হঠাৎ যেন অন্য কোনো ঔজ্জ্বল্য মিশে এই ক'দিনে তপতীকে অসামান্যা করে তুলেছে। ওর মাথার সামনের চুলগুলো তেমনি অবাধ্যভাবে কপালের ওপর এসে পড়েছে। আজ তপতীকে সত্যিই বিদুষী সুন্দরী মনে হচ্ছে।

তপতীর চোখে চশমা ছিল না আগে। একটা কালো ফ্রেমের আধুনিক ডিজাইনের চশমা পরেছে সে। চশমাটা সত্যি ওর মুখের ভাব পাল্টে দিয়েছে। ওকে অনেক গম্ভীর মনে হচ্ছে, ওর যে বয়স হচ্ছে, ও যে আর কলেজের ছোট মেয়ে নেই, তা এবার বোঝা যাচ্ছে।

সোমনাথ বোধহয় একটু বেশিক্ষণই তপতীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। ঘরে সেনাপতি ছাড়া কেউ নেই। তপতী নিজেও বোধহয় এই পরিবেশে অস্বস্তি বোধ করছে।

সোমনাথ এবার স্তব্ধতা ভাঙলো। গাঢ়স্বরে বললো, "তোমাকে চিনতেই পারছিলাম না। কবে চশমা নিলে?"

তপতী ওর দিকে কয়েক মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে রইলো। তারপর পুরানো দিনের মতো সহজভাবে বললো, "দু'মাস হয়ে গেল। ভীষণ মাথা ধরছিল। ডাক্তার দেখাতেই বললেন, বেশ পাওয়ার হয়েছে।"

"খুব পড়াশোনা করছো বুঝি?" সোমনাথ সস্নেহে জিজ্ঞেস করে।

"যা কম্পিটিশন, না পড়ে উপায় কি?" তপতীর কথার মধ্যে এমন একটা কিশোরী মেয়ের বিস্ময় আছে যা সোমনাথকে মুগ্ধ করে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অনেক মেয়ের জীবন থেকে বিস্ময় চলে যায়। তপতী এখনও এই ঐশ্বর্য হারায়নি।

সোমনাথ এবং তপতীর মধ্যে এখন অনেক দূরত্ব। তবু এই মুহূর্তে সেই অপ্রিয় সত্যকে স্বীকার করতে পারছে না সোমনাথ। সে ভাবলো এখনও তারা দুজনে কো-এডুকেশন কলেজের ছাত্রছাত্রী। সোমনাথ উষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তপতীকে আর-একবার নিরীক্ষণ করলো—ওর টিকলো নাক, টানা-টানা চোখ, দীর্ঘ গ্রীবা। তারপর কোনো-রকমে বললো, "চশমায় তোমাকে সুন্দর মানিয়েছে তপতী।"

তপতী অন্য অনেক মেয়ের মতো ন্যাকা নয়। মিষ্টি হেসে বিনা প্রতিবাদে অভিনন্দন গ্রহণ করলো। সোমনাথের দিকে তাকালো তপতী। চোখের পাতা কয়েকবার দ্রুত বন্ধ করে নিজের আনন্দ প্রকাশ করলো এবং বললো, "থ্যাংকস্।" তারপর হাতের কলমের মুখটা খুলতে এবং বন্ধ করতে করতে তপতী বললো, "ফ্রেম করবার সময় আমার ভয় হচ্ছিলো তোমার আবার পছন্দ হবে তো।"

তাহলে তপতী আজও সোমনাথের পছন্দ-অপছন্দের ওপর গুরুত্ব দেয়—নিজের চশমা কেনার সময়েও সোমনাথের কথা মনে পড়ে।

"তোমার জন্যে একটু চা আনাই তপতী?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো।

তপতী একটু অস্বস্তি বোধ করলো। বললো, “কি দরকার?”

“এ-পাড়ায় আমরা কী-রকম চা খাই, দেখবে না?” সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো।

তপতী সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল।

চা শেষ করে সোমনাথ বললো, “চলো, বেরিয়ে পড়ি।”

“বারে! তোমার কাজের অসুবিধা হবে না?” তপতী জিজ্ঞেস করে। ওর মনটা বড় খোলা। বাংলার বাইরে ছোটবেলা কাটিয়েছে বলে, কলকাতার অনেক নীচতা ও সংকীর্ণতা ওকে স্পর্শ করতে পারেনি।

গম্ভীর সোমনাথ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, “কাজ থাকলে তো অসুবিধা? আপাতত আমার কোনো কাজ নেই।”

তপতীর একটা সুন্দর স্বভাব আছে, কখনও গায়ে পড়ে কোনো জিনিসের ভিতর ঢুকতে যায় না। অহেতুক কৌতূহল দেখায় না। যা জানতে পায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। ওর মানসিক স্বাস্থ্য যে এদেশের অসংখ্য মেয়ের আদর্শ হতে পারে তা সোমনাথ ভালোভাবেই জানে। তপতী বললো, “তাহলে চলো।”

এসপ্ল্যানেড থেকে বাসে চড়ে ওরা গঙ্গার ধারে চাঁদপাল ঘাটের সামনে নেমে পড়লো।

“অতগুলো বই তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে—আমাকে কিছুক্ষণ ভার বইতে দাও,” সোমনাথ দু-একখানা বই নেবার জন্যে তপতীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো।

বইগুলো আরো জোর করে আঁকড়ে ধরলো তপতী। গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে সে হেসে ফেললো। কিন্তু হাসি চাপা দিয়ে তপতী বললো, “তোমার সঙ্গে আজ ঝগড়া করতে এসেছি সোম।”

এইরকম একটা কিছু আশংকা করেছিল সোমনাথ। তবু সাহস সঞ্চয় করে বললো, “বইটা হাতে দিয়েও ঝগড়া করা যায় তপতী।”

তপতী বললো, “ভীষণ ঝগড়া করতে হবে যে!” ওর মেঘলা মুখের আড়ালে আবার হাসির রৌদ্র উঁকি মারছে।

স্ট্র্যান্ড রোড ধরে ওরা দুজন মন্থর গতিতে দক্ষিণ দিকে হাঁটছে। এই দুপুরে এখানে তেমন ভীড় থাকে না। মাঝে মাঝে দূরে কলেজের খাতাপত্র হাতে দু-একটি ছাত্রছাত্রীর জোড় দেখা যাচ্ছে। রাস্তার ওপারে ইডেন গার্ডেন। পশ্চিমে ধীর প্রবাহিণী গঙ্গার দিকে ওরা দুজনেই মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে।

তপতী এবার নিস্তব্ধতা ভাঙলো। জিজ্ঞেস করলো, “তোমার খোঁজখবর নেই কেন?”

সোমনাথ কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। সে কোনো উত্তর না-দিয়েই হাঁটতে লাগলো।

তপতী বললো, “যে খবর চায় সে যদি খবর না পায় তাহলে তার মনের অবস্থা কেমন হয়?”

“খুব কষ্ট হয়। তাই না?” সোমনাথ বেশ অস্বস্তি বোধ করছে।

“তুমি তো কবি। তুমিই উত্তর দাও।” তপতী সরলভাবে দায়িত্বটা সোমনাথের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলো।

কবি! পৃথিবীতে একমাত্র তপতীই এখনও তাকে কবি বলে মনে রেখেছে। কবিতার সঙ্গে বেকার সোমনাথের এখন কোনো সম্পর্ক নেই।

আজকের এই জনবিরল নদীতীরে দাঁড়িয়ে, হারিয়ে যাওয়া অতীতের অনেক কথা সোমনাথের মনে পড়ে যাচ্ছে।

হাওয়ায় অবাধ্য চুলগুলো সামলে নিয়ে সোমনাথ বললো, “অনেকদিন আগে প্রথম এখানে এসেছিলাম, সেদিনকার কথা মনে আছে তোমার?”

হাসলো তপতী। বললো, “তারিখটা ছিল ১লা আষাঢ়।”

“তারিখটা তোমার মনে আছে তপতী!” অবাক হয়ে গেল সোমনাথ।

“ইতিহাসের ছাত্রী। পুরানো সব কথা মনে না রাখলে পাস করবো কী করে?” সহজভাবেই উত্তর দিলো তপতী।

তপতীর মুখের দিকে তাকালো সোমনাথ। ওর জন্যে ভীষণ মায়া হচ্ছে সোমনাথের। একবার ইচ্ছে হলো, ওর নরম হাত দুটো ধরে সোমনাথ বলে, "তপতী, ভালোবেসে তুমি আমাকে ধন্য করেছো। কিন্তু তোমার নির্বাচনের জন্যে সত্যি আমার দুঃখ হয়। একজন সহপাঠী হিসেবে আই জেনুইনলি ফিল স্যরি ফর ইউ।"

কিন্তু তপতীকে কিছু বলতে পারছে না সোমনাথ। মেয়ে হয়েও ওর আত্মবিশ্বাস আছে। তপতী নরম, কিন্তু লতার মতো পরনির্ভর নয়।

অনেকগুলো চেনা মুখ মনে পড়ছে। সোমনাথ বললো, "পুরানো দিনগুলোর কথা ভাবতে বেশ লাগছে তপতী।"

নদীর বেপরোয়া হাওয়ার অশোভন উৎপীড়ন থেকে নিজের শাড়ি সামলে নিয়ে তপতী বললো, "ইতিহাসের ছাত্রী, আমরা তো দিনরাতই অতীত নিয়ে পড়ে আছি—তাই মাঝে মাঝে ভবিষ্যতের দিকে উঁকি মারতে লোভ হয়।"

সোমনাথ ভাবলো একবার বলে, "তাতো মনে হচ্ছে না তপতী। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তোমার একবিন্দু মায়া-মমতা থাকলে বেকার সোমনাথ ব্যানার্জির সঙ্গে তুমি এইভাবে ঘুরে বেড়াতে না।"

"দীপঙ্করকে মনে আছে তোমার?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো তপতীকে।

"খুব মনে আছে। ভীষণ চ্যাংড়া ছিল।" তপতী উত্তর দিলো।

"শুনলাম, আই-এ-এস পেয়েছে। আলিপুরের এ-ডি-এম হয়ে আসছে।" সোমনাথ খবর দিলো।

তপতী কোনো আগ্রহ দেখালো না। সোমনাথের মনে পড়লো, এই দীপঙ্কর কলেজে তপতীর সুনজরে আসবার জন্যে কত চেষ্টা করেছে—ফার্স্ট ইয়ারে। কিন্তু তপতী একেবারেই পাত্তা দেয়নি দীপঙ্করকে। পড়াশোনায় ভালো বলে দীপঙ্করের একটু দম্ভ ছিল। তপতী এই ধরনের ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেনি। দীপঙ্কর শেষপর্যন্ত লম্বা চিঠি লিখেছিল তপতীকে। সেই দীর্ঘ চিঠি তপতীকে আরও বিরক্ত করেছিল। উত্তর না দিয়ে চিঠিটা নিজের হাতে দীপঙ্করকে ফিরিয়ে দিয়েছিল তপতী।

তপতী, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যদি তোমার একটুও মমতা থাকতো তাহলে আজ দীপঙ্কর রায়ের ওয়াইফ হতে পারতে, সোমনাথ মনে মনে বললো।

কলেজ থেকে পালিয়ে সেই যেদিন ওরা প্রথম এই নদীর ধারে এলো, সেদিনটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সোমনাথ। শ্রীময়ী, সমর, তপতী—জন্মদিনে ওদের সামান্য খাওয়াবে ঠিক করেছিল সোমনাথ।

কমলা বউদির কাছ থেকে সেদিন সকালেই তিরিশ টাকা নগদ জন্মদিনের উপহার পেয়েছিল সোমনাথ।

সোমনাথের জীবনে তখন কত রঙীন স্বপ্ন। নিত্যনতুন অনুপ্রেরণায় কবি সোমনাথ তখন অজস্র কবিতা লিখে চলেছে। সেই সব সৃষ্টির তখন দুজন নিয়মিত পাঠিকা—কমলা বউদি ও তপতী। তপতী সবে তখন মীরাট থেকে এসে ওদের কলেজে ভর্তি হয়েছে। ইংরিজী মিডিয়ামে পড়েছে এতদিন। ভালো বাংলা জানে না বলে ভীষণ লজ্জা। বাংলা সাহিত্য এবং বাংলার লেখক সম্বন্ধে তার বিরাট শ্রদ্ধা। সোমনাথের জন-অরণ্য তার খুব ভালো লেগেছিল।

কবির সঙ্গে তার পরিচয় সেই থেকে ক্রমশ নিবিড় হয়েছে। তপতীর জন্যে এবার সোমনাথ সুদীর্ঘ এক কবিতা লিখেছিল। নাম—আঁধার পেরিয়ে। উচ্ছ্বসিত তপতী বলেছিল, "কলম কেনার টাকাটা আমার উসুল হয়ে গেল। জন-অরণ্য কবিতায় আপনি মানুষকে ভালোবাসতে পারেননি, এবার মানুষের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পেরেছেন।"

"সমালোচনা কিছু থাকলে বলবেন," সোমনাথ অনুরোধ করেছিল।

খুব খুশী হয়েছিল তপতী। আঙুলের নখ কামড়ে বলেছিল, "আমার ঘাড়ে মস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দিচ্ছেন আপনি।" একটু ভেবে তপতী বলেছিল, "সবসময় গুরুগম্ভীর হবেন না। কবিদের তো হাসতে মানা নেই।"

তপতীর সমালোচনা অনুযায়ী সোমনাথ লিখেছিল হাল্কা মেজাজের কবিতা 'বনলতা

সেনের বয়-ফ্রেন্ডের প্রতি।' সেই কবিতা পড়ে কমলা বউদি খুব হেসেছিলেন। বলেছিলেন, "এ-যেন নতুন ধরনের কবিতা দেখছি। কারও বয়-ফ্রেন্ড হবার চেষ্টা করছো নাকি, সোম?" সোমনাথ মুখ টিপে হেসে উত্তরটা এড়িয়ে গিয়েছিল। কবিতা পড়ে তপতী বলেছিল, "যদি কোনোদিন বই প্রকাশিত হয় লিখে দিতে হবে 'তপতী রায়ের পরামর্শ অনুযায়ী লিখিত।' না হলে, অ্যাডভাইস ফি দিতে হবে।"

তপতীর কি এসব মনে আছে? সোমনাথের জানতে ইচ্ছে করে।

নদীর ধারে হাওয়ার দৌরাত্ম্য যেন বাড়ছে। সোমনাথের হাতে বইপত্তরের বোঝাটা দিয়ে তপতী আবার আঁচল সামলে নিলো। তারপর নিজেই জিজ্ঞেস করলো, "প্রথম যেদিন তোমার সঙ্গে এখানে এসেছিলাম, সেদিন কি জায়গাটা আরও সবুজ ছিল?"

"তখন আমাদের মন সবুজ ছিল," সোমনাথ শান্তভাবে বললো।

তপতী বললো, "তুমি তখনও খুব চাপা ছিলে। মনের ভিতর তোমার কী চিন্তা রয়েছে তা অন্য কাউকে বুঝতে দিতে না। সেদিন কলেজে যাবার পথে বাস স্ট্যান্ডেই তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। আমার সঙ্গে শ্রীময়ী ছিল। তুমি বললে, আপনাদের দুজনকে আজ খাওয়াবো, মাঝে মাঝে ঘুষ না দিলে কবিতা পড়ার লোক পাওয়া যাবে না।

"আমার মতো শ্রীময়ীও খুব ফরওয়ার্ড ছিল। মুখে কোনো কথা আটকাতো না। তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'খাওয়াবেনই যখন, তখন নদীর ধারে চলুন। জায়গাটা গ্র্যান্ড শুনেছি।' তুমি রাজী হয়ে গেলে। হেসে বললে, 'তিনজনে যাত্রা নিষেধ।' সুতরাং চতুর্থ ব্যক্তিকে আমরা দুজনে যেন মনোনয়ন করি। আমি ভেবেছিলাম, ললিতাকে আমাদের সঙ্গে যেতে বলবো। কিন্তু ফচকে শ্রীময়ী বললো, 'প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে।' আমি বাংলা জানতাম না। প্রথমে বুঝতে পারিনি যে শ্রীময়ী বলতে চাইছে, ললিতাকে দলে নিলে ছেলে এবং মেয়ের প্রপোরশন নষ্ট হয়ে যাবে।

"শ্রীময়ী আমাকে গোপনে জিজ্ঞেস করলো, 'তোর নমিনি কে?' আমি হেসে বলেছিলুম, তিনিই তো খাওয়াচ্ছেন! শ্রীময়ীর ইচ্ছে দেখলাম, সমরকে সঙ্গে নেয়। সুতরাং তুমি ওকেই নেমন্তন্ন করলে।"

সোমনাথ হেসে বললো, "সমরকে নির্বাচনের পিছনে সেদিন যে তোমাদের এত চিন্তা ছিল তা আমি জানতাম না। তবে সমর ছোকরা যে অত চালু তা আন্দাজ করিনি।"

অতীত রোমন্থন করে সোমনাথ বললো, "তোমার মনে আছে তপতী, সেদিন আমরা যখন এখানে এসে পৌঁছলাম তখন দুপুর বারোটা। পনেরো মিনিট এক সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করবার পরে সমর হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকালো। তারপর বললো, 'নদীর ধারে রেস্তোরাঁয় আমরা পৌনে একটার আগে যাচ্ছি না। সুতরাং কিছুক্ষণের জন্যে বিচ্ছেদ। যত মত তত পথ। আমাদের সামনে দুটো চয়েস—হয় ইডেন গার্ডেন, না হয় নদীর ধার।' শ্রীময়ী একটা সিকি দিয়ে হেড-টেল করলো। ওরা চলে গেল ইডেন গার্ডেনের ভেতর—আমরা দুজন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম নদীর ধারে।"

"তুমি বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলে সেদিন, সোমনাথ।" তপতী মনে করিয়ে দিলো।

"ঘাবড়াবো না? তোমার জন্যেই চিন্তা হলো। তুমি যদি ভাবো, আমরা দুই পুরুষ বন্ধু একটা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র অনুযায়ী তোমাদের আলাদা করে দিলুম।"

সুদর্শনা তপতী ওর নতুন চশমার মধ্য দিয়ে সোমনাথের দিকে স্নিগ্ধ প্রশান্ত দৃষ্টিপাত করলো। "কবিরা যে ষড়যন্ত্রী হয় না তা আমার চিরদিনই বিশ্বাস ছিল, সোমনাথ।"

"তপতী, সেদিন তোমাকে খু-উ-ব ভালো লেগেছিল। বাদল দিনের প্রথম কদম ফুলের মতো!"

"তুমি কিন্তু বড় সরল ছিলে, সোমনাথ। শ্রীময়ী ও সমর রাস্তার ওপারে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া মাত্র বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছিলে। তারপর বলেছিলে, "আপনি যদি চান, আমি এখন ওদের ডেকে নিয়ে আসছি!" আমি বাধা না দিলে, হয়তো তুমি ওদের খোঁজ করতে যেতে। আমি পশ্চিমে মানুষ। মীরাটের রাস্তায় সাইকেল চালিয়েছি। জিমনাসিয়ামে যুযুৎসু শিখেছি। ছেলেদের অত ভয় পাই না। বললাম, ওদের ডিসটার্ব করবেন কেন শুধু শুধু?

তুমি তখনও নার্ভাসনেস কাটাতে পারোনি। উত্তেজনার মাথায় গোপন খবরটা প্রকাশ করে ফেললে। বললে, ‘আজ আমার জন্মদিন। বউদি তিরিশটা টাকা দিয়ে বললেন, যেমনভাবে খুশী খরচ করতে।’ ”

সোমনাথ মৃদু হাসলো। বললো, “এরপর তুমি কিন্তু আমাকে বেশ ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে তপতী। গম্ভীরভাবে তুমি জিজ্ঞেস করলে, ‘সোমনাথবাবু জন্মদিনে পাওয়া টাকাটা অনেকভাবেই তো খরচ করতে পারতেন। কিন্তু আমাদের ডাকলেন কেন?’ ”

সেদিনের কথা ভেবে এতদিন পরেও তপতী মুচকি হাসলো। বললো, “তোমার মুখের অবস্থা দেখে তখন আমার মায়া হচ্ছিলো। তুমি ঘাবড়ে গিয়ে বললে, ‘আপনি জন-অরণ্য কবিতাটা পছন্দ করে নিজের কাছে রেখে দিলেন। আমার পরের কবিতাগুলোকে কষ্ট করে পড়লেন। তাই কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করতে ইচ্ছে হলো।’ ”

সোমনাথ অবিন্যস্ত চুলগুলোকে শাসন করতে করতে তপতীর কথায় কৌতুক বোধ করলো। “তুমি যে আমার অবস্থা দেখে মনে মনে হাসছো, তা কিন্তু তখন বুঝতে দাওনি। বেশ সহজ হয়ে বলেছিলে, ‘কৃতজ্ঞতা পাঠিকার দিক থেকেই সোমনাথবাবু। একটা পুরো অপ্রকাশিত কবিতা আমাকে দিয়ে দিলেন।’ তারপর তুমি রাগ দেখিয়েছিলে, তপতী। বলেছিলে, ‘আপনার জন্মদিনে আমাকে এইভাবে বিপদে ফেললেন কেন? কিছু উপহার নিয়ে আসবার সুযোগ দিলেন না!’ ”

তপতী বললো, “তোমার অসহায় অবস্থাটা তখন বেশ হয়েছিল। আমার মায়া হচ্ছিলো, যখন তুমি বললে, ‘জন্মদিনের খবরটা শুধু আপনাকেই দেবো ঠিক করে রেখেছিলাম। শ্রীময়ী ও সমর যেন না জানতে পারে।’ ”

সোমনাথ একটুও ভোলেনি। তপতীকে বললো, “তুমি রাজী হয়ে গেলে, আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তুমি যখন বললে, ‘জন্মদিনে অভিনন্দন জানাতে হয়, সোমবাবু! আপনি অনেক বড় হোন—অনেক নাম করুন। এবং মেনি হ্যাপি রিটারনস্ অফ দি ডে।’ জানো তপতী, সেই মুহূর্তে তোমাকে হঠাৎ ভীষণ ভালো লেগেছিল। একবার ভাবলুম, মনের এই আনন্দের কথা তোমাকে বলি। কিন্তু সাহস হলো না।”

তপতী চুপ করে রইলো। তারপর গম্ভীরভাবে বললো, “তোমার এই স্বভাবটাই তো আমাকে ভাবিয়ে তোলে সোম। তোমার আনন্দ, তোমার দুঃখ—কোনো কিছুতেই ভাগ বসাতে দাও না আমাকে।”

সোমনাথ কোনো উত্তর না দিয়ে চুপচাপ হাঁটতে লাগলো। দূরে সেই পরিচিত রেস্তরাঁটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ওখানকার দোতলায় বসেই একদিন ওরা অকস্মাৎ পরস্পরকে আবিষ্কার করেছিল।

সোমনাথ বললো, “মনে আছে তোমার? আমরা পশ্চিমদিকে কোণের টেবিলটা দখল করেছিলাম।”

সোমনাথ নিজের মনেই বললো, “বিরাট কাঁচের জানালার ভিতর দিয়ে গঙ্গার জল দেখা যাচ্ছিলো। আমি অস্ফুটভাবে উচ্চারণ করলাম, পতিত উদ্ধারিণী গঙ্গে। তুমি মুখ ফুটে কিছুই বললে না। শুধু অবাক হয়ে একবার আমার দিকে তাকালে। আমিও গঙ্গার শোভা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ মনে হলো, চোখের আলোয় দেখা হলো, এই প্রথম আমরা নিজেদের চিনলাম।”

তপতী গম্ভীরভাবে বললো, “তুমি তাহলে মনে রেখেছো? আমি ভাবছিলাম...” এবারে চুপ করে গেল তপতী।

“কী ভাবছিলে? বলো না তপতী।” সোমনাথ অনুরোধ করলো।

অভিমানিনী তপতী বলেই ফেললো, “আমি ভাবছিলাম—অতীতকে তুমি ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়েছো।”

সোমনাথ নির্বাক হয়ে রইলো। সে কী বলবে কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছে না।

স্নেহময়ী তপতী খুব মিষ্টি স্বরে জিজ্ঞাসা করলো, “রাগ করলে?”

“না, তপতী। রাগ করবো কেন?” সোমনাথ নার্ভাস হয়ে উঠছে। “জানো তপতী,”

সোমনাথ আবার কিছু বলবার চেষ্টা করলো।

"বলো," তপতী করুণভাবে অনুরোধ করলো।

"জীবনটাকে কিছুতেই গুছোতে পারলাম না।" সোমনাথ অকপটে স্বীকার করলো। তপতীর কাছে এসব বলতে তার লজ্জা লাগছে কিন্তু আজ কিছুই সে চেপে রাখবে না। "তুমি, বাবা, বউদি, দাদারা সবাই অধীর আগ্রহে আমার দিকে তাকিয়ে আছো—কিন্তু আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতেই পারছি না। তোমাদের সবাইকে আমি নিরাশ করছি। কোথাও নিশ্চয় আমার একটা সিরিয়াস দোষ আছে।"

তপতী এ-বিষয়ে মোটেই বিব্রত নয়। বললো, "তুমি বড্ড বেশি ভাবো সোম। অবশ্য তোমার মধ্যে কবিতা রয়েছে, তুমি ভাববেই তো! অনেকে একদম ভাবে না—না নিজের সম্বন্ধে না অপরের সম্বন্ধে।"

"তারা বেশ সুখে থাকে। তাই না?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো।

"তা হয়তো থাকে—কিন্তু তাদের আমার মোটেই ভালো লাগে না। দীপঙ্করের কথা বলেছিলে তুমি। ছেলেটা ঐ ধরনের। আই-এ-এস হতে পারে, কিন্তু নিজেকে নিয়েই সব সময় ব্যস্ত।"

সোমনাথ চুপচাপ রইলো। তারপর দূরে একটা নৌকার দিকে তাকিয়ে বললো, "তোমার মনে আছে? শ্রীময়ী এবং সমর আমাদের কী বিপদে ফেলেছিল? পৌনে একটার সময় রেস্তরাঁয় ফেরবার কথা—আমরা দুজনে হাঁ করে বসে আছি, ওরা এলো দেড়টার সময়। বকুনি দিতে ফিক করে হেসে সমর বললো, 'ঘড়িতে গোলমাল ছিল।' শ্রীময়ীর মুখেচোখেও কোনো বিরক্তির ভাব দেখা গেল না।"

তপতী নিজের ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। এখন সোয়া একটা। তপতী বললো, "একটা কথা বলবো? রাগ করবে না?"

"আগে শুনি কথাটা," সোমনাথ উত্তর দিলো।

"তোমাকে লাঞ্চে নেমন্তন্ন করছি।" তপতী বেশ ভয়ে ভয়ে বললো।

সোমনাথ আপত্তি করলো না। কিন্তু ওর মুখ কালো হয়ে উঠলো।

পশ্চিম দিকের সেই পরিচিত সীটটায় বসলো ওরা। কলেজের সেই পুরানো সোমনাথ কোথায় হারিয়ে গেছে। যে-সোমনাথ আজ তপতীর সামনে বসে রয়েছে সে প্রাণহীন নিষ্প্রভ। ঝকঝকে সুন্দর কবিতার ভাষায় যে কথা বলতে পারতো, সে এখন চুপচাপ বসে থাকে। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে মুখ খোলে না। অথচ একে কেন্দ্র করেই তপতীর সব স্বপ্ন গড়ে উঠেছে।

সোমনাথ এই মুহূর্তে প্রেমের মধ্যেও অর্থের বিষ দেখতে পাচ্ছে। এখানে এই গঙ্গার তীরে প্রিয় বান্ধবীকে নিয়ে বার-বার আসবে এমন স্বপ্ন সোমনাথ অবশ্য দেখেছিল। কিন্তু তাই বলে তপতী খরচা দেবার প্রস্তাব করবে এটা অকল্পনীয়।

তপতী বুঝতে পারছে হঠাৎ কোথাও ছন্দপতন হয়েছে। সে যা সহজভাবে নিয়েছে, সোমনাথ তা পারছে না।

"রাগ করলে?" তপতী জিজ্ঞেস করলো।

সোমনাথ প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলো। বললো, "না।"

সোমনাথ ভাবছে ১লা আষাঢ়ের সেই প্রথম আবিষ্কারের পর এই নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। ভাটার টানে সোমনাথ ক্রমশ পিছিয়ে পড়েছে আর তপতী জোয়ারের স্রোতে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। সেই সেদিন যখন প্রথম দেখা হলো তখন দুজনেই কলেজের প্রথম বছরের ছাত্রছাত্রী। সুদর্শন সোমনাথ সচ্ছল পরিবারের ভদ্র সন্তান। উপরন্তু সে কবি—সাধারণ মেয়ের সাধারণ দুঃখ থেকে জন-অরণ্যের মতো কবিতা লিখে ফেলতে পারে। আর তপতী সাধারণ একটা সুশ্রী শ্যামলী মেয়ে। স্বভাবে মধুর, কিন্তু এই বাংলায় নতুন। ভালো করে বাংলা উচ্চারণ করতে পারে না—কবিতা লেখা তো দূরের কথা। সোমনাথকে শ্রদ্ধা করতে পেরেছিল বলেই তো তপতী নিজের হৃদয়কে অমনভাবে দিয়েছিল।

কিন্তু তারপর? তপতী পড়াশোনায় ভালো করেছে। ছাত্রী হিসাবে নাম করেছে। আর

সোমনাথ অর্ডিনারি থেকে গেছে। তপতী অনেক নম্বর পেয়েছে, সোমনাথ কোনোরকমে ফেলের ফাঁড়া কাটিয়েছে। তপতী সুন্দর ইংরিজী লিখতে পারে, বলতে পারে আরও ভালো। সোমনাথ ইংরিজীর কোনো ব্যাপারেই তেমন সুবিধে করতে পারে না। সোমনাথ পাস কোর্সের বি-এ, তপতীর অনার্সে ভালো ফল পেতে কোনো অসুবিধে হয়নি। এরপর প্রিয় বান্ধবীর সঙ্গে সোমনাথ আর তাল রাখতে পারেনি। তপতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর এম-এ ডিগ্রিটা নিতান্ত সহজভাবেই সে ভ্যানিটি ব্যাগে পুরে ফেলেছে। সোমনাথ এই আড়াই বছর ধরে ডজন ডজন চাকরির আবেদন করেছে এবং সর্বত্র ব্যর্থ হয়েছে। এখন তপতী রায় রিসার্চ স্কলার। সোমনাথের কবি হবার স্বপ্ন কোন্‌কালে শুকিয়ে ঝরে পড়েছে। তার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কার্ডের নম্বর দু' লক্ষ দশ হাজার সতেরো।

এসব তপতীর যে অজ্ঞাত তা নয়। কিন্তু কোনো এক ১লা আষাঢ়ে সে যাকে আপন করে নিয়েছিল, হৃদয়ের স্বীকৃতি দিয়েছিল, তাকে সে আজও অস্বীকার করেনি। সোমনাথের জীবনের পরবর্তী ঘটনামালার সঙ্গে তপতীর ভালোবাসার যেন কোনো সম্পর্ক নেই। তপতী এর মধ্যে আরও প্রস্ফুটিতা হয়েছে। ভারী সুন্দর দেখতে হয়েছে তপতী—ফার্স্ট ইয়ারে বরং এতোটা মনোহারিণী ছিল না সে।

সোমনাথ ভাবলো যৌবনের প্রথম প্রহরে অনেকে অনেক রকম আকর্ষণে মুগ্ধ হয়—ক্ষণিকের জন্য অযোগ্য কাউকে মন দিয়েও ফেলে। কিন্তু বুদ্ধিমতীরা সেইটাই শেষ কথা বলে মেনে নেবার নির্বুদ্ধিতা দেখায় না। সমরের সঙ্গে শ্রীময়ী তো কত ঘুরে বেড়িয়েছে। ইডেনে নির্জন প্যাগোডার ধারে ১লা আষাঢ়েই তো ওরা দুজনে ইচ্ছে করে দেড় ঘন্টা বসেছিল। চুম্বনেও আপত্তি করেনি শ্রীময়ী। তারপর সুপুরুষ সমরের হাত ধরে শ্রীময়ী তো কত দিন লেকের ধারে, বোটানিক্‌সে এবং ব্যান্ডেল চার্চের প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু যেমনি সমর পড়ায় পিছিয়ে পড়তে লাগলো, যেমনি বোঝা গেলো ওর ভবিষ্যৎ নেই, অমনি শ্রীময়ী ব্রেক কষেছে, আর বোকামি করেনি।

সোমনাথ ভাবলো, ভালোই করেছে শ্রীময়ী। নিজের মতামতের পুনর্বিবেচনার অধিকার প্রত্যেক মানুষের আছে। না হলে, শ্রীময়ী আজ কষ্ট পেতো—সিঁথির লাল রংয়ের জোরে অফিসার অশোক চ্যাটার্জির নতুন ফিয়াট গাড়িটায় অমন সুখে বসে থাকতে পারতো না।

শুধু শ্রীময়ী কেন? কলেজের কত মেয়ে তো ক্লাসের কত ছেলের সঙ্গে ভাব করেছে, একসঙ্গে সিনেমা থিয়েটার দেখেছে, অন্ধকারে অধৈর্য বন্ধুদের একটু-আধটু দৈহিক প্রশ্রয় দিয়েছে। অরবিন্দর মতো যেসব ছেলে চাকরি পেয়েছে, তারা বান্ধবীদের গলায় মালা পরাতে পেরেছে। বাকি সব সঙ্গিনী কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। যার জীবনসঙ্গিনী হবার অভিলাষ ছিল তাকেই এখন পথে দেখলে মেয়েরা চিনতে পারে না। বেকারদের সঙ্গে প্রেম করবার মতো বিলাসিতা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের নেই। তাদের আর্থিক নিরাপত্তা চাই। নিজের বোন থাকলেও সোমনাথ তাই খুঁজতো।

"তুমি ভীষণ রেগে গেছ, মনে হচ্ছে। একটাও কথা বলছো না," আবার অভিযোগ করলো তপতী।

ছোট ছেলের মতো হাসলো সোমনাথ। ওর হাসিটা তপতীর খুব ভালো লাগে। সে বলেই ফেললো, "তোমার হাসিটা ঠিক একরকম আছে, সোম। খুব কম লোক এমনভাবে হাসতে পারে।"

"হাসি দিয়ে মানুষকে বিচার করা আজকের যুগে নিরাপদ নয়, তপতী," সোমনাথ হাসি চাপবার চেষ্টা করলো।

"যারা মানুষ ভালো নয়, তারা এমন হাসতে পারে না!" সোমনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে সপ্রতিভভাবে তপতী উত্তর দিলো। এই সহজ নির্মল হাসি দেখে বহু সহপাঠীর ভিড়ের মধ্যে সোমনাথকে তপতী খুঁজে পেয়েছিল।

খাবারের অর্ডার দিয়েছে তপতী। সোমনাথ কী খেতে ভালোবাসে সে জানে।

খেতে খেতে সোমনাথ বললো, "খুব ঝগড়া করবে বলেছিলে যে?"

হেসে ফেললো তপতী। "করবোই তো। কিন্তু খাওয়ার সময় ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই।"

"পারমিশন দিচ্ছি," সোমনাথ বললো।

এবার তপতী বললো, "সোম, তুমি আমাকে এমনভাবে দূরে সরিয়ে রাখছো কেন?" অনেক কষ্ট করে তপতী যে কথাগুলো বলছে তা সোমনাথের বুঝতে বাকী রইলো না।

মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে রইলো সোমনাথ। তারপর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, "আমি যেসবের যোগ্য নই তুমি অকাতরে তাই আমাকে দিয়েছো, তপতী। কিন্তু আমি অমানুষ নই। তোমার ক্ষতি করতে পারবো না।"

শান্ত তপতী গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কারও সঙ্গে কথা বললে, চিঠি লিখলে, দেখা করলে, বুঝি তার ক্ষতি করা হয়?"

"আমাদের এই দেশে মেয়েদের ক্ষেত্রে হয় তপতী। তোমার কোনো ভালো করতে পারিনি, তোমার যোগ্য করে নিজেকে তৈরিও করতে পারিনি—কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎটা নষ্ট করবো না," সোমনাথের গলা বোধহয় একটু কেঁপে উঠলো।

তপতী কিন্তু সহজভাবে সোমনাথের দিকে তাকালো। তারপর প্রশ্ন করলো, "মেয়েরা যে ছেলেদের সমান, এটা তুমি স্বীকার করো সোম?"

"ওরে বাবা! অবশ্যই করি। সংবিধানসম্মত অধিকার, স্বীকার না করে উপায় আছে? সামনেই হাইকোর্ট।" দূরে কলকাতা হাইকোর্টের চুড়োটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে।

তপতী বললো, "তাহলে আমাকে নাবালিকা ভাবছো কেন? তুমি তো আমার কাছে কিছুই চেপে রাখোনি।"

"আমার নিজের কনসেন্স তো চেপে রাখতে পারি না, তপতী। আমার সম্মান নেই, চাকরি নেই—তোমার সব আছে।"

তপতী জিজ্ঞেস করলো, "তাহলে আমার নিজের কোনো অধিকার নেই? আমার কাকে পছন্দ করা উচিত তা আমি ঠিক করতে পারবো না? চাকরি ছাড়া পুরুষ মানষের অন্য কিছুই মেয়েরা ভালোবাসতে পারবে না? বিদেশে তো এমন হয় না। ইংলন্ড আমেরিকায় তো কত মেয়ে চাকরি করে স্বামীকে পড়ায়—নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে।"

গম্ভীর হয়ে উঠলো সোমনাথ। বললো, "তুমি এবং আমি বিদেশে জন্মালে বেশ হতো তপতী।"

তপতীর মনোবলের অভাব নেই। বললো, "যেখানেই জন্মাই—যা মন চায় তা করবোই।"

চুপ করে রইলো সোমনাথ। সে ভাবছে, বিদেশে জন্মালে, কোনো সমস্যাই থাকতো না—সেখানে কেউ এমনভাবে বেকার বসে থাকে না।

"কী ভাবছো?" তপতী জিজ্ঞেস করলো।

বিষণ্ণ অথচ শান্ত সোমনাথ বললো, "তুমি দিচ্ছো বলেই যদি আমি গ্রহণ করি তাহলে কেউ আমাকে ক্ষমা করবে না, তপতী। ভাববে জেনেশুনে এই বেকার-বাউন্ডুলে একটা শিক্ষিত সুন্দরী সরল মেয়ের সর্বনাশ করেছে। জানো তপতী, আড়াই বছর দোরে-দোরে চাকরি ভিক্ষে করে দুনিয়ার কাছে ছোট হয়ে গেছি—কিন্তু এখনও নিজের কাছে ছোট হইনি। নিজের কাছে ছোট হতে আমার ভীষণ ভয় লাগে।"

তপতী কিছু না বলেই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মেয়েরা অনেক বড় বড় ব্যাপারে কত সহজে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে—ছেলেরা পারে না, তাদের মধ্যে কত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে যায়।

সোমনাথ বললো, "তুমি এবং কমলা বউদি হয়তো বিশ্বাস করবে না—কিন্তু আজকাল মাঝে মাঝে ভয় হয়, শেষ পর্যন্ত আমি নিজের কাছে যেন ছোট না হয়ে যাই।"

বেয়ারা বিল দিয়ে গেলো। সোমনাথ বিলটা নিতে গেলে, তপতী অকস্মাৎ ওর হাতটা চেপে ধরলো। এই প্রথম তপতীর উষ্ণ অঙ্গের কোমল স্পর্শ পেলো সোমনাথ। ঘন সান্নিধ্যের এক অনাস্বাদিত শিহরণ মুহূর্তের জন্য অনুভব করেও পরমুহূর্তে সে হাত ছাড়িয়ে নিলো। সোমনাথের মনে হলো নিজের কাছে সে এবার সত্যিই ছোট হয়ে যাচ্ছে।

তপতী গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলো, "তোমাকে নিয়ে এলো কে?"

সোমনাথ বললো, "সব জিনিসের একটা নিয়ম আছে, তপতী। ছেলেদের ছোট করতে নেই।"

তপতী বললো, "প্লিজ সোমনাথ। আমার কথা শোনো। আজ প্রথম ইউ-জি-সি স্কলারশিপের আড়াইশ' টাকা পেলাম। আমার অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল প্রথম মাসের টাকা পেয়ে তোমার কাছে আসবো।"

তপতী এবার কোনো কথা শুনলো না। বিলের টাকাটা মিটিয়ে সে বেরিয়ে এলো।

বাস স্টপের দিকে হাঁটতে হাঁটতে সোমনাথ বললো, "তুমি বিশ্বাস করলে না। আমার কাছে টাকা ছিল। আজ হঠাৎ দেড়শ' টাকা রোজগার হয়ে গেলো।"

তপতী বললো, "এই তো শুরু। আমি জানি, বিজনেসে তুমি অনেক টাকা রোজগার করবে। এবং তখন..."

কথাটা শেষ করছে না তপতী। ইতিমধ্যে তপতীর বাস এসে গেছে—সে ভবানীপুরে যাবে। সোমনাথ ফিরে যাবে অফিসে।

বাসে তপতীকে তুলতে তুলতেই সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো, "তখন?"

"তখন কোনো কথাই শুনবো না—সারাজীবন তোমার অন্ন খাবো।"

তপতীর শেষ কথাগুলো অসংখ্য বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে এক অনির্বচনীয় সুরের ঝঙ্কারে সোমনাথের কানে এখনও বাজছে। সোমনাথকে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে। সংসারে পরগাছা হয়ে সোমনাথ কিছুতেই আর সময়ের অপচয় করবে না।

◆

বিকেলবেলায় মিস্টার মাওজীর সঙ্গে সোমনাথের দেখা করার কথা আছে। মাওজীরা নানারকম কেমিক্যালের ব্যবসা করেন। আদকবাবুই এদের খবর দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "ভীষণ ভদ্দরলোক, বোম্বাই মুসলমান এঁরা। আপনার ব্রীজবাবুর মতো শুধু নিজের আত্মীয়কুটুম্ব এবং গাঁয়ের লোকদের কোলে ঝোল টানেন না। মুখুজ্যে, চাটুজ্যে, হাজরা, দাস, বোসদের সঙ্গেও এঁরা সম্পর্ক রাখেন—লাভের সবটাই দেশে পাঠাবার জন্যে এঁরা উঁচিয়ে বসে নেই।"

মাওজীদের সঙ্গে এরমধ্যে কয়েকবার দেখা করে এসেছে সোমনাথ। ওঁরা একেবারে বিদায় দেননি। সোমনাথকে একটু বাজিয়ে দেখেছেন। দু-একটা অফিস থেকে খবরাখবর আনতে বলেছেন। সোমনাথ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। দু-একটা ভালো খবরও এনেছে।

মিস্টার মাওজী আজ জিজ্ঞেস করলেন, "কাজকর্ম কেমন হচ্ছে, মিস্টার বনার্জি?"

এ-পাড়ার অভিজ্ঞতা থেকে সোমনাথ জেনেছে, কখনও বলতে নেই যে কিছুই হচ্ছে না। তাতে পার্টির ভরসা কমে যায়, ভাবে লোকটার দ্বারা কিছু হবে না। তাই ব্যবসায়িক কায়দায় সোমনাথ বলে, "আপনাদের শুভেচ্ছায় চলে যাচ্ছে।"

মাওজী জিজ্ঞেস করলেন, "এখন কোন্ লাইনে কাজ করছেন?"

কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না সোমনাথ। কোথায় সায়েব বাড়ি ভাঙা হচ্ছে, এই খোঁজখবর করছে বললে মিস্টার মাওজী নিশ্চয় ইম্প্রেস্ড হবেন না। হঠাৎ খাম এবং কাগজের কথা

মনে পড়ে গেলো। বললো, "পেপার, স্টেশনারি এই সব অফিস সাপ্লাইয়ের দিকে জোর দিচ্ছি।"

মাওজী বললেন, "ওসব লাইনে তো বেজায় ভিড়। ওখানে খুব সুবিধে হবে কী?"

"অফিস-টফিসে হায়ার লেভেলে কিছু জানাশোনা আছে, কোনোরকমে চালিয়ে দিচ্ছি।" সোমনাথ বেশ সুন্দর অভিনয় করলো। মাওজী যদি জানতে পারেন—গত ক'মাসে সে সর্বসমেত তিরিশ এবং দেড়শ' টাকা রোজগার করেছে!

"কাজ বাড়িয়ে যান," মিস্টার মাওজী বললেন। "বিজনেস এমন জিনিস যে দাঁড়িয়ে থাকাটাই মৃত্যু। সব সময় এগিয়ে যেতে হবে।"

কী ধরনের উত্তর দেওয়া উচিত সোমনাথ বুঝতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত বললো, "বুঝতেই পারছেন—ক্যাপিটালের অভাব। টাকা না হলে ব্যবসা হয় না। সরকারী ব্যাঙ্কগুলো বলছে পয়সা আমরা দেবো। কিন্তু কেবল নাম-কা-ওয়াস্তে। ওদের কাছে টাকা নিয়ে তো ক্যাপিটেল বাড়ানো যায় না।"

এমন সময় মাওজীদের আর এক ভাই ঘরে ঢুকলেন। সিনিয়র মিস্টার মাওজী এবার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। জুনিয়র মাওজী সোমনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনাকে তো দেখেছি মনে হচ্ছে।"

"কোথায় বলুন তো?" স্ট্র্যান্ড রোডের রেস্তরাঁয় লোকটা এতোক্ষণ বসেছিল না তো? সোমনাথের একটু চিন্তা হলো।

মাওজী বললেন, "এবার মনে পড়েছে। লেকের ধারে। একটা অ্যামবাসাডার গাড়ি চালাচ্ছিলেন আপনি। সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা ছিলেন। আপনারা কোকাকোলা খেলেন। আমরাও ওই দোকানে কোক খাচ্ছিলাম।"

সিনিয়র মাওজী ধরে নিলেন সোমনাথের গাড়ি আছে। তিনি বললেন, "যা বলছিলুম, মিস্টার বনার্জি। নজরটা উঁচু করুন। আপনার গাড়ি রয়েছে, জানাশোনা কোম্পানি রয়েছে অনেক—আপনি বড়-বড় কাজ ধরবার চেষ্টা করুন। টাকার জন্যে ভাববেন না। টাকার কোনো দরকার নেই। আপনি শুধু অর্ডার বুক করবেন। কোম্পানি সোজা মাল পাঠিয়ে দেবে—আপনি কমিশন পেয়ে যাবেন।"

মিস্টার মাওজী যে কী বলছেন সোমনাথ বুঝতে পারছে না।

মাওজী বললেন, "আমাদের কয়েকজন আত্মীয় বোম্বাইতে একটা কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি খুলেছে। কয়েকটা প্রোডাক্ট আমরা নিজেরাই বাজারে চালাচ্ছি। আপনি একটু বসুন—আমার কাজিন বোম্বাই থেকে এসেছে, এখনই দেখা হয়ে যাবে।"

মিস্টার মাওজীর কাজিন একটু পরেই এলেন। সব শুনে বললেন, "আপনাকে একটা সুযোগ দিতে পারি আমি। আমাদের নতুন মাল কয়েকটা জায়গায় চালু করবার চেষ্টা করে দেখুন। আপনার কোনো আর্থিক দায়িত্ব নেই। সোজা এখানে অর্ডার পাঠিয়ে দেবেন। তারপর যদি ভালো কাজ দেখাতে পারেন—আপনার ফিউচার ব্রাইট। আমরা আপনাকে এজেন্সি দিয়ে দেবো। কমিশন পাবেন।"

বেশ উত্তেজনা বোধ করছে সোমনাথ। আদকবাবু বললেন, "দেখুন যদি আপনার কিছু হয়। ও-ঘরে মিস্টার সিংঘী তো বোম্বাই-এর ভালো একটা কোম্পানির এজেন্সি রেখেছেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মাসে বারোশ' টাকা রোজগার করছেন।"

সুতরাং বলা যায় না—হয়তো এবার সত্যিই সোমনাথ ব্যানার্জির ভাগ্য খুলবে।

বউদি এদিকে অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। বলছেন, "বাবাকে আর চেপে রেখে লাভ কী?"

সোমনাথ বললো, "দাঁড়ান, আগে একটু আশার আলো দেখি। এখনও পর্যন্ত তো আপনার দেওয়া পয়সাতেই টিফিন সারছি।"

সোমনাথ ঠিক করেছিল কাউকে বলবে না। কিন্তু বউদির কাছে চাপতে পারলো না সোমনাথ। "বউদি, যা দেখছি, বড় জায়গায় বড় টোপ ফেলতে হয়। নোংরা জামা-কাপড় পরে বাসে-ট্রামে ঝুলে পারচেজ অফিসারদের কাছে গেলে কাজ হয় না। দু-একদিন যদি গাড়িটা বার করবার দরকার হয়?"

"এতো বলবার কী আছে?" বউদি ভেবে পান না। "তা ছাড়া তোমার দাদা এখানে নেই। মাঝে মাঝে গাড়িটা বার করলে বরং ভালোই হবে। তুমি আমার কাছে পেট্রলের দাম নিয়ে নেবে।"

তেলের দাম দরকার হবে না। এখনও নগদ দেড়শ' টাকা পকেটে রয়েছে। মাছের তেলেই মাছ ভাজবে সোমনাথ।

◆

কিন্তু সোমনাথের ভাগ্যটা নিতান্তই পোড়া। নতুন কেমিক্যালসের নমুনা এবং চিঠিপত্তর নিয়ে কাছাকাছি চার-পাঁচ জায়গায় দেখা করলো সোমনাথ। সবাই টেলিফোন নম্বর পর্যন্ত লিখে নিলো। সোমনাথ প্রতিদিন সেনাপতির কাছে জানতে চায় কোনো ফোন এসেছিল কিনা। সেনাপতি বলে, "কোথায় আপনার ফোন?"

ফোন আসে অনেক। কিন্তু সবই সুধাকর শর্মার। সুধাকর শর্মা কাজের চাপে হিমসিম খেয়ে যান।

অত কাজের মধ্যেও বিকেলের দিকে যার সঙ্গে টেলিফোনে সুধাকরবাবু কথা বলেন তাঁর নাম নটবর মিত্তির।

কয়েকবার নটবরবাবুকে দেখেছে সোমনাথ। সুধাকর শর্মা ওঁকে সঙ্গে নিয়ে আড়ালে চলে যান। দুজনে কী সব গোপন কথাবার্তা হয়।

এই বন্ধুহীন জগতে এখন আদকবাবুই একমাত্র সোমনাথের ভরসা। বিশুবাবু যে কোথায় উধাও হয়েছেন কেউ জানে না। সেনাপতির ধারণা, তিনি এক ফ্রেন্ডের সঙ্গে বিজনেস-কাম-প্লেজার ট্রিপে বেরিয়েছেন—গাড়িতে বিহার এবং উড়িষ্যা ঘুরবেন। বিশুবাবু থাকলে দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা যেতো।

আদকবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী ভাবছেন অতো, মিস্টার ব্যানার্জি।"

সোমনাথ বললো, "আপনি যদি না হাসেন, তাহলে একটা প্রশ্ন করি।"

"বলুন।" আদকবাবু সম্মতি দিলেন।

"আচ্ছা, একই ঘরে এতোগুলো লোক হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে আছে, অথচ সুধাকরবাবুর এতো কাজ কী করে হয়?"

হাসলেন আদকবাবু। তারপর বললেন, "কেন মিছে কথা বলবো : শ্রম। এই দুনিয়াতে কপালটা বিধাতাপুরুষ দেন—কিন্তু শ্রম পুরুষ মানুষের নিজস্ব।"

সেই সময় যে নটবরবাবু ওখানে এসে পড়েছেন কেউ লক্ষ্য করেনি। নটবরবাবুর সঙ্গে আদকবাবুর পরিচয় আছে। নটবরবাবুর গোলগাল চেহারা। বুশ শার্টের তলায় পাঁচ নম্বর ফুটবলের মতো একটি ভুঁড়ি রয়েছে। মাথার মধ্যিখানে তিন ইঞ্চি ব্যাসের গোল টাক পড়েছে। ওখানকার ক্ষতিপূরণ হয়েছে অন্যত্র। দুই কানে বেশ কিছু বাড়তি চুল ভদ্রলোকের।

নটবরবাবু হুংকার ছাড়লেন, "কী বললেন? ডাহা ভুল। ওসব ওয়ান্স-আপন-এ-টাইমের কথা বলে কেন এই ইয়ং ম্যানের টুয়েলভ-ও-ক্লক বাজাচ্ছেন? 'শ্রম' দিয়ে যদি কিছু হতো তাহলে কুলি এবং রিকশাওয়ালারাই কলকাতার সবচেয়ে বড়লোক হতো।"

সোমনাথ অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকালো। নটবর বললেন, "বিজনেসের একমাত্র কথা হলো পি-আর।"

"সেটা আবার কী জিনিস?" আদকবাবু বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

নটবর একগাল হেসে বললেন, "পাবলিক রিলেশন অর্থাৎ জনসংযোগ।"

সোমনাথ এখনও বোকার মতো তাকিয়ে আছে। নটবরবাবু বললেন, "এখনও বুঝতে পারলেন না? যেসব ক্ষমতাবান লোক আপনার কাছে মাল কিনবেন তাঁদের সঙ্গে আপনার সংযোগটা কি রকম তার ওপর নির্ভর করছে।"

সোমনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে অধৈর্য নটবর বললেন, "এখনও বুঝতে পারছেন না? অন্য জাতের ছেলেরা তো পেট থেকে পড়বার আগেই এই সব জেনে ফেলে।"

সুধাকরজী এখনও আসেননি। ওঁর টেবিলের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নটবর মিত্তির বললেন, "এই শর্মাজীকেই দেখুন না কেন। মাল খারাপ, ওজন কম, দাম বেশি। তবু শর্মাজী পটাপট অর্ডার পাচ্ছেন এই জনসংযোগের জোরে। আর আপনি ঐ সব কোম্পানিতেই কম দামে ভালো মাল অফার করুন। এক আউন্স কেমিক্যাল বিক্রি করতে পারবেন না। যদি-বা বিক্রি করতে পারেন, পেমেন্ট কিছুতেই পাবেন না। আট মাস ন' মাস পরে পয়সার অভাবে আপনি ব্যবসা ডকে তুলে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে যাবেন। অথচ ঠিক মতো জনসংযোগ করুন......"

কথায় বাধা পড়লো। সুধাকরজী এসে পড়লেন। নটবর মিত্তির বললেন, "ওঁর সঙ্গে জরুরী কথাবার্তা আছে। যদি এ-সব ব্যাপার শিখতে চান—আসবেন এই গরীবের কাছে।" এই বলে নিজের একখানা ভিজিটিং কার্ড সোমনাথের হাতে গুঁজে দিয়ে নটবর মিটার সামনের টেবিলে চলে গেলেন। দু' মিনিটের মধ্যে ওঁরা দুজনে আবার বেরিয়ে পড়লেন।

আদকবাবু এতোক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার বিরক্তভাবে বললেন, "লোকটা যেন কেমন ধরনের! সুধাকরবাবুর সঙ্গে গলায়-গলায়। আমার কিন্তু মোটেই ভালো লাগে না ওঁকে।"

কয়েক দিন পরে নটবর মিত্তিরের সঙ্গে রবীন্দ্র-সরণির ওপরেই দেখা হয়ে গেলো সোমনাথের। "ও মিস্টার ব্যানার্জি, শুনুন, শুনুন," নটবর মিত্তির সোমনাথকে ডাকলেন।

সোমনাথ নমস্কার করলো নটবরকে। মিস্টার মিটার জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন হচ্ছে বিজনেস?"

সোমনাথ কিছু চেপে রাখলো না। বললো, "কয়েকটা কাপড়ের কল এবং কাগজের কলে পারচেজ অফিসারদের সঙ্গে নিয়মিত দেখা করছি। ভালো দু-একটা কেমিক্যালস আছে।"

"কিছু হচ্ছে?" মিস্টার মিটার একগাল হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

"চেষ্টা করছি।" সোমনাথ বললো।

এবার হা-হা করে হেসে উঠলেন নটবর মিটার। "ওই চেষ্টাই করে যাবেন। আর আপনার নাকের ডগায় অর্ডার নিয়ে যাবে সুধাকর কোম্পানি!"

পকেট থেকে কৌটা বার করে নস্যি নিলেন নটবর মিটার। "আপনি সন অফ দি সয়েল তাই বলছি। না-হলে আমার কী? আপনি হোল লাইফ ধরে ভেরেন্ডা ফ্রাই করুন না, আমার কিছু এসে যাবে না। শুনুন মশাই, সোজা কথা—বড় বড় কোম্পানিরা আপনার কাছে মাল কিনবে না। তারা নামকরা কোম্পানির ঘর থেকে ডাইরেক্ট মাল নেবে। বিলিতী কোম্পানির কেমিক্যাল ছেড়ে তারা আপনার ওই মাওজী কোম্পানির মাল টাচ করবে না। ঠিক কিনা?"

সোমনাথকে একমত হতে হলো। নটবর মিটার বললেন, "তাহলে আপনাকে যেতে হবে মাঝারি এবং ছোট-ছোট কোম্পানিতে। ঠিক কিনা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," সোমনাথ বললো।

নটবর মিটার মিটমিট করে হেসে বললেন, "ছোট-খাট কোম্পানিগুলো সব এখন ইন্ডিয়ানদের হাতে। গেঁড়াকলের সুবিধার জন্যে মালিকরা নিজেদের ভাইপো-ভাগ্নে এবং গাঁয়ের লোকেদের এনে পারচেজ অফিসে বসিয়ে দিয়েছে। তারা মালিকদের সুবিধে দেখছে এবং সেই সঙ্গে নিজেদের সুবিধেও করছে।"

সোমনাথ চুপ করে আছে। নটবর মিটার বললেন, "সুতরাং আপনাকে বশীকরণ মন্তরটা আগে জানতে হবে, যেমন জানেন সুধাকরজী। আর না জানলে আমাদের মতো পাবলিক রিলেশন কনসালটেন্টদের কাছ থেকে শিখে নিতে হবে।"

নটবর মিটার বললেন, "ট্যাক্সি পাচ্ছি না বলেই আপনার এইভাবে সময় নষ্ট করতে পারছি। না হলে, অ্যাজ এ জনসংযোগ উপদেষ্টা আমি ভীষণ ব্যস্ত। অর্ডার সাপ্লাই লাইনে যারা পাকা লোক তারা জানে নটবর মিটারের দাম।"

নটবর মিটার আবার নস্যি নিলেন। বললেন, "যাকগে ওসব বাজে কথা—নিজের প্রশংসা নিজের মুখে মানায় না। আপনি পারচেজ দেবতাদের সন্তুষ্ট করবার মন্তর শিখুন। সুধাকর-বাবু একটা সুন্দর কথা বলেন—যতক্ষণ না অফিসারের সঙ্গে ক্যাশের ব্যবস্থা হলো ততক্ষণ দুশ্চিন্তা থেকে যায়। যেমনি বুঝলাম, মাল খায়, টাকা নেয়, আর ভাবনা থাকে না। ঘরটা আমার পাকাপাকি হবার চান্স রইলো। নিজের স্বার্থেই অফিসার আমার স্বার্থটা দেখবেন।"

সোমনাথের এসব কথা মোটেই ভালো লাগছে না। সে বললো, "নিজেকে ছোট করে কী লাভ, মিস্টার মিটার?"

আঁতকে উঠলেন নটবর মিটার। "ওরে বাবা! এ যে ফিজিক্সের কথা তুলে ফেললেন। স্যরি, ফিজিক্স নয়—ফিলজফি। এখানে মশাই, কেউ ফিলজফি করতে আসে না—টু-পাইস কামাতে আসে। তা ছাড়া আপনি নিজেকে ছোট করবেন কেন? প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তো দেবতা আছেন—গ্রেট বিবেকানন্দ সোয়ামী বলে গেছেন। মনে করুন, আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণের সেবা করছেন, হোক না সে পারচেজ অফিসার।"

নটবর মিত্তির ঘড়ির দিকে তাকালেন। বললেন, "না মশাই, ট্যাক্সি পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। আমি ট্রামে উঠে পড়বো এবার। তবে শুনে রাখুন—জাত সেলসম্যানের কাছে প্রত্যেক খদ্দের একটা চ্যালেঞ্জ! পৃথিবীতে এমন লোক জন্মায়নি যার দুর্বলতা নেই। বাইরে থেকে মনে হবে দুর্ভেদ্য দুর্গ, কিন্তু খোঁজ করলে দেখা যাবে কোথাও একটা দরজা খোলা আছে। আমার নেশা হলো, মানুষের এই ভেজানো দরজা খুঁজে বার করা। খুউব ভালো লাগে! আপনি মশাই, ফিলজফি-টফি ভুলে যান—মন দিয়ে জনসংযোগ করুন।"

সোমনাথ গম্ভীর হয়ে হাঁটতে লাগলো। চিৎপুর রোড থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ডালহৌসি স্কোয়ারে এসে হঠাৎ হীরালাল সাহার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। ভদ্রলোক হাঁ করে রাইটার্স বিল্ডিংসের দিকে তাকিয়ে আছেন। ওঁর চোখে যে ছোটছেলের লোভ রয়েছে তা সোমনাথও বুঝতে পারছে। ধরা পড়ে গিয়ে হীরালালবাবু লজ্জা পেলেন। মুখে হাসি ফোটাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বললেন, "আপনাকে সত্যি বলছি, এই ভাঙা বাড়ির বিজনেস করে আমার অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে। কোনো পুরানো বাড়ি দেখলেই হিসেব করতে ইচ্ছে হয় ভাঙলে কত কাঠ, কত লোহা, কত পাথর পাওয়া যাবে। কখন কোটেশন দিতে হয় কিছুই ঠিক নেই তো।"

"তা বলে আপনি এই রাইটার্স বিল্ডিংস-এর দিকে তাকাবেন?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করে।

হীরালালবাবু রেগে উঠলেন। "কেন? অন্যায়টা কী মশাই? চিরকাল তো আর এ-বাড়ি থাকবে না। একদিন না একদিন ভাঙতে হবেই।" হীরালালবাবু বললেন, "সায়েব বাড়ি বলেই আমার আগ্রহ। ইন্ডিয়ান আমলে রাইটার্স বিল্ডিং তৈরি হলে আমি সময় নষ্ট করতুম না। স্বাধীনতার পরে যেসব দেশলাই বাক্সের মতো নতুন বাড়ি হয়েছে আমি তো সেদিকে তাকিয়েও দেখি না। জানেন মিস্টার ব্যানার্জি, ভবিষ্যতে যাঁরা আমাদের এই বাড়িভাঙা লাইনে আসবে তারা একেবারে পথে বসবে। হাল আমলের বাড়িগুলোতে কিস্সু নেই। সায়েব বাড়িগুলো খতম হলেই কলকাতা খতম হয়ে গেলো।"

হীরালালবাবু তারপর বললেন, "এলগিন রোডের বাড়িটায় হাজার দুয়েক টাকা ঢালবেন নাকি? চার-পাঁচ দিনের মধ্যে লাভ পেয়ে যাবেন। আমার কিছু টাকা কমতি পড়েছে। ভাবলুম —কেন পাগড়ি পরা গুড়ের নাগরীগুলোর কাছে হাত পাতি। আপনি লোকাল লোক রয়েছেন।"

◆

কমলা বউদি একবারও প্রশ্ন করলেন না। ব্যাঙ্কের চেকবইটা বার করে সোমনাথের হাতে দিলেন। বললেন, "তুমি যখন ব্যবসায় ঢালছো, আমি ভেবে দেখবার কে?"

ব্যাঙ্ক থেকে তুলে টাকাটা হীরালালবাবুর হাতে দিয়েছে সোমনাথ। উনি সঙ্গে সঙ্গে রসিদ লিখে দিলেন। বললেন, "আমার মনে হয় অন্তত হাজার টাকা লাভ পেয়ে যাবেন। চার দিনের জন্যে দু-হাজার টাকা লাগিয়ে হাজার টাকা পকেটে এলে মন্দ কী? কোনো বিজনেসে এমন প্রফিট পাবেন না।"

সোমনাথের মনে হচ্ছে এবার মেঘ কাটছে। নটবরবাবুর কথাগুলো থেকেও সে কিছু শেখবার চেষ্টা করেছে। অসৎ পথে যাবে না সোমনাথ। কিন্তু মানুষের বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করতে হবে—না হলে সত্যিই তাঁরা কেন অর্ডার দেবেন?

সোমনাথের সাহসও বেড়ে যাচ্ছে। ক'দিন আগেই এক কাপড়ের মিলে গিয়েছিল। ওখানকার মিস্টার সেনগুপ্ত বললেন, "আপনার কোম্পানির দুটো স্যাম্পল টেস্টিং-এ পাঠিয়েছি—এখনও রিপোর্ট আসেনি। তবে মশাই—বড় বড় কোম্পানির একই জিনিস রয়েছে, মালও ভেসে যাচ্ছে। আবার আপনারা একই লাইনে ঢুকতে গেলেন কেন?"

অন্যসময় হলে সোমনাথ মাথা নিচু করে চলে আসতো। কিন্তু এখন বললো, বড়-বড়রা তো সব সময়েই থাকবেন, স্যর। বম্বেতে অত বিরাট বিরাট কাপড়ের কল থাকা সত্ত্বেও আপনারা তো একদিন সাহস করে এখানে কল বসিয়েছিলেন—এবং এতো নাম করেছেন।"

"বাঃ বেশ ভালো বলেছেন! কথাটা আমার মাথাতেই আসেনি। সত্যি তো, কোথায় আর খোলা মাঠ পড়ে রয়েছে? রুই-কাতলা থাকা সত্ত্বেও চুনোপুঁটিরা সাহস করে ঢুকে পড়ছে—এবং যোগ্যতা দেখিয়ে আমাদের কোম্পানির মতো বড় হচ্ছে।" মিস্টার সেনগুপ্ত বেশ খুশী হলেন।

সোমনাথকে তিনি বসতে দিলেন। তারপর বললেন, "আপনি ইয়ং বেঙ্গলী—আপনাকে সোজা বলছি—আমাকে ধরে কিছু হবে না। আমার ডিরেকটর মিস্টার গোয়েংকার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।"

সোমনাথ বললো, "গোয়েঙ্কাজী মস্ত লোক, উনি কি আমার মতো চুনোপুঁটিকে পাত্তা দেবেন?"

সেনগুপ্ত বললেন, "উনি নিজে মস্ত লোক নন—ওঁর শ্বশুর মিস্টার কেজরিওয়াল মস্ত লোক। ওঁদেরই মিল—গোয়েংকাজীকে বছর কয়েক হলো বড় পোস্টে বসিয়ে দিয়েছেন। আপনি চেষ্টা করুন—আপনার জিনিসটা আমাদের মিলে অনেক প্রয়োজন হয়। তাছাড়া কেজরিওয়ালদের আর একটা মিলের মালপত্র গোয়েংকাজী কেনেন।"

গোয়েঙ্কা লোকটি সুদর্শন। এয়ারকুলার লাগানো ঘরে পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবি ও ধুতি পরে তিনি বসে আছেন। পাকা মর্তমান কলার মতো গায়ের রং, টিয়াপাখির মতো টিকলো নাক। ভদ্রলোকের দেহে বাড়তি মেদ নেই—বরং একটু রোগার দিকেই। বয়স বছর চল্লিশ।

ওঁর সঙ্গে সোমনাথের দেখা হয়ে গেলো। ঘরের একদিকে একটা কালো রোগা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ে-টাইপিস্ট নিজের কাজ করছে। সোমনাথ বললো, "আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করবো না, স্যর। শুধু রেসপেক্ট জানাতে এসেছি।"

টেলিফোনে সেনগুপ্তের কাছে বিষয়টা শুনেছেন গোয়েঙ্কাজী! গালের পান সামলাতে সামলাতে বললেন, "মালের রিপোর্ট কী রকম হয় দেখা যাক।"

কেমিক্যালসের ধারেই গেলো না সোমনাথ। বললো, "ওসব আপনার হাতে রইলো, মিস্টার গোয়েঙ্কা। আপনার এতো নাম শুনেছি।"

"কোথায় আমার নাম শুনলেন?" বেশ খুশী হয়ে গোয়েংকা প্রশ্ন করলেন। দামী ফরাসী সেন্টের গন্ধে ঘরটা ভুরভুর করছে।

সোমনাথ বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো! তারপর কোনোরকমে বললো, "আপনার নাম কে না জানে? ভালো জিনিসের কদর দেন আপনি—অজানা কোম্পানির নতুন মাল বলে ছুঁড়ে ফেলে দেন না। তাই তো কলকাতা থেকে ছুটে আসতে সাহস পেয়েছি।"

গোয়েঙ্কাজীর দিকে দামী সিগারেট এগিয়ে দিলো সোমনাথ। উনি একটা সিগারেট তুলে নিলেন। পানের ঢিবিটা বাঁদিক থেকে গালের ডানদিকে ট্রান্সফার করলেন। তারপর বললেন, "কলকাতা থেকে দূরত্বটাই আমাদের মুশকিল।"

"এমন কি আর দূর, মিস্টার গোয়েংকা? ফরেনে চল্লিশ মাইল কিছু নয়!" সোমনাথ এতোক্ষণে একটা আলোচনার বিষয় পেয়েছে।

"কিন্তু রাস্তার যা-অবস্থা। এইটুকু পথ যেতেই সমস্ত দিন নষ্ট হয়ে যাবে," মিস্টার গোয়েঙ্কা বললেন।

"অথচ মিউনিসিপ্যালিটি এবং গভরমেন্ট রাস্তা মেরামতের জন্যে আপনাদের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করছে।" সোমনাথ বললো।

"সে-সব টাকা যে কোথায় যায়? গোড্ এলোন নোজ্।" সোমনাথের সহানুভূতিতে মিস্টার গোয়েঙ্কা যে সন্তুষ্ট হয়েছেন তা ওঁর কথার ভঙ্গীতেই বোঝা যাচ্ছে।

সুযোগ বুঝে সোমনাথ এবার কড়া ডোজে গোয়েঙ্কাজীর প্রশংসা করলো। বললো, "এরকম সাজানো-গোছানো অফিস কিন্তু কলকাতাতেও বেশি নেই। এই অফিসের সর্বত্র আপনার সুরুচির পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে।"

গোয়েঙ্কাজী প্রশংসায় নরম হয়েছেন মনে হলো। তবে প্রথম দর্শনেই সোমনাথকে তিনি যে পুরোপুরি বিশ্বাস করছেন না, তাও আন্দাজ করতে সোমনাথের কষ্ট হলো না। সোমনাথ আর এগুলো না। শুধু জিজ্ঞেস করলো, "একা-একা গাড়িতে কলকাতা ফিরছি—এখান থেকে কেউ যাবেন নাকি?"

গোয়েঙ্কাজী প্রথমে ইতস্তত করলেন। বাড়িতে গিন্নির সঙ্গে ফোনে কথা বললেন। তারপর নিবেদন করলেন, "আমার ওয়াইফের পিসীমার এক ঝি এখানে পড়ে রয়েছে। বেচারা একলা যেতে পারবে না। আমারও নিয়ে যাবার সময় হচ্ছে না। যদি একটু চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুতে শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে দেন।"

খুব উৎসাহের সঙ্গে রাজী হয়ে গেলো সোমনাথ। সুপুষ্ট স্তনের অধিকারিণী অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান যুবতীর আফিসিক ভদ্রতাবোধ একটু কম। চিঠি ছাপানো বন্ধ রেখে আলপিন দিয়ে নখের ময়লা পরিষ্কার করতে করতে মেয়েটি ওদের কথাবার্তা শুনছিল। সে এবার উৎসাহিত হয়ে উঠলো। তার কলকাতা যাবার প্রয়োজন। মৃদু হেসে মিস্টার গোয়েঙ্কা রাজী হয়ে গেলেন।

গাড়ি চালিয়ে ফিরতে ফিরতে সোমনাথের মনে হলো সে যেন থিয়েটারের রাজা সেজেছে। একটা সামান্য কেরানির চাকরি পেলে যে বর্তে যায়, পেটের দায়ে সে কেমন অন্যের গাড়ি নিয়ে থার্ড পার্টিকে লিফট দিচ্ছে। পিছনে গোয়েঙ্কাজীর শ্বশুরবাড়ির বুড়ি ঝি বসে আছেন। সোমনাথের পক্ষে তিনিই অসামান্যা—কারণ গোয়েঙ্কার সঙ্গে পরিচয়ের যোগসূত্র।

সোমনাথের পাশে বসেছে মিস জুডিথ জেকব। মহিলার দেহ থেকে সস্তা দেশী সেন্টের উগ্র গন্ধ ভকভক করে ভেসে আসছে। মুক্তোর মতো ঝকঝকে দাঁতগুলো বার করে মিস জেকব বললো, "তুমি তো খুব স্টেডি ড্রাইভ করো।" সোমনাথ রাস্তার দিকে মনোযোগ রেখে মিটমিট করে হাসলো। মিস জেকব বললো, "তোমার জন্যে আমার ফিঁয়াসের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।" হুড়-হুড় করে ব্যক্তিগত অনেক খবরাখবর দিয়ে যাচ্ছে মিস জেকব। ফিঁয়াসে

কোন এক কোম্পানিতে উই মারার কাজ করে। তার ফ্ল্যাটের বাড়তি চাবি মিস জেকবের কাছে আছে। যখন খুশী সে ভাবী স্বামীর ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকতে পারে, কোনো অসুবিধে নেই। আরও কী সব বলতে যাচ্ছিলো মিস জেকব, কিন্তু সোমনাথের আগ্রহ নেই সেসব শোনবার।

গাড়ি চালাতে চালাতে সোমনাথ অন্য কথা ভাবছিল। নটবরবাবুর মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে। নটবরবাবু মানুষকে মোটেই বিশ্বাস করেন না।

নটবর বলেছিলেন, "সব মানুষের কোনো-না-কোনো দুর্বলতা আছে। টাকা এবং মদে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট বিজনেস ম্যানেজ হয়ে যায়। কিন্তু একবার মশাই ভীষণ বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম। ওই সুধাকর শর্মাই কেসটা দিলো। বললো, 'দাদা, ভীষণ শক্ত ঠাঁই, কিছুতেই সুবিধে করতে পারছি না। বেটাচ্ছেলে নরম না হলে, একদম মারা যাবো। গভরমেন্টকে কিছু খারাপ মাল সাপ্লাই করেছি—শালা ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির যদি রিজেক্ট্ করে দেয় একেবারে ফিনিশ হয়ে যাবো।' প্রথমেই সুধাকরকে একটু বকুনি লাগিয়ে বলেছিলাম, তোমার অভ্যেসটা পাল্টাও—মাঝে মাঝে অন্তত থার্ড ক্লাস মাল সাপ্লাই বন্ধ করো। সুধাকর বললো, 'এসব কী আজগুবী কথা বলছেন নটবরদা? লর্ড ক্লাইভের আমল থেকে আজ পর্যন্ত কে কবে গোরমেন্টকে জেনুইন মাল সাপ্লাই করেছে?' সুধাকর কিছুতেই শুনলো না, জোর করে কেসটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলো। গভরমেন্টের লোকটাকে আমি বাজিয়ে দেখলাম—ব্যাটা সত্যি ঘুষ নেয় না, পরের গাড়িতে চড়ে না, মদ ছোঁয় না। কিন্তু আমিও নটবর মিত্তির! তখনও আশা ছাড়লাম না। তিন-চারদিন ধরে বিভিন্ন সোর্স থেকে খোঁজখবর নিয়ে শুনলাম, লোকটা এক ম্যাড্রাসী মহাপুরুষ বাবার ভক্ত। আর পায় কে? আমিও বিরাট ভক্ত বনে গেলুম। বললুম, আপনি বিরাট ভক্ত—আর আমি কীটাণুকীট, সবে ভক্তিমার্গে পা বাড়িয়েছি। আপনাকে আলো দেখাতে হবে। দেড়শ' টাকা দিয়ে ম্যাড্রাসী বাবার একখানা স্পেশাল রঙীন ফটো যোগাড় করে পার্ক স্ট্রীটের সেমুলড থেকে দামী ফ্রেমে বাঁধিয়ে ভক্ত-বাবাজীর বাড়ি দিয়ে এলুম। মন্ত্রের মতো কাজ হয়ে গেলো। ভদ্রলোক বুঝতেই পারলেন না, ওঁর হাতে আমি তামাক খেয়ে গেলুম।"

কিন্তু নটবর মিত্তির হবে না সোমনাথ। নিজের কাছে সে ছোট হতে পারবে না।

তবে ভদ্রতা করতে পারে সোমনাথ। কলকাতায় ফিরে এসে গোয়েঙ্কাজীর বাড়িতে সোমনাথ একটা ফোন করে দিলো।

কয়েকদিন পরে গোয়েঙ্কাজীর সঙ্গে দেখা হলো। ধন্যবাদ জানিয়ে গোয়েঙ্কাজী বললেন, "ঝিকে পৌঁছে দিয়েছেন এই যথেষ্ট—আবার কষ্ট করে ট্রাংককলে জানাবার কী প্রয়োজন ছিল?"

সোমনাথ বললো, "ভাবলাম, ভাবীজী দুশ্চিন্তা করবেন।"

গোয়েঙ্কাজীর ঘরে ফিরিঙ্গী টাইপিস্টকে দেখতে পাচ্ছে না সোমনাথ। গোয়েঙ্কাজী খবর দিলেন, "চাকরি ছেড়ে পালিয়েছে।" তারপর ফিক করে হেসে বললেন, "গাড়িতে আপনি কিছু করেছিলেন নাকি, সেদিন? সেই যে আপনার সঙ্গে কলকাতায় গেলো, তার পরের দিনই রেজিগনেশন।"

নোংরা কথায় কান লাল হয়ে উঠেছিল সোমনাথের। দাদার থেকেও বয়সে বড় লোকটা। গোয়েঙ্কাজী বললেন, "আরে ভয় পাচ্ছেন কেন? এমনি রসিকতা করলাম। আমাদের মিল কলকাতা থেকে এতো দূরে যে ভালো লেডি-টাইপিস্ট আসতেই চায় না।"

চুপ করে রইলো সোমনাথ। গোয়েঙ্কাজী বললেন, "আপনি তো অনেক বড় বড় অফিসে ঘোরেন। আজকাল নাকি গাউন-পরা মেমসায়েব রাখা আর ফ্যাশন নয়? বড় বড় কোম্পানিরা নাকি এখন শাড়ি-পরা সেক্রেটারী রাখছে?"

হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। এসব খবর তো সোমনাথ রাখে না।

বললো, "সে-রকম তো কিছু শুনিনি। দু-রকম মহিলাই তো অফিসে কাজ করেন।"

গোয়েঙ্কাজী হেসে বললেন, "আপনি তাহলে অফিসে গিয়ে কোনো স্টাডি করেন না। গাউন-পরা মেমসায়েবদের ডিমান্ড খুব কমে গেছে। আপনাদের লাইনে এক ভদ্রলোকের কাছে

আমি খবরটা পেয়েছি, নাম মিঃ নটবর মিটার।"

"চেনেন ওঁকে?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো। পরিচিত একটা নাম শুনে সোমনাথ কিছুটা ভরসা পাচ্ছে।

"মিস্টার মিটার দু-একবার আমার এখানে এসেছিলেন—ওঁর এক বন্ধুর কাজে। ভারি আমুদে মানুষ। একেবারে সুপার সেল্‌সম্যান।"

সোমনাথ ওসব কথায় আগ্রহ দেখালো না। বরং টাকার কথা তুললো। বললো, "আপনার ওপর তো ইনকাম ট্যাক্সের ভীষণ চাপ।"

এই ব্যাপারে সহানুভূতি পেয়ে খুশী হলেন গোয়েঙ্কা। বললেন, "গভরমেন্ট ডাকাতি করছে—টাকায় সত্তর পয়সা কেটে নিলে, কাজকর্মে মানুষের কোনো উৎসাহ থাকতে পারে?"

সোমনাথ বললো, "লোকের ধারণা বড় বড় পোস্টে আপনারা খুব সুখে আছেন। অথচ মোটেই তা নয়!"

এরপর গোয়েঙ্কাজী হয়তো কিছু টাকার কথা তুলতেন। কিন্তু সোমনাথকে এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না। হাজার হোক সামান্য চেনা।

গোয়েঙ্কার ওপর সোমনাথ বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু ব্যবসায়ে ভদ্রতা রেখে চলতেই হবে। মিস্টার মাওজী বললেন, বড় পার্টি হলে, একটু-আধটু এনটারটেন করবেন। সোমনাথ তাই গোয়েঙ্কাকে বললো, "কলকাতায় এলে দয়া করে একটা ফোন করে দেবেন। যদি সুযোগ দেন কোথাও লাঞ্চে যাওয়া যাবে।"

এবার বেশ বকুনি খেলো সোমনাথ। কারণ গোয়েঙ্কা মুখের ওপর জানিয়ে দিলেন তিনি মাছ মাংস খান না—ড্রিঙ্কও ভালোবাসেন না। সুতরাং তাঁকে নেমন্তন্ন করে লাভ নেই। বরং অসুবিধে।

বিদায় দেবার আগে গোয়েঙ্কাজী বললেন, "যদি জানাশোনা ভালো কোনো লেডি সেক্রেটারী থাকে রেকমেন্ড করবেন। শাড়ি-পরা বেঙ্গলী সেক্রেটারী রাখতেও আমাদের কোনো আপত্তি নেই।"

সোমনাথের বেশ অস্বস্তি লাগলো। চাকরি না পেয়ে যে-জগতের মধ্যে সোমনাথ ঢুকতে চেষ্টা করছে সে-সম্পর্কে বাঙালীদের কোনো জ্ঞান নেই। বিজনেস সম্পর্কে এতোদিন একটা অস্পষ্ট ধোঁয়াটে ধারণা ছিল সোমনাথের। বিজনেস এমন জিনিস যা বাঙালীরা পারে না—কারণ তাদের ধৈর্য নেই। সোমনাথ এখন বুঝেছে, হাজার রকমের বিজনেস আছে। কিন্তু যে-বিজনেসের জগতে সে পা ফেলবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে, তার মধ্যে দীর্ঘদিনের নোংরা ষড়যন্ত্র রয়েছে। বিজনেসের অনেক রহস্যই বংশানুক্রমিকভাবে গোপন রাখা হয়—একান্ত আপনজন ছাড়া কেউ জানতে পারে না।

নটবর মিত্রকে সোমনাথ এবং আদকবাবু যতই অপছন্দ করুক ভদ্রলোক অন্তত ভিতরের অনেক খবর ফাঁস করে দিয়েছেন—যা সারা জীবন বাহাত্তর নম্বর ঘরের এগারো নম্বর টেবিলে বসে থাকলেও সোমনাথ জানতে পারতো না।

মিস্টার গোয়েঙ্কার ব্যাপারেও নটবরবাবু বোধহয় কিছু সাহায্য করতে পারেন।

* * *

গলার টাইটা কয়েক ইঞ্চি ঢিলে করে নটবর মিত্তির নিজের অফিসে বসেছিলেন।

সোমনাথকে দেখেই একগাল হেসে নটবর মিত্তির বললেন, "আসুন মিস্টার ব্যানার্জি।

মুখ দেখেই বুঝতে পারছি কিছু হচ্ছে না। কতকগুলো হরিয়ানী পাঞ্জাবী রাজস্থানী সিন্ধি ডাকাত বিজনেসের নাম করে সোনার বাংলাকে লুটেপুটে খেলে। আমরা তো শুধু আঙুল চুষে-চুষেই দিন কাটিয়ে দিলাম।"

সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো, "আপনি মিস্টার গোয়েঙ্কাকে চেনেন?"

"বিজনেসে রয়েছি, এই কলকাতায় অন্তত দেড়শ' গোয়েঙ্কাকে চিনি। আপনি কার কথা বলছেন?"

সোমনাথ পরিচয় দিলো। নটবর একগাল হেসে বললেন, "মহাত্মা মিলস্-এর সুদর্শন গোয়েঙ্কার কথা বলছেন? লালু জামাইবাবুর মতো চেহারা তো?"

হো-হো করে হাসলেন নটবর মিত্তির। "আপনি বুঝি ওখানেও মাল বেচবার চেষ্টা করছেন?"

"কেন পার্টি খারাপ নাকি?" নটবর মিত্রের কথার ধরনে সোমনাথ চিন্তায় পড়ে গেলো।

"পার্টি খারাপ হতে যাবে কোন্ দুঃখে? তবে বড় শক্ত ঘাঁটি।" টাই-এর ফাঁসটা আরও আলগা করে নটবর মিত্তির বললেন, "আমার এক পার্টি ওখানে ফেঁসে গিয়েছিল। কিছুতেই সুবিধে করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত পাঁচশ' টাকা ফুরনে আমাকে পাঠালো। আমি অনেক কষ্ট করে দু-তিনবার ট্রাই নিয়ে একদিন ড্রিংকসের টেবিলে গোয়েঙ্কাকে ফেললাম। তবে কাজ হাসিল হলো।"

"তবে যে উনি বললেন, মদ-টদে আগ্রহ নেই ওঁর।" সোমনাথ একটু আশ্চর্য হলো।

"আপনি অচেনা-অজানা লোক, তাছাড়া আপনাকে কী বলবে? যা দিনকাল পড়েছে, যাকে-তাকে বলা যায় না—আমার বিনা পয়সায় মাল খেতে ভালো লাগে। আপনি সত্যিই হাসালেন সোমনাথবাবু।"

নটবরবাবু সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বললেন, "এ-লাইনে আমার চোখ ডাক্তার বি সি রায়ের মতো। পার্টির হাঁচি শুনলেই বলতে পারি মনে কী রোগ হয়েছে। আপনার ঐ গোয়েঙ্কাকেও বুঝে নিয়েছি। এক ডোজ ওষুধেই বনের হাতি পোষ মেনেছে! মিস্টার গোয়েঙ্কা এখন আমার ফ্রেন্ডের মতো হয়ে গেছেন।"

"তাই তো বললেন, মিস্টার গোয়েঙ্কা। আপনার খুব প্রশংসা করলেন।" সোমনাথ জানালো।

বেশ সন্তুষ্ট হলেন নটবর মিটার। গর্বের সঙ্গে বললেন, "অথচ দেখুন, মোটে তিপ্পান্ন টাকা মালের বিল হয়েছিল। আপনাদের বাড়ির মিস্টার মেহতা তো হিন্দুস্থান হোটেলে নিয়ে গিয়ে ওই গোয়েঙ্কার পিছনে সাড়ে তিনশ' টাকার ফরেন হুইস্কি ঢেলেছিল—কিন্তু পারলো কিছু করতে?"

চুপ করে রইলো সোমনাথ। নটবর বললেন, "অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন মশাই? সেল করতে গেলেই কিছু ট্যাক্সো গুণতে হয়—এসব খরচকে সেল্‌স ট্যাক্স মনে করে এ লাইনের লোকেরা।"

সোমনাথের ব্যবসা সম্পর্কে নটবর মিটার এবার আরও কিছু প্রশ্ন করলেন। তারপর বললেন, "খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি—আপনার কেসটা খুব শক্ত। কিছু কাঁচা টাকা ঢেলে আপনি গোয়েঙ্কাকে মাল গছাতে পারবেন না। কারণটা অ-আ-ক-খর মতো সিম্পল। ওই যে অপথালমিক হোয়াইটনার এবং একটা কেমিক্যাল আপনি বেচতে চাইছেন তার জন্যে আমারই এক জানাশোনা পার্টির কাছ থেকে গত তিন বছর ধরে গোয়েঙ্কা একশ' টাকায় তিন টাকা করে নমস্কারী পেয়ে আসছে। আপনি নিজেই তো আড়াই পারসেন্টের বেশি কমিশন পাবেন না। তাহলে নিজের পকেট থেকে আরও আধ পারসেন্ট দিতে হয়। মাওজীর হাতে-পায়ে ধরে আপনি সমান রেট দিলেও ফল হবে না। কোন্ দুঃখে গোয়েঙ্কা নিজের দেশওয়ালী ভাই ছেড়ে আপনার কাছে আসবে?"

উঠতে যাচ্ছিল সোমনাথ। নটবর বললেন, "আপনি একেবারে হতাশ হবেন না। বাবারও বাবা আছে—হাইকোর্টের ওপরে যেমন রয়েছে সুপ্রীম কোর্ট। গোয়েঙ্কাকে অন্যপথে নরম করতে হবে। আমি তো কাল সকালেই অন্য একটা কাজে গোয়েঙ্কার সঙ্গে দেখা করতে

যাচ্ছি। দেখি আপনার জন্যে কোনো পথ বার করতে পারি কিনা।”

সোমনাথ বললো, “মনে হলো, আপনার ওপর ভদ্রলোকের খুব বিশ্বাস আছে। যদি আমার সম্বন্ধে একটু বলে দেন। আমি যে বিশ্বাসযোগ্য লোক সেটাও যদি উনি জানেন।”

নটবর একগাল হেসে বললেন, “অত ছটফট করছেন কেন? বসুন। চা খান। যখন এ-লাইনে প্রথম এলেন তখন বর্ষার পুঁইডগার মতো তাজা কচি মুখখানা ছিল। এই ক'দিনেই শুকিয়ে গেলো কেন?”

সোমনাথ বললো, “কিছুতেই কিছু লাগাতে পারছি না, নটবরদা। মিস্টার মাওজী একটা সুযোগ দিলেন—সেটাও যদি হাতছাড়া হয়ে যায়।”

নটবর মিটার লোকটার অন্তর আছে। সোমনাথের কথা শুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, “আপনি কিছুই ভাববেন না। আমার উপর বিশ্বাস করে ছেড়ে দিন, মহাত্মা মিলের গোয়েঙ্কাকে আমি কব্জা করে দিচ্ছি। আপনার কোনো চিন্তার কারণ নেই—আপনার কাছ থেকে আমি এই কেসে কোনো চার্জ করবো না।”

নটবর মিত্তির কী করতে কী করে ফেলবেন কেউ জানে না। তবু সোমনাথ আপত্তি করলো না। তার মধ্যে হতাশা আসছে। মনে হচ্ছে এসপার-ওসপার একটা কিছু হয়ে যাক।

✻

পরের দিন বিকেলে ফোনে সোমনাথকে ডেকে পাঠালেন নটবর মিত্তির।

বেজায় খুশী মনে হচ্ছে ভদ্রলোককে। নিজের টাকে হাত বুলিয়ে নটবর বললেন, “আপনার কপাল বোধহয় খুললো মিস্টার ব্যানার্জি। গোয়েঙ্কাকে যা-বলবার বলে এসেছি।”

ভীষণ উৎসাহিত বোধ করছে সোমনাথ। প্রথমেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানালো নটবরবাবুকে।

নটবরবাবু দার্শনিকভাবে বললেন, “শুধু টাকাতেই সব কাজ হাসিল হয় না, মিস্টার ব্যানার্জি। আমাদের এই লাইনে টাকার ওপরেও জিনিস রয়েছে! সুপ্রীম কোর্টের পরেও যেমন আছে রাষ্ট্রপতির কাছে মার্সি পিটিশন।”

“এবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন নটবর মিটার। বললেন, “গোয়েঙ্কা সম্পর্কে একটু বাইরে খোঁজখবর নিলুম। ফরেনে একেই বলে ফিল্ড রিসার্চ। গোপন অনুসন্ধানের খবর অনুযায়ী গোয়েঙ্কার নাড়ি টিপতেই সুড়সুড় করে সব খবর বেরিয়ে এলো। ইউ উইল বি গ্ল্যাড টু নো গোয়েঙ্কার মনে অনেক দুঃখু আছে। পয়সার লোভে কেজরিওয়ালের খোঁড়া মেয়ে বিয়ে করেছে। অমন কার্তিকের মতো চেহারা, কিন্তু শরীরের অনেক সাধ-আহ্লাদ পূরণ হয় না।”

কান লাল হয়ে উঠছে সোমনাথের। নটবরবাবু তা লক্ষ্য করলেন না। তিনি বলে চললেন, “কমবয়সী মেয়েদের ওপর খু-উব লোভ আছে। কিন্তু ভীষণ ভয়ও আছে। আমিও চান্স বুঝে টোপ ফেলে দিয়েছি আপনার নামে। চালাক লোক তো—আন্দাজে সব বুঝে নিয়েছে। বলেছি, যেদিন কলকাতায় আসবেন, শুধু দয়া করে ফোনটা তুলে ব্যানার্জিকে জানিয়ে দেবেন। আর সন্ধ্যেটা ফ্রি রাখবেন।”

নটবর মিত্তির আশা করেছিলেন, সোমনাথ এই দুরূহ কাজের জন্য তাকে ধন্যবাদ দেবে।

তিনি বলতে গেলেন, "অনেক সস্তায় কাজ হয়ে যাবে আপনার। সব ব্যবস্থা করে দেবো আমি—আপনার কোনো চিন্তা থাকবে না।"

প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো সোমনাথ। "এ আপনি কী করলেন, মিস্টার মিটার? এসব কথা আপনাকে কে বলতে বললো? ভদ্রলোকের ছেলে ব্যবসায় নেমেছি।"

নটবরবাবু মোটেই উত্তেজিত হলেন না। শান্তভাবে সোমনাথকে বললেন, "এ-লাইনে কে ভদ্রলোকের ছেলে নয়, বলুন? আমি, শ্রীধরজী, মিস্টার গোয়েংকা সবাই। ভদ্দরলোকের ছেলেরাই তো এদেশের পলিটিকস্, গভরমেন্ট এবং বিজনেস চালাচ্ছে। শুনুন মশাই, আমি যে প্রপোজাল গোয়েংকার কাছে দিয়ে এসেছি তার মধ্যে একটুও অভদ্রতা নেই—যস্মিন্ দেশে যদাচার, কাছা খুলে নদী পার।"

"অসম্ভব," দাঁতে দাঁত চেপে সোমনাথ বললো। অন্য কেউ হলে এতোক্ষণ লোকটার থ্যাবড়া নাকে এক ঘুষি বসিয়ে দিতো সোমনাথ।

নিজেকে বহু কষ্টে শান্ত করে সোমনাথ বললো, "এসব নোংরামির মধ্যে আমাদের বংশে কেউ কখনও থাকেনি। আপনি লোকটাকে এখনই বারণ করে দিন।"

মুখের হাসি বজায় রেখে নটবরবাবু বললেন, "লাও বাবা! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর! যাকগে। বলা যখন হয়ে গেছে, তখন চারা নেই। গোয়েংকা যেদিন আপনাকে ফোন করে জানাবেন আসছেন, টেলিফোনে সোজাসুজি বলে দেবেন—আপনি ব্যস্ত আছেন, সন্ধ্যেবেলায় কোনোরকম কো-অপারেশন করতে পারবেন না। তাহলে গোয়েংকাজী বুঝে নেবেন।"

সোমনাথ আর এক মুহূর্তও দেরি না করে নটবরবাবুর অফিস থেকে বেরিয়ে এলো। রাগে তার সর্বশরীর জ্বলছে।

কিন্তু যার কোনো মুরোদ নেই, তার শরীর জ্বললে দুনিয়ার কী এসে যায়? যে সাপের বিষ নেই, তার কুলোপানা চক্করে কে ভয় পাবে—মা বলতেন। কোন্ দিকে যায় সোমনাথ? ইচ্ছে করছে, কোথা থেকে যদি একটা এটম বোমা পাওয়া যেতো মন্দ হতো না—চার্নক সাহেবের এই জারজ সৃষ্টির ওপর বোমাটা ফেলে দিতো সোমনাথ। চিরদিনের মতো সমস্যার সমাধান হতো। কিন্তু শক্তি কোথায়? এটম বোমা তো দূরের কথা, কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে দু-একটা হারামজাদার গালে থাপ্পড় মারবার মতো সাহসও ঈশ্বর দেননি সোমনাথকে।

মনের ঠিক এমন অবস্থার সময় সেনাপতি ডাকলো, "বাবু আপনার ফোন।"

"হ্যালো, আমি তপতী বলছি।"

তপতী আর ফোন করবার সময় পেলো না? সোমনাথের গম্ভীর গলা শোনা গেলো, "বলো।"

"একটু আগেও তোমাকে ফোন করেছিলাম—শুনলাম, তুমি কোন এক মিস্টার নটবর মিত্রের অফিসে গিয়েছো।"

"অনেক কাজ-কর্ম থাকে, তপতী।" ওর প্রশ্নটা সোমনাথ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলো।

তপতী বললো, "কই সেদিনের পর তুমি তো আমার খোঁজ করলে না?"

কী বলবে সোমনাথ? শেষ পর্যন্ত উত্তর দিলো, "তপতী, কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে মিটিং চলছে—ওঁরা বসে রয়েছেন। পরে একদিন দেখা করা যাবে।"

"কাল আমি থাকছি না। শ্রীরামপুরে যাচ্ছি। অলমোস্ট যেতে বাধ্য হচ্ছি। পরশু তোমার ওখানে যাবো। দেখা হলে, সব বলবো। বেশ সিরিয়াস।"

ফোন নামিয়ে রাখলো সোমনাথ। ইংরাজী ও বাংলা তারিখ মেশানো ক্যালেন্ডারটা দেওয়ালে সামনেই ঝুলছে। পরশু ১৬ই জুন। অর্থাৎ ১লা আষাঢ়।

জন্মদিনটা আনন্দের কেন, এই প্রশ্ন সোমনাথের আগে প্রায়ই মনে হতো। জন্মগ্রহণ করে শিশু তো কাঁদে—তার সমস্ত জীবনের দুঃখ ও যন্ত্রণার সেই তো শুরু। তবু সবাই বলে জন্মদিনে আনন্দ করতে হয়। অনেকদিন আগে মাকে এই প্রশ্ন করেছিল সোমনাথ। "জন্মদিনে আমি তো তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছিলাম, তবু তুমি ১লা আষাঢ়ে আনন্দ করো কেন?"

মা বলেছিলেন, "তুই চুপ কর। অন্যদিন হলে তোকে বকতাম।" জন্মদিনে মা কাউকে বকতেন না। বরং পায়েস রাঁধতেন।

তারপর এই বাড়িতে ১লা আষাঢ়ের অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। জন্মদিনেই একদিন মৃত্যুর ঘন অন্ধকার নেমে এসেছিল যোধপুর পার্কের বাড়িতে। ১লা আষাঢ় এখন শুধু সোমনাথের জন্মদিন নয়, মায়ের মৃত্যুদিবসও বটে।

আজ যে সোমনাথের জন্মদিন তা কে আর মনে রাখবে? ভোরবেলায় বিছানায় শুয়ে শুয়েই ভাবছিল সোমনাথ। কবে কোনকালে উজ্জয়িনীর প্রিয় কবি আপন খেয়ালে আষাঢ়স্য প্রথম দিবসকে কাব্যের মালা পরিয়ে অবিস্মরণীয় করেছিলেন। তারই রেশ তুলে বহু শতাব্দী পরে আজ ঘরে ঘরে বিরহ-মিলনের রাগিণী বেজে উঠবে। একটু পরে রেডিওতে মহাকবি ও তাঁর সৃষ্টি অমর চরিত্রের উদ্দেশে সংগীতাঞ্জলি শুরু হবে। কিন্তু কে মনে রাখবে, বেকার ব্যর্থ কবি সোমনাথ ব্যানার্জি ওই একই দিনে পৃথিবীর আলো দেখেছিল? ছন্দের মন্ত্র পড়ে প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসাকে সেও অমরত্ব দিতে চেয়েছিল।

জন্মোৎসবের আগের দিন থেকেই কত লোকের বাড়িতে অভিনন্দনের পালা শুরু হয়ে যায়। ফুল আসে, ফোন আসে, রঙীন টেলিগ্রাম পৌঁছে দিয়ে যায় ডাকঘরের পিওন। কিন্তু সোমনাথের ভাগ্যে এসেছে দুঃসংবাদের ইঙ্গিত। হীরালাল সাহা যে দু-হাজার টাকা নিয়েছিল লাভ সমেত কালকেই তা ফেরত দেবার কথা ছিল। বউদিকে সোমনাথ একটা ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছিল—১লা আষাঢ় তার একটা প্রীতি উপহার পাবার সম্ভাবনা আছে। সোমনাথ এবার কোনো প্রতিবাদই শুনবে না। কমলা বউদি বলেছিলেন, "বেশ। যদি সুখবর সত্যিই কিছু থাকে—নেবো তোমার উপহার। তোমার দাদাকেও শিক্ষা দেওয়া হবে—ভাবছেন, উনি ছাড়া আমাকে কেউ উপহার দেবার নেই।" কিন্তু গতরাত্রে হীরালালকে কিছুতেই খুঁজে পায়নি সোমনাথ। তিনবার অফিসে গিয়েও দেখা হলো না।

ভোরবেলায় বুলবুল একবার কী কাজে ঘরে ঢুকলো। সে কিন্তু কিছুই বললো না। সোমনাথের আজ যে জন্মদিন তা মেজদার বালিকাবধূটি খবরও রাখে না। মেজদা যে সামনের সেপ্টেম্বরে অফিসের কাজে বিলেত যেতে পারে, সেই খবরটাই বুলবুল শুনিয়ে গেলো। বললো, "আমি ছাড়ছি না। যে করে হোক আমিও ম্যানেজ করবো বিলেত যাওয়াটা।"

সোমনাথ বললো, "চেষ্টা চালিয়ে যাও—প্রতিদিন দু ঘণ্টা ধরে ঘ্যান ঘ্যান করে দাদার লাইফ মিজারেবল করো।"

বিছানায় উঠে বসে ভীষণ দুর্বল মনে হচ্ছে সোমনাথের। এই বাড়ির সে কেউ নয়। যেন কিছুদিনের অতিথি হয়ে সে যোধপুর পার্কে এসেছিল। নির্ধারিত সময়ের পরও অতিথি বিদায় নিচ্ছে না। এই ঘর, এই খাট, এই বিছানা, এই টেবিল, এই ফুলকাটা চায়ের কাপ—এসবের কোনো কিছুতেই তার অধিকার নেই। ভদ্রতা করে গৃহস্বামী এখনও অতিথি আপ্যায়ন করছেন। সবাইকে সন্দেহ করছে সোমনাথ। ভয় হচ্ছে, কমলা বউদিও বোধহয় এবার ক্লান্ত হয়ে পড়বেন।

দরজা খুলে সোমনাথ বাড়ির বাইরের বারান্দায় দাঁড়াতে যাচ্ছিল। এমন সময় রোগা পাকানো চেহারার এক বুড়ো ভদ্রলোককে পুরানো অস্টিন গাড়ি থেকে নামতে দেখা গেলো। দ্বৈপায়নবাবুর খোঁজ করলেন ভদ্রলোক। বাবার সঙ্গে আলাপের জন্যে ওপরে উঠে যাবার আগে ভদ্রলোক আড়চোখে সোমনাথকে বেশ খুঁটিয়ে দেখে নিলেন।

ভদ্রলোক গত এক সপ্তাহের মধ্যে দু-তিনবার এলেন। বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কীসব কথাবার্তা বলেন।

বুলবুল মেজদার অফিস-টিফিনের জন্যে স্যান্ডউইচ তৈরি করছিল। সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো, "লোকটা কে?"

স্যান্ডউইচগুলো অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে মুড়তে মুড়তে বুলবুল ঠোঁট উল্টোলো। ওর মাথায় যে কোনো দুষ্টুমি আছে তা সোমনাথ সন্দেহ করলো।

সোমনাথ বললো, "ঠোঁট উল্টোচ্ছ যে?"

আরও একপ্রস্থ ঠোঁট উল্টে বুলবুল বললো, "বারে! আমার ঠোঁট আমি উল্টোতে পারবো না?"

সোমনাথের এসব ভালো লাগছে না। বুলবুল বললো, "অধৈর্য হচ্ছো কেন? সময় মতো সব জানতে পারবে।"

সোমনাথ যে আরও রেগে উঠবে বুলবুল তা ভাবতে পারেনি। বেশ বিরক্ত হয়ে বুলবুল এবার খবরটা ফাঁস করে দিলো। "অর্ধেক রাজত্ব যাতে পাও তার জন্যে বাবা কথাবার্তা চালাচ্ছেন, সেই সঙ্গে...বুঝতেই পারছো।" এই বলে বুলবুল রাগে গনগন করতে করতে নিজের শোবার ঘরে ঢুকে পড়লো।

রোগা বুড়ো ভদ্রলোক আধঘণ্টা পরে বিদায় নিলেন। তারপরেই ওপরে বড় বউমার ডাক পড়লো। মিনিট দশেক পরে বাবার সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা করে কমলা বউদি একতলায় নেমে এলেন। মেজদার সঙ্গে আড়ালে তাঁর কী সব কথাবার্তা হলো। বউদি আবার ওপরে উঠে গেলেন।

সোমনাথ বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে মেজদা ও বুলবুলের দাম্পত্য আলোচনা শুনতে পেলো। বুলবুল ফোঁস-ফোঁস করতে করতে বলছে, "তুমি কিন্তু এসবের মধ্যে একদম থাকবে না। বাবার যা ইচ্ছে করুন। ছেলে তো আর কচি খোকাটি নেই।"

স্নানের শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে সোমনাথ নিজেকে শান্ত করবার চেষ্টা করছে। অনেকগুলো ১লা আষাঢ়ের সঙ্গে সোমনাথের তো পরিচয় হয়েছে—কিন্তু কোনো ১লা আষাঢ়কেই আজকের মতো নিরর্থক মনে হয়নি সোমনাথের। সোমনাথ এবার ছেলেমানুষী করে ফেললো। জলের ধারার মধ্যে চোখ খুলে হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করে বসলো, "আমি কী দোষ করেছি? তোমরা বলো। আমি তো কোনো অপরাধ করিনি—আমি শুধু একটা চাকরি যোগাড় করতে পারিনি।"

কিন্তু এসব প্রশ্ন সোমনাথ কাকে জিজ্ঞেস করছে? সোমনাথ তো এখন নাবালক নেই। এ-ধরনের প্রশ্ন করবার অধিকার তো একমাত্র বাচ্চা ছেলেদের থাকে। এর উত্তর কার কাছ থেকে সে প্রত্যাশা করে? ওপরের বারান্দায় মৃতদার দুর্বল যে-বৃদ্ধটি বসে আছেন, তিনি উত্তর দেবেন? না আকাশের ওধার থেকে কোনো এক ইন্দ্রজালে মা কিছুক্ষণের জন্যে ফিরে এসে সোমনাথের সমস্যা সমাধান করবেন? কেউ তো এসব প্রশ্ন শুনবেও না। উত্তর দেবার দায়িত্ব তাঁর নয় জেনেও, বেচারা কমলা বউদি কেবল সোমনাথের হাত চেপে ধরবেন এবং ওর তপ্ত কপালে ঠান্ডা হাত বুলিয়ে দেবেন।

সোমনাথ বাথরুম থেকে বেরোতেই কমলা বউদি খবর দিলেন, "বাবা তোমায় ডাকছেন।"

বাবা ঠিক যেভাবে ইজিচেয়ারের পূর্বদিকে মুখ করে ব্যালকনিতে বসে থাকেন সেইভাবেই বসেছিলেন। কোনোরকম গৌরচন্দ্রিকা না করেই তিনি বললেন, "তোমার নিজের পায়ে দাঁড়াবার একটা সুযোগ এসেছে। নগেনবাবু এসেছিলেন—ভদ্রলোকের অবস্থা ভালো। নিজের একটা সিমেন্টের দোকান আছে, ওঁর ছেলে নেই—তিনটি মেয়ে। তোমাকেই দোকানটা দেবেন—যদি ছোট মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়।"

বাবার সামনে কথা বলার, বিশেষ করে প্রতিবাদের অভ্যাস, এ-বাড়ির কারুর নেই। তবু সোমনাথ বললো, "নিজের পায়ে দাঁড়ানো হলো কই?"

বাবা এবার মুখ তুলে অবাধ্য পুত্রের চোখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "ওদের ফ্যামিলি ভালো। আমাদের পাল্টি ঘর। মেয়ের বাঁ-হাতে সামান্য ফিজিক্যাল ডিফেক্ট আছে। দেখতে খারাপ নয়। সুলক্ষণা। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছে। আমি ভেবে দেখলাম তোমার সমস্যা এতেই সমাধান হবে। বউমার কাছে মেয়ের ছবি আছে, তুমি দেখতে পারো।"

কোনো উত্তর না দিয়েই সোমনাথ নেমে এলো। বুলবুল জিজ্ঞেস করলো, "ছবিটা দেখবে?"

এক বকুনি লাগালো সোমনাথ। "তোমাকে পাকামো করতে হবে না।"

ছেলের মতিগতি যে সুবিধের নয়, বাবা বোধহয় আন্দাজ করতে পেরেছেন। তাই আবার বড় বউমাকে ডেকে পরামর্শ করলেন।

এই ধরনের প্রস্তাবে দ্বৈপায়ন যে সন্তুষ্ট নন, তা কমলা জানে। প্রথমে বাবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কোনোদিকে কোনো আশার আলো না দেখতে পেয়ে নিরুপায় দ্বৈপায়ন মনস্থির করেছেন। এদেশে সোমনাথের যে চাকরি হবে না তা অনেক চেষ্টার পর এবার দ্বৈপায়ন বুঝতে পেরেছেন।

বড় বউমা ফিরে এসে সোমনাথকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন। তারপর সস্নেহে দেবরকে বললেন, "রাজী হয়ে যাও ঠাকুরপো—বাবার যখন এতো ইচ্ছে।"

"এর থেকে অপমানের আমি কিছু ভাবতে পারছি না, বউদি!" সোমনাথের সামনে কমলা ছাড়া অন্য কেউ থাকলে সে এতোক্ষণ রাগে ফেটে পড়তো।

বউদির মুখে একটুও উদ্বেগের চিহ্ন নেই। দেবরের পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "কিছু মনে কোরো না ভাই—বাবার ধারণা, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার এইটাই তোমার শেষ সুযোগ।"

সোমনাথ বউদির চোখের দিকে তাকালো না। মুখ ফিরিয়ে নিলো। বউদি বললো, "কে আর জানতে পারছে, কেন তোমার এখানে বিয়ে হচ্ছে।" এরপর বাবা যা বলতে বলেছেন, কমলা বউদি তা মুখে আনতে পারলেন না। বাবা হুকুম করেছেন, "ওকে জানিয়ে দিও, এরকম সুযোগ রোজ আসে না। এবং কথার বাধ্য না হলে এরপর এ-বাড়ির কেউ আর তার জন্যে দায়ী থাকবে না।"

এ-কথা না শুনলেও বাবা যে বউদির মাধ্যমে চরমপত্র পাঠিয়েছেন তা সোমনাথ আন্দাজ করতে পারলো। বউদির হাত ধরে সোমনাথ বললো, "তুমি অন্তত আমাকে নিজের কাছে ছোট হতে বোলো না।"

কমলা বউদি বেচারা উভয় সংকটে পড়লেন। পাত্রীর ছবিখানা তাঁর হাতে রয়েছে। বাবার নির্দেশ, সোমের সঙ্গে আজই এসপার-ওসপার করতে হবে।

কমলা বউদি আবার ওপরে ছুটলেন বাবাকে সামলাবার জন্যে। বললেন, "হাজার হোক বিয়ে বলে কথা। দু-একদিন ভেবে দেখুক সোম।"

বাবা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। বললেন, "যেসব পাত্রের চাকরি-বাকরি আছে তাদের মুখে এসব কথা মানায়, বউমা। নগেনবাবুর হাতে আরও দুটো সম্বন্ধ ঝুলছে। আমাদের ফ্যামিলি সম্বন্ধে এতো শুনেছেন বলেই ওঁর একটু বেশি আগ্রহ।"

বেচারা কমলা বউদি! সংসারের সবাইকে সুখে রাখবার জন্যে কীভাবে নিজের আনন্দটুকু নষ্ট করছেন।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে জামা-প্যান্ট পরে, ব্যাগটা নিয়ে তৈরি হয়েছে সোমনাথ। মেজদা অনেক আগেই বেরিয়ে পড়েছেন। কমলা বউদি এবার সোমনাথের ঘরে ঢুকে পড়লেন। কী মিষ্টি হাসি কমলা বউদির।

সোমনাথের দিকে তাকিয়ে কমলা বউদি সস্নেহে বললেন, "আমার ওপর রাগ করলে, খোকন?"

সোমনাথ অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলো। তারপর মনে মনে বললো, "পাপিষ্ঠ না হলে তো তোমার ওপর রাগ করতে পারবো না, বউদি।"

বউদি এবার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। "আড়ি করতে নেই, ভাব করো—আজ তোমার জন্মদিন। মনে আছে, মা তোমাকে কী বলতেন? জন্মদিনে সবাইকে ভালোবাসতে হয়, কারুর ক্ষতি করতে নেই, নিজে খু-উব ভালো হতে হয়, সবার মুখে হাসি ফোটাতে হয়।" সোমনাথ পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

বউদি এবার আঁচলের আড়াল থেকে একটা ঘড়ির বাক্স বার করলেন। একটা দামী সুইস রিস্টওয়াচ দেবরের হাতে পরিয়ে দিলেন কমলা বউদি। "অমর যখন সুইজারল্যান্ড থেকে এলো তোমার জন্যে আনিয়েছিলাম—জন্মদিনে দেবো বলে কাউকে জানাইনি।" বউদির ছোট ভায়ের নাম অমর।

সোমনাথের চোখে জল আসছে। সে একবার বলতে গেলো, "কেন দিচ্ছো? এসব আমাকে মানায় না।" কিন্তু বউদির অসীম স্নেহভরা চোখের দিকে তাকিয়ে সে কিছুই বলতে পারলো না। সোমনাথের বলতে ইচ্ছে করলো, "আগের জন্মে তুমি আমার কে ছিলে গো?" কিন্তু সোমনাথের গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না।

কমলা বউদি বোধহয় অন্তর্যামী। মুহূর্তে সব বুঝে গেলেন। বললেন, "তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, খোকন।"

* * *

যোধপুর পার্ক বাস স্ট্যান্ডের কাছে সোমনাথের সঙ্গে এক ভদ্রলোকের দেখা হয়ে গেলো। ভদ্রলোক নিজেই পরিচয় দিলেন, "সোমনাথ না? তোমার বন্ধু সুকুমারের বাবা আমি। বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে সুকুমার। দিনরাত জেনারেল নলেজের কোশ্চেন বলে যাচ্ছে। বোনদের মারধোর করেছে দু-একদিন। দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে রাখতে হয়েছিল ক'দিন। মাথায় ইলেকট্রিক শক দিতে বলছে—কিন্তু এক-একবারে ষোলো টাকা খরচ।

"লুম্বিনী পার্ক হাসপাতালে কাউকে চেনো নাকি? ওখানে ফ্রি দ্যাখে শুনেছি।" সুকুমারের বাবা বীরেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন। ভদ্রলোক রিটায়ার করেছেন। স্ত্রীর গুরুতর অসুখ—ওঁর আবার ফিটের রোগ আছে। মেয়েরাই সংসার চালাচ্ছে। মেজ মেয়ে একটা ছোট-খাট কাজ পেয়েছে। না হলে কী যে হতো।

"আমি খোঁজ করে দেখবো, এই বলে সোমনাথ গোলপার্কের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলো। বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়াতে ভালো লাগলো না।

তাহলে পৃথিবীটা ভালোই চলছে! শিল্প, সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতির কেন্দ্রমণি সুসভ্য এই নগর কলকাতার চলমান জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে আছে সোমনাথ। অভিজাত দক্ষিণ কলকাতার নতুন তৈরি উন্নাসিক প্রাসাদগুলো ভোরের সোনালী আলোয় ঝলমল করছে। চাকরি-চাকরি করে একটা নিরপরাধ সুস্থ ছেলে পাগল হয়ে গেলো—এই সুসভ্য সমাজতান্ত্রিক সমাজে তার জন্যে কারও মনে কোনো দুঃখ নেই, কোনো চিন্তা নেই, কোনো লজ্জা নেই।

চোখের কোণে বোধহয় জল আসছিল সোমনাথের। নিষ্ঠুরভাবে নিজেকে সংযত করলো সোমনাথ। "আমাকে ক্ষমা কর, সুকুমার। আমি তোর জন্যে চোখের জল পর্যন্ত ফেলতে পারছি না। আমি নিজেকে বাঁচাবার জন্যে প্রাণপণে সাঁতার কাটছি। আমার ভয় হচ্ছে, তোর মতো আমিও বোধহয় ক্রমশ ডুবে যাচ্ছি।"

কে বলে সোমনাথের মনোবল নেই? সব মানসিক দুর্বলতাকে সে কেমন নির্মমভাবে মন থেকে সরিয়ে দিয়ে ব্যবসার কথা ভাবছে।

হীরালাল সাহার কাছ থেকে লাভের টাকা আদায় করতে যাওয়ার পথে একটা কাপড়ের দোকান সোমনাথের নজরে পড়লো। জন্মদিনে বউদিকে সে কিছু দেবে বলে ঠিক করে রেখেছে। ওখান থেকে একটা তাঁতের শাড়ি কিনলো সোমনাথ। হীরালালবাবুর আগেকার দেড়শ' টাকা পকেটে পকেটেই ঘুরছে। কী ভেবে আর একটা শাড়ি কিনলো সোমনাথ। বুলবুল হয়তো এতো কমদামী শাড়ি পরবেই না। লুকিয়ে বাপের বাড়ির ঝিকে দিয়ে দেবে। কিন্তু বড় বউদির যা স্বভাব, ওঁকে একলা দিলে নেবেনই না।

কাপড়ের দুটো প্যাকেট হাতে নিয়ে হীরালালবাবুর অফিসে যেতেই দুঃসংবাদ পেলো সোমনাথ। হীরালাল সাহা তাকে ডুবিয়েছেন। দু-হাজার টাকা বোধহয় জলে গেলো। কাতরভাবে সোমনাথ বললো, “হীরালালবাবু, আপনার অনেক টাকা আছে। কিন্তু ঐ দু-হাজার টাকাই আমার যথাসর্বস্ব।”

হীরালালবাবু কোনো পাত্তাই দিলেন না। দেঁতো হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললেন, “বিজনেসে যখন নেমেছেন, তখন ঝুঁকি তো নিতেই হবে। আমি তো মশাই আপনাকে ঠকাচ্ছি না। এলগিন রোডের বাড়িটা নিয়ে যে এমন ফাঁপরে পড়ে যাবো, কে জানতো? লরি নিয়ে ভাঙতে গিয়ে পরশুদিন শুনলাম কারা বাড়ি ভাঙা বন্ধ রাখবার জন্যে আদালতে ইনজাংশন দিয়েছে।”

কপালে হাত দিয়ে বসে রইলো সোমনাথ। হীরালালবাবু বললেন, “সামান্য দু-হাজার টাকার জন্যে আপনি যে বিধবাদের থেকেও ভেঙে পড়লেন। ইনজাংশন চিরকাল থাকবে না, বাড়িও ভাঙা হবে এবং টাকাও পাবেন। তবে সময় লাগবে।”

“কত সময়?” সোমনাথ করুণভাবে জিজ্ঞেস করলো।

সে-খবর হীরালালবাবুও রাখেন না। “আদালতের ব্যাপার তো! দুটো-তিনটে বছর কিছুই নয়।”

* * *

নিজের অফিসে এসে মুহ্যমান সোমনাথ পাথরের মতো বসে রইলো। জন্মদিনের শুরুটা ভালোই হয়েছে! বউদির কাছে কী করে মুখ দেখাবে সে?

শান্তভাবে একটু বসে থাকবারও উপায় নেই। মিস্টার মাওজী ফোনে ডাকছেন। এখনই যেতে বললেন।

বউদির দেওয়া নতুন হাত-ঘড়িটার দিকে তাকালো সোমনাথ। হঠাৎ মনে পড়লো তপতীর আসবার সময় হয়েছে। সেনাপতিকে ডেকে বললো, এক দিদিমণি আসতে পারেন। তাকে যেন সেনাপতি বসতে বলে। জরুরী কাজে সোমনাথ বেরিয়ে যাচ্ছে।

সিঁড়ির মুখেই কিন্তু দিদিমণির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। তপতী বললো, “বাসে বড্ড ভিড়। দেরি হয়ে গেলো।”

সোমনাথ কিছুই বললো না। সময়ের বাজারেও বোধহয় আগুন লেগেছে—যার যত সময় দরকার সে তত সময় পাচ্ছে না।

তপতীর বোধহয় একটু বসবার ইচ্ছে। কিন্তু সোমনাথের সময় কই? মিস্টার মাওজী তার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

তপতী তো জন্মদিনে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে না। আজ যে ১লা আষাঢ় তা কি ওর মনে নেই?

এই ক'দিনে তপতী যেন শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে। চোখের কোলে কালো দাগ পড়েছে তপতীর। মোটা ফ্রেমের চশমাও সে-দাগ ঢাকতে পারছে না। তপতী একটা অতি সাধারণ সাদা শাড়ি পরেছে। ফিকে নীল রংয়ের ব্লাউজটাও ভালোভাবে ইস্তিরি করা নয়। তপতী বেচারা হাঁপাচ্ছে। প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে সে এবার সোমনাথকে বললো, "তুমি আমার কথা ভাবো না।"

কী হলো তপতীর? একটা সমর্থ ছেলের সামনে একটা কমবয়সী মেয়েকে এমন অসহায়ভাবে কাঁদতে দেখলে, রাস্তার লোকেরা কী ভাববে?

তপতী কাতরভাবে বললো, "তুমি চিঠি লেখো না, খবর নাও না, আমার সংগে দেখাও করো না। অফিসটাইমে একটা মেয়ের পক্ষে এই চিংপুর রোডে আসা যে কী কষ্টের। লোকগুলো সব জন্তু হয়ে গেছে। ভিড়ের মধ্যে বাসের দরজার কাছে মেয়েদের চেপে ধরবার জন্য যা করে।"

চুপ করে আছে সোমনাথ। তপতী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে করুণভাবে জিজ্ঞেস করলো, "কই? তুমি তো রাগ করছো না? আমার শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে দিয়েছে। আর একটু হলে গাড়ি চাপা পড়তাম।"

সোমনাথের মুখ লাল হয়ে উঠলো। দাঁতে দাঁত চেপে বললো, "কলকাতা শহরটা জংগলের অধম হয়ে যাচ্ছে তপতী। বিশেষ করে এই অঞ্চলটায় কিছু গরিলা আছে।"

তপতী স্তব্ধ হয়ে ওর মুখের দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, "ঘড়ি দেখছো কেন? তোমার সংগে যে অনেক কথা আছে।"

"যে-লোকটার কাছে আমি বিজনেস পেতে পারি সে আমার জন্যে ওয়েট করছে, তপতী।"

তপতী বললো, "তাহলে তোমাকে আটকে রাখা যাবে না। শোনো, বাড়িতে ভীষণ বিয়ের জন্যে চাপ দিচ্ছে। আমার জন্যে পরের দুটো বোন অযথা কষ্ট পাচ্ছে—ওদের বিয়ের সময় হয়ে গেছে।"

যে-লোকের চাকরি নেই, রোজগার নেই, নিজস্ব আশ্রয় নেই—তাকে এসব কথা বলে অপমান করে কী লাভ? সোমনাথ বললো, "বিয়ে করে ফেলো তপতী।"

"তুমি এখনও আমাকে এইভাবে কষ্ট দিতে চাও?" তপতী কাতরভাবে বললো। "বাড়িতে তুমুল ঝগড়া হয়েছে। রাগ করে শ্রীরামপুরে মাসির বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। সোম, আমাদের ব্যাপারটা পাকা করে ফেলা ভালো। চলো, আমরা বিয়েটা রেজিস্ট্রি করে ফেলি। বাড়ির লোকরা তখন চাপ দিয়েও আমার কিছু করতে পারবে না। প্রতিদিনের এই অশান্তি আমার আর ভালো লাগে না।"

সোমনাথের হ্যাঁ বলবার ক্ষমতা নেই। 'আজ এই জন্মদিনে, লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে, হে ঈশ্বর, পরাশ্রিত বেকার সোমনাথকে কেন এমনভাবে অপদস্থ করছো? আমাকে শাস্তি দিতে চাও দাও, কিন্তু একটা নিষ্কলঙ্ক মেয়ের প্রথম পবিত্র প্রেমকে কেন এমনভাবে অপমান করছো, হে ঈশ্বর?'

কিন্তু কার কাছে প্রার্থনা করছে সোমনাথ? কোথায় ঈশ্বর?

সোমনাথের মুখের দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে তপতী। গাঢ় স্বরে সে অনুরোধ করলো, "কই? কিছু বলো।"

কোথাও যদি সামান্য একটু আশার আলো দেখতে পেতো সোমনাথ, তাহলে এখনই তপতীকে এই অসহ্য অপমান থেকে মুক্তি দিতো। আর তো চুপ করে থাকা চলে না। সোমনাথ কাতরভাবে বললো, "আমায় কিছু সময় ভিক্ষে দিতে পারো তপতী?"

"তুমি আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছো, সোম?" কাঁদ-কাঁদ গলায় তপতী বললো,

"বাবা মা ভাই বোন কেউ আমার দলে নেই। এখন তুমি পিছিয়ে গেলে আমার আর কী রইলো?"

যার চাকরি নেই, রোজগার নেই, তাকে এই সমাজে যে মানুষ বলা চলে না—সে যে নির্ভরের অযোগ্য--এই সামান্য কথাটুকু বুদ্ধিমতী তপতী কেন বুঝতে পারছে না?

তপতী বললো, "আমি তো তোমার কাছে কিছুই চাইছি না। শুধু আমাকে নিয়ে একবার রেজিস্ট্রি অফিসে চলো।"

"তপতী, স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্বটা পুরুষমানুষের—হাজার-হাজার বছর ধরে এই নিয়ম চলে আসছে।" সোমনাথ কথা শেষ করতে পারলো না।

তপতী কিন্তু অবিচল। সে বললো, "ওসব আমি কিছুই বুঝতে চাই না, আগামীকাল আমি আবার আসবো।"

* * *

মিস্টার মাওজীর অফিস থেকে ফিরে সোমনাথ বাহাত্তর নম্বর ঘরে এগারো নম্বর সীটে মাথা নীচু করে বসে আছে। আজ এই ১লা আষাঢ়েই তার জীবনের সবগুলো অধ্যায়ের একই সঙ্গে বিয়োগান্ত পরিণতি হতে চলেছে। বাবা নোটিশ দিয়েছেন, হীরালালবাবু ডুবিয়েছেন, তপতী আর সময় দিতে অক্ষম। বাকি ছিলেন মিস্টার মাওজী। তিনি বললেন, দ্রুত কাজ না দিলে আর সময় নষ্ট করতে পারবেন না। কেমিক্যাল বেচবার জন্যে মিলগুলোতে তিনি নতুন লোক পাঠাবেন। মিস্টার মাওজীর কাছেও সময় ভিক্ষা করেছে সোমনাথ। বলেছে অন্তত এক সপ্তাহ অপেক্ষা করবার জন্যে।

অতএব সাঙ্গ হলো খেলা। চাকরি হবে না। ব্যবসার নামে সামান্য যা পুঁজি ছিল তা জলাঞ্জলি দিয়ে অবসরপ্রাপ্ত ডবলু বি সি এস দ্বৈপায়ন ব্যানার্জির কনিষ্ঠপুত্র সোমনাথ ব্যানার্জি কোথায় যাবে এবার?

ক্রিং ক্রিং। সেনাপতি ছিল না। সোমনাথ নিজে গিয়েই ফোন ধরলো।

"হ্যালো, হ্যালো মিস্টার ব্যানার্জি?" মহাত্মা মিলস্-এর সুদর্শন গোয়েঙ্কা ফোন করছেন। "মিস্টার ব্যানার্জি, সেদিন আপনার ফ্রেন্ড নটবর মিটার সব বলেছেন। মেনি থ্যাংকস। হাতে একটু সময় পেয়েছি। আজ কলকাতায় যাচ্ছি। গ্রেট ইন্ডিয়ান হোটেলে সন্ধ্যেবেলাটা আপনার জন্যে ফ্রি রাখবো...হ্যালো, হ্যালো...কিন্তু হোলনাইট নয়।"

সোমনাথের হাতটা কাঁপছে, গোয়েঙ্কাকে যা বলবে ঠিক করে রেখেছিল তা বলবার আগেই গোয়েঙ্কা বললেন, "তখন আপনার কেস নিয়েও কথা হবে—কুছু গুড নিউজ থাকতে পারে।"

সোমনাথ যা বলতে চেয়েছিল তা বলবার আগেই লাইন কেটে গেলো। সোমনাথ দু-তিনবার টেলিফোন ট্যাপ করে রিসিভারটা যথাস্থানে রেখে মাথায় হাত দিয়ে বসলো।

সোমনাথ এখন আর বাধা দেবে না। সময়ের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেবে। গোয়েংকাকে ট্রাঙ্ককল করে বলবে না—সে ব্যস্ত আছে এবং নটবর মিটার যেসব কথা বলেছেন তার জন্যে সোমনাথ দায়ী নয়।

সোমনাথের আর কোনো উপায় নেই। এখন নটবরবাবুকে ধরতে পারলে হয়। ভদ্রলোক

যদি আবার কলকাতার বাইরে গিয়ে থাকেন তাহলে কেলেঙ্কারি।

দ্রুত কাজ করতে হবে সোমনাথকে। সেনাপতি লুকিয়ে লুকিয়ে বন্ধকীর কাজ করে। নতুন সোনার ঘড়িটা জমা রেখে সেনাপতি শ'পাঁচেক টাকা ধার দেবে না?

সেনাপতি এক কথায় রাজী হয়ে গেলো। বললো, "পাঁচ-ছ'শ যা ইচ্ছে নিন বাবু।"

"তাহলে ছ'শই দাও। হঠাৎ একটা পার্টি কলকাতার বাইরে থেকে আসছে। কত খরচ হবে জানি না।" সোমনাথ বললো।

সেনাপতি বললো, "আপনাকে তো ধার দিতে ভাবনা নেই। আপনি মদও খান না, মেয়েমানুষের কাছেও যান না। বোসবাবু সন্ধ্যেবেলায় টাকা চাইলে আমার চিন্তা হয়। ব্যবসায় না লাগিয়ে উনি সব টাকা হোটেলে রেখে আসেন।"

* * *

গোয়েঙ্কার প্রত্যাশিত ফোন এসেছে এবং সোমনাথের মত পাল্টেছে শুনে নটবর মিত্র বেশ খুশী হলেন। হ্যান্ডসেক করে বললেন, "এই তো চাই! সত্যি কথা বলতে কি, যে-পুজোর যে মন্তর!"

নাকে এক টিপ নস্যি গুঁজে নটবরবাবু বললেন, "মেয়েমানুষকে ব্যবসার কাজে লাগাতে বাঙালীদের যত আপত্তি—কিন্তু জাপানের দিকে তাকিয়ে দেখুন। বড় বড় বিজনেস ট্রানজাকশন গীসা বাড়িতে বসেই হয়ে যাচ্ছে। মেয়েমানুষ-খরচার রসিদ পর্যন্ত অফিসে জমা দিয়ে জাপানীরা টাকা নিচ্ছে—দেখুন তার ফলটা। পৃথিবীতে আজ খ্যাঁদা জাপানীর একটিও শত্রু নেই!"

সোমনাথ মাথা নিচু করে রইলো।

নটবর বললেন, "অত দূরেই বা যাবার দরকার কী? বাঙালী মেয়েদের ব্যবসায় লাগিয়ে কত শেঠজী এই কলকাতা শহরে লাল হয়ে যাচ্ছে।"

সোমনাথ নিজের স্নায়ুগুলো শান্ত করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

গোয়েঙ্কা যে আজই কলকাতায় আসছেন নটবরবাবু বুঝতে পারেননি। খবরটা শুনেই তিনি লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, "যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যে হয়! গোয়েঙ্কা আর দিন পেলো না? আজকে আমি যে ভীষণ ব্যস্ত। এক বড় পার্টিকে মেয়েমানুষ দিয়ে খুশী করাতে হবে। অথচ এখনও কিছুই ব্যবস্থা করা হয়নি। বেরুবো-বেরুবো করছি, এমন সময় আপনি হাজির হলেন।"

ঘড়ির দিকে তাকালেন নটবরবাবু। বললেন, "আপনার তো চুনোপুঁটি কেস। এই পার্টি আমার এক বন্ধুকে দু-মাসে ছেষট্টি হাজার টাকা পাইয়ে দিয়েছে। অনেক রিকোয়েস্টের পর পার্টি বন্ধুর নেমন্তন্ন নিয়েছে—আর আমার বন্ধুটি আপনারই মতন। ব্যবসা করছে, টাকা কামাচ্ছে, কিন্তু এসব লাইনের কোনো খোঁজই রাখে না। আমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে বসে আছে! সকাল থেকে তিনবার ফোন করেছে—দাদা খরচের জন্যে ভাববেন না। লোকটি বড় উপকারী বন্ধু। কোনোরকম বিপদ, কষ্ট বা ক্ষতি না হয় যেন ভদ্রলোকের। আমি বললুম, সেদিকে নিশ্চিন্ত থেকো। এ-লাইনে একবার যখন নটবর মিত্তিরের কাছে এসেছো, তখন নাকে মাস্টার্ড অয়েল ঢেলে ঘুমিয়ে থাকো। নটবর মিত্তির ইজ নটবর মিত্তির।"

সোমনাথের কথা হারিয়ে যাচ্ছে। সে শুধু শুনেই চলেছে। নটবরবাবু মাথা চুলকে দুঃখ

করলেন,"দুটো কেস একসঙ্গে পড়ে গেলো। তবে আপনি চিন্তা করবেন না। গোয়েংকা যে আপনার কাছেও জীবনমরণের ব্যাপার, তা বুঝতে পারছি। আপনার একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে। তবে ভাই আমার সঙ্গে ঘুরতে হবে—কারণ দুটো কেস একই সঙ্গে তো। একটার পুরো দায়িত্ব ঘাড়ে চেপে রয়েছে। বন্ধুও এখানে নেই—পার্টিকে আনতে গাড়ি নিয়ে কলকাতার বাইরে চলে গেছে!"

ঘড়ির দিকে তাকালেন নটবর। তারপর হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "মুখটুখ শুকিয়ে যাচ্ছে কেন? ভাবছেন, নটবর মিত্তির অনেক খরচ করিয়ে দেবে? আপনার কেসে তা হবে না। ওই আপনার বাহাত্তর নম্বর ঘরের শ্রীধর শর্মা, ওর কাছ থেকে প্রতি কেসে কান মলে দেড়-হাজার দু-হাজার টাকা আদায় করি। কিন্তু আপনার কেসে মা কালীর দিব্যি বলছি একটি পয়সা লাভ করবো না।"

আবার ঘড়ির দিকে তাকালেন নটবর মিত্তির। বললেন, "গোয়েঙ্কা উঠছে কোথায়? না, আপনাকেই জায়গার ব্যবস্থা করতে বলেছে?"

গ্রেট ইন্ডিয়ান হোটেল শুনে খুশী হলেন নটবর মিটার। "একটুখানি সুবিধা হলো। আমার বন্ধুর পার্টিকেও ওখানে নিয়ে যাবো ভাবছিলাম।"

নটবরবাবু দশ মিনিট সময় চাইলেন। বললেন, "ঠিক দশ মিনিট পরে পোদ্দার কোর্টের সামনে আপনি অপেক্ষা করুন—আমি চলে আসবো।"

রবীন্দ্র সরণি ও নতুন সি-আই-টি রোডের মোড়ে একটা বিবর্ণ হতশ্রী ল্যাম্প পোস্টের কাছে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে সোমনাথ ব্যানার্জি।

রিকশা, ঠেলাগাড়ি, বাস, লরি, টেম্পোর ভিড়ে ট্রাফিকের জট পাকিয়েছে। এরই মধ্যে একটা সেকেলে ট্রামের বৃদ্ধ ড্রাইভার বাগবাজার যাবার উৎকণ্ঠায় টং টং করে ঘণ্টা বাজাচ্ছে। সোমনাথের মনে হলো, একটা প্রাগৈতিহাসিক গিরগিটি কেমনভাবে কালের সতর্ক প্রহরীকে ফাঁকি দিয়ে কলকাতায় এই জন-অরণ্য দেখতে এসে আটকে পড়েছে। বৃদ্ধ গিরগিটি মৃত্যু-যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে কাতরভাবে আর্তনাদ করছে। মায়া হচ্ছে সোমনাথের। পৃথিবীতে এতো প্রশস্ত রাজপথ থাকতে কোন্ ভাগ্যদোষে বেচারা এই জ্যাম-জমাট রবীন্দ্র সরণিতে এসে আটকে পড়লো? আগেকার দিন হলে, সোমনাথ সত্যিই একটা কবিতা লিখে ফেলতো। নাম দিতো জন-অরণ্যে প্রাগৈতিহাসিক গিরগিটি।

আজ যে ১লা আষাঢ় তা আবার সোমনাথের মনে পড়লো। আকাশের দিকে তাকালো সোমনাথ। না, ১লা আষাঢ়ের সেই বহু প্রত্যাশিত মেঘদূতের কোনো ইঙ্গিত নেই আকাশে। বিরাট এই শহরটা মরুভূমি হয়ে গেছে। এখানে আর বৃষ্টি হবে না। বৃষ্টি হলে সোমনাথের কিন্তু খুব আনন্দ হতো। এখানে দাঁড়িয়ে সে ভিজতো। আষাঢ়ের প্রবল বর্ষণে যদি সব কিছু কালগর্ভে তলিয়ে যেতো, তাহলে আরও ভালো হতো।

ববীন্দ্র সরণি ধরে কত লোক দ্রুতবেগে হাঁটছে। দু-একজন পথচারী সোমনাথের দিকে একবার তাকিয়েও গেলো। এরা কি জানে তরুণ সোমনাথ ব্যানার্জি কেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে? কোথায় সে যাচ্ছে?

এইখানে দাঁড়িয়েই তো এক অন্তহীন অতীত পরিক্রমা করে এলো সোমনাথ। তার জীবনের প্রতিটি ঘটনা সোমনাথ এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ঘড়ির দিকে তাকালো সোমনাথ। নটবর মিত্র দেরি করছেন। নির্ধারিত দশ মিনিট হয়ে গেছে।

দূর থেকে এবার হাঁপাতে-হাঁপাতে নটবরবাবুকে আসতে দেখা গেলো। বললেন, "কী ব্যাপার বলুন তো? আজ ১লা আষাঢ় বলে অনেকের মনেই রোমান্স জাগছে নাকি? অফিস থেকে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় আপনার বন্ধু শ্রীধরজীর ফোন। ওঁর এক পার্টির জন্যে একটু ব্যবস্থা করতে চান। আমি স্রেফ বলে দিলাম আজ আমার পক্ষে আর কোনো কেস নেওয়া সম্ভব নয়। খুব যদি আটকে পড়ো, নিজে রিপন স্ট্রীটে মিস সাইমনের কাছে যাও।"

"চলুন চলুন মশাই, আগে গ্রেট ইন্ডিয়ান হোটেলটা সেরে আসি।" নটবরবাবু নিজের ঢলঢলে প্যান্ট কোমর পর্যন্ত তুলে সোমনাথকে তাড়া লাগালেন।

গ্রেট ইন্ডিয়ান হোটেলে নিজের পার্টির জন্যে স্পেশাল কামরা রিজার্ভ করলেন মিস্টার

মিটার। ওঁর সঙ্গে হোটেল রিসেপশনের লোকদের বেশ চেনা মনে হলো।

"আপনার বুকিং কে করবে?" নটবর মিত্র এবার সোমনাথকে জিজ্ঞেস করলেন।

সোমনাথ তো তা জানে না। এবারে নটবরবাবু মৃদু বকুনি লাগালেন। "ডোবাবেন মশাই? গোড়ার জিনিসগুলো খোঁজ নেবেন তো? গোয়েঙ্কা হোটেল বুকিং করেছেন কিনা, না আপনাকে করতে হবে? দেখি একবার খোঁজ নিয়ে।"

খবর নিয়ে জানা গেলো মিস্টার গোয়েঙ্কার নামে একুশ নম্বর কামরা আজ সকালেই বুক করা হয়েছে। হাঁপ ছাড়লেন নটবর। "বাঁচা গেলো—আজকাল হুট করলেই গ্রেট ইন্ডিয়ানে বুকিং পাওয়া যায় না।"

হোটেল থেকে সোমনাথ বেরিয়ে আসছিল। নটবরবাবু আবার বকুনি লাগালেন। "বিজনেসে যদি টিকে থাকতে চান—জনসংযোগটা ভালোভাবে শিখুন। আমাদের এসব কেউ বলে দেয়নি—ঠেকে-ঠেকে, ধাক্কা খেতে-খেতে টোয়েন্টি ইয়ারস ধরে শিখতে হয়েছে। এখানে বসে গোয়েঙ্কাজীর নামে একটা মিষ্টি চিঠি লিখুন। লিখুন—ওয়েলকাম টু ক্যালকাটা। সব ব্যবস্থা পাকা। আপনি সন্ধ্যে সাতটার সময় আসছেন।"

মন্ত্রমুগ্ধের মতো সোমনাথ চিঠি লিখে ফেললো। নটবর মিত্তির বললেন, "খামের উপর গোয়েঙ্কার নাম লিখুন—বাঁদিকের ওপরে লিখুন, টু অ্যাওয়েট অ্যারাইভাল।"

নস্যি নিলেন নটবর মিটার। জিজ্ঞেস করলেন, "এসব করলুম কেন বলুন তো? আপনার পার্টি বুঝবে মিস্টার ব্যানার্জির ম্যানেজমেন্ট খুব ভালো। হোটেলে পা দিয়েই চিঠি পেলে গোয়েঙ্কার আর কোনো উদ্বেগ থাকবে না—উটকো পার্টি এসে সস্তা কোনো লোভ দেখিয়ে ভাঙিয়ে নিতে পারবে না।"

তারপর বললেন, "দিন দশ টাকা। হচ্ছে যখন, সব কিছু ভালোভাবে হোক।"

রিসেপশনিস্ট মিস্টার জেকবকে নটবর বললেন, "মিস্টার গোয়েঙ্কা আসা মাত্র একুশ নম্বর ঘরে কিছু ফ্লাওয়ার পাঠিয়ে দেবেন ব্রাদার। ফুলের সঙ্গে মিস্টার ব্যানার্জির এই কার্ড দিয়ে দেবেন।"

আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে নটবর মিটার বললেন, "প্রাথমিক কাজ সব হয়ে গেলো। রিটায়ার করে, লোকাল ছেলেদের ট্রেনিং-এর জন্যে একটা স্কুল খুলবো ভাবছি, মিস্টার ব্যানার্জি। বাঙালীদের সব গুণ আছে, শুধু এই জনসংযোগটা জানে না বলে কম্পিটিশনে পিছিয়ে যাচ্ছে।"

"নাউ!" মিস্টার নটবর টাকে হাত রাখলেন। এবার স্পেশিফিকেশন। আমার বন্ধুর পার্টি যা স্পেশিফিকেশন দিয়েছে, তাতে আমি তো মাথায় হাত দিয়ে বসে আছি। গোয়েঙ্কাজীর পছন্দ কী বলুন?"

এবার সত্যিই বিরক্ত হলেন নটবর মিটার। "না মশাই, আপনার দ্বারা কিছু হবে না। বিজনেস লাইন ছেড়ে দিন। একজন সম্মানিত অতিথিকে আপ্যায়ন করবেন, অথচ তাঁর পছন্দ-অপছন্দ জেনে নিলেন না? যে লোক কাটলেট ভালোবাসে তাকে কমলালেবু দিলে সে কি পছন্দ করবে? এখন ভদ্রলোককে কোথায় পাই। ফোন করেও তো ধরা যাবে না।"

দুরূহ সমস্যার সমাধান নটবর মিটার নিজেই করলেন। বললেন, "কথাবার্তা যতটুকু শুনেছি, তাতে মনে হয় ভদ্রলোকের গাউনে রুচি নেই—শাড়ির দিকেই ঝোঁক। জাতের কথা আমি মোটেই ভাবছি না। এই একটা ব্যাপারে নিজের জাতের ওপর টান নেই গোয়েঙ্কাজীদের। পছন্দসই বেঙ্গলী গার্ল পেলে খুব খুশী হবেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো হাল্কা না ভারি? খুব ডিফিকাল্ট কোশ্চেন! এই পয়েন্টে বোকামি করেই তো শ্রীধরজী সেবার ফিফটি থাউজেন্ড রুপিজের অর্ডার হারালেন। পারচেজ অফিসার একটু সেকেলেপন্থী—স্বাস্থ্যবতী মেয়েমানুষ পছন্দ করে। উনি সেসব না বুঝে, নিয়ে গেলেন আধুনিকা রত্না সাহাকে—একেবারে গাঁজার ছিলিমের মতো রোগা চেহারা, ফরাসী সাহেবরা যা প্রেফার করে। রত্নার বত্রিশ সাইজের জামার দিকে একবার নজর দিয়েই পার্টি বেঁকে বসলো—বললো, ছেলে না মেয়ে বুঝতে পারছি না, এখন খুব ব্যস্ত আছি, হঠাৎ একটা মিটিং পড়ে গেছে, পরে দেখা হবে। গেলো অর্ডারটা! মাঝখান থেকে রত্না সাহাকেও টাকা গুনতে হলো শ্রীধরজীর। আবার শাঁসালো মেয়েমানুষে

প্রচণ্ড অরুচি এমন পার্টিও যথেষ্ট দেখেছি। তারা কণ্ঠির মতো সঙ্গিনী চায়।"

সোমনাথের মাথা ধরে গেলো। ঘাড়ের কাছটা দপদপ করছে। চিন্তিত বিরক্ত নটবর বললেন, "ভেবে আর কী হবে? চলুন এনটালির দিকে। রিস্ক নেওয়া যাক। মলিনা গাঙ্গুলীর চেহারা মাঝামাঝি। রোগাও না মোটাও না। আপার বডিটা একটু হেভি, কিন্তু খুব টাইট—গোয়েঙ্কার অপছন্দ হবে না।"

গাড়ি চলছে। ধর্মতলা ও চৌরঙ্গীর মুখে দূর থেকে সোমনাথ যাকে দেখতে পেলো তাতে তার মুখ কালো হয়ে উঠলো। অনেকগুলো বই হাতে তপতী বাসের জন্যে অপেক্ষা করছে—নিশ্চয় কনস্যুলেট লাইব্রেরি থেকে বই নিয়েছে। তপতী বোধহয় সোমনাথকে লক্ষ্য করেছে—না হলে অমনভাবে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে কেন?

সোমনাথ দ্রুত উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। ব্যাপারটা নটবর মিত্তির দেখলেন এবং রসিকতা করলেন, "কী মিস্টার ব্যানার্জি? মেয়েমানুষেরা কি বাঘ? অমনভাবে ঘামছেন কেন? বাস স্ট্যান্ডের এক মহিলা আপনার দিকে যেভাবে তাকালেন! এককালে আমাদেরও সময় ছিল! এখন এই চাপাটির মতো টাক পড়ায় কেউ আর ফিরে তাকায় না।"

◆

ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনের কাছে হলুদ রংয়ের একতলা বাড়ির সামনে গাড়ি থামাতে বললেন নটবর মিত্র। নিচু গলায় সোমনাথকে বললেন, আপনি গাড়িতেই বসুন। একেবারে ভদ্রলোকের পাড়া। কারুর সন্দেহ হলেই মুশকিল। মিসেস গাঙ্গুলীও জেনুইন ফুল গেরস্ত। স্বামী কর্পোরেশনের ক্লার্ক—একটু মদ খাবার অভ্যাস আছে, তাই মাইনের টাকায় চালাতে পারেন না।"

সোমনাথ গাড়িতে বসে রইলো। মিস্টার মিটার দরজার কলিং বেল টিপলেন এবং ভিতরে ঢুকে গেলেন। একটু পরে হাসি মুখে বেরিয়ে এসে সোমনাথকে বললেন, "চলুন। মিসেস গাঙ্গুলীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই!" নটবর এবার ফিসফিস করলেন, "একেবারে টাইট নারকুলে বাঁধাকপির মতো বুক—গোয়েঙ্কার খুব পছন্দ হবে।"

নটবরের পিছন পিছন সোমনাথ ঘরের মধ্যে ঢুকলো। পরিপাটি পরিচ্ছন্ন বসবার ঘর। সফ্ট-লেদার মোড়া নরম সোফাসেটে সোমনাথ বসলো। ঘরের এককোণে কিছু বাংলা এবং ইংরিজী বই। দেওয়ালে দু-তিনজন শ্রদ্ধেয় মনীষীর ছবি। এক কোণে একটা টাইমপিস ঘড়ি। এবং তার পাশেই নিকেল-করা সুদৃশ্য ফোল্ডিং-ফ্রেমে মিসেস গাঙ্গুলী ও আর-এক ভদ্রলোকের ছবি। নিশ্চয় মিস্টার গাঙ্গুলী হবেন।

মিসেস গাঙ্গুলীর বয়স একত্রিশ-বত্রিশের বেশি নয়। বেশ লম্বা এবং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। মুখটি বেশ সরল—গৃহবধূর মতোই। কোথাও পাপের ছায়া নেই। মলিনা বোধহয় সবে ঘুম থেকে উঠেছেন। কারণ চোখদুটোতে এখনও দিবানিদ্রার রেশ রয়েছে। হাল্কা নীল রংয়ের ফুল ভয়েল শাড়ি পরেছেন মিসেস গাঙ্গুলী—সেই সঙ্গে চোলি টাইপের টাইট সাদা সংক্ষিপ্ত ব্লাউজ, ফলে বুকের অনেকখানি দৃশ্যমান।

ভদ্রমহিলা আড়চোখে সোমনাথের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। সোমনাথ চোখ নামিয়ে নিলো। নটবর বললেন, "ইনিই আমার বন্ধু মিস্টার ব্যানার্জি। বুঝতেই পারছেন।"

মিসেস গাঙ্গুলী হাত দুটো তুলে এমনভাবে আলতো করে নমস্কার করলেন যে আন্দাজ

করা যায় বালিকা-বয়সে তিনি নাচের চর্চা করতেন।

"এবার একটা টেলিফোন নিন, মিসেস গাঙ্গুলী। টেলিফোন ছাড়া আপনাকে আর মানায় না।" অভিযোগ করলেন নটবরবাবু।

ফিক করে হাসলেন মিসেস গাঙ্গুলী। ডান কাঁধে ব্রা-এর যে স্ট্র্যাপ উঁকি মারছিল, সেটা ব্লাউজের মধ্যে ঠেলে দিতে দিতে ভদ্রমহিলা বললেন, "ওঁর ইচ্ছে নয়। বলেন, ফোন হলেই তোমাকে সব সময় জ্বালাবে। আজেবাজে লোকের তো অভাব নেই।"

নটবরবাবু বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "আজেবাজে লোকের সঙ্গে আপনার কাজ কোথায়? আমি তো জানি, একদম হাইয়েস্ট লেভেলে খুব জানাশোনা পার্টি ছাড়া আপনাকে পাওয়াই যায় না।"

খুশী হলেন মিসেস গাঙ্গুলী। দেহ দুলিয়ে বললেন, "মুড়ি-মিছরির তফাত যারা বোঝে তারা আমার কাছে আসে। আপনি তো জানেন, শুধু মুচমুচে গতর থাকলেই এ-লাইনে কাজ হয় না। আজকালকার মানুষের কত উদ্বেগ, মাথায় তাঁদের কত দুশ্চিন্তা। এইসব মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দুশ্চিন্তা ভুলিয়ে দেওয়া, আদর আপ্যায়ন করে দু দণ্ডের শান্তি দেওয়া, একটু প্রশ্রয় দিয়ে খেলায় নামানো কি সোজা কাজ! পেটে একটু বিদ্যে না থাকলে, এসব লাইনে নাম করা যায় না।"

"তা তো বটেই!" মিসেস গাঙ্গুলীর সঙ্গে নটবর একমত হলেন।

ঠোঁট উল্টে মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, "আজকাল আনাড়ি যেসব মেয়ে আসছে, তারা পুরুষমানুষের মনের খিদের কথাই জানে না। তারা কী করে ভিতরের খবর বার করবে? টাকা খরচ করে যে বিজনেসম্যান গেস্ট পাঠালেন তাঁর কোনো লাভ হয় না।"

নটবর মিত্তির বললেন, "তা তো বটেই।"

ফিক করে হাসলেন মিসেস গাঙ্গুলী। তারপর নটবরকে আক্রমণ করলেন। বললেন, "আপনার তো কোনো পাত্তাই নেই।"

"কাজকর্ম তেমন কই? শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না।" নটবর বেশ বিব্রত হয়ে পড়লেন।

বিশ্বাস করলেন না মিসেস গাঙ্গুলী। মুখে হাত চাপা দিয়ে ছোট্ট হাই তুললেন, তারপর আবার ফিক করে হেসে বললেন, "আমি ভাবলুম মিসেস বিশ্বাসকে সব কাজকর্ম দিচ্ছেন। আমাকে ভুলেই গেলেন।"

"তা কখনো সম্ভব?" নটবররাবু সুন্দর অভিনয় করলেন। আমাদের বরং আপনাকে কাজ দিতে সঙ্কোচ হয়—আপনি ক্রমশ যে লেভেলে উঠে যাচ্ছেন। খোদ মিস্টার বাজোরিয়ার প্যানেলে ঢুকেছেন আপনি, সে খবর পেয়েছি আমি। আমাদের যেসব পার্টি তাদের বেশির ভাগ মুড়ি কিনতে চায়। আজ যেমনি শুনলাম এই বন্ধুটির মিছরি দরকার, সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে পাকড়াও করে আনলুম। একবার ভাবলুম চিঠি লিখে দিই।"

"না দিয়ে ভালোই করেছেন।" লাল পাথর-বসানো কানের দুল নাড়িয়ে মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, "অজানা-অচেনা লোকের সঙ্গে আমি কথা পর্যন্ত বলি না। যা আজকাল অবস্থা হয়েছে! আপনার মিসেস বিশ্বাস গোপনে পুলিশে খবর দিয়ে আমাদের জানাশোনা একটা মেয়েকে ধরিয়ে দিয়েছেন। অজন্তা মিত্র খুব ভালো কাজকর্ম করছিল। মিসেস বিশ্বাসের সহ্য হলো না। এতো হিংসের কী আছে বাবা? না-হয় তোমার দুজন রেগুলার খদ্দের অজন্তার কাছে যাচ্ছিল। কই, আমি তো হিংসে করি না মিসেস বিশ্বাসকে। আমার একটা সায়েব খদ্দেরকে উনি তো কব্জা করেছেন।"

নটবর মিত্তির তাড়াতাড়ি কথা শেষ করতে চান। তাই বললেন, "তাহলে আমার এই বন্ধুর?"

"কবে?" হাই তুলে মুখের সামনে তিনবার টুসকি দিলেন মিসেস গাঙ্গুলী।

আজকেই শুনে মিসেস গাঙ্গুলী বিশেষ উৎসাহিত বোধ করলেন না। বললেন, "এ যে ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে হয়ে গেলো, মিত্তির মশাই। আজ একটু বিশ্রাম নেবো ভাবছিলাম। পর পর ক'দিন বড় বেশি খাটাখাটনি চলেছে।"

"আজকের দিনটা চালিয়ে দিন।" অনুরোধ করলেন নটবর মিত্তির। "কাছাকাছি ব্যাপার।"

বুকের আঁচল সামলাতে সামলাতে মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, "বেশি রাতের কাজকম্ম আজকাল নিই না, নটবরবাবু। উনি বিরক্ত হন।"

এবার খুশী হলেন নটবরবাবু। "রাতের ব্যাপার হলে আপনাকে বলতামই না। পার্টি নিজেই দশটার মধ্যে ফাঁকা হয়ে যাবে।"

এবার টাকার অঙ্কটা জানতে চাইলেন নটবরবাবু।

"বসবেন কে?" সুগঠিত দেহটি পাতলা কাপড় দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে প্রশ্ন করলেন মিসেস গাঙ্গুলী।

"খুবই ফার্স্ট ক্লাস ভদ্রলোক—আমাদের ছোট ভাই-এর মতো। মিস্টার গোয়েঙ্কা।"

মুখ বেঁকালেন মিসেস গাঙ্গুলী। "লোকগুলো বড় পাজী হয়।"

"যা ভাবছেন—তা মোটেই নয়। কার্তিকের মতো চেহারা। অতি অমায়িক ভদ্রলোক।"

মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, "গেস্ট হাউস বা বাড়ি হলে দুশো টাকা। এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে এবং পেঁাছে দিতে হবে। হোটেল হলে কিন্তু তিরিশ টাকা বেশি লাগবে, আগে থেকে বলে রাখছি।"

"আপনার সব কথা মেনে নিচ্ছি, মিসেস গাঙ্গুলী। আপনি তো জানেন আমি দরদাম পছন্দ করি না। কিন্তু ওই হোটেলের জন্য রেট বাড়িয়ে দেওয়াটা কেমন যেন লাগছে।"

রেগে উঠলেন মিসেস গাঙ্গুলী। ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "হোটেলে আমাদের বাড়তি খরচ আছে, নটবরবাবু। অকট্রয় দিতে হয়। একদিনের কাজ তো নয়—দারোয়ান থেকে আরম্ভ করে ম্যানেজারবাবু পর্যন্ত হোটেলের সবাইকে সন্তুষ্ট করতে তিরিশ টাকা লেগে যায়। ওরা আমাদের মুখ চিনে গেছে—বিনা কাজে কোনো গেস্টের সঙ্গে দেখা করতে গেলেও বিশ্বাস করে না। আজ যদি টাকা দিয়ে সন্তুষ্ট না করি, তাহলে আগামীকাল হোটেলে ঢুকতেই দেবে না। ঢুকতে দিলেও, ঘরে গিয়ে হাঙ্গামা বাধাবে। আগে থেকে বলে রাখা ভালো—না হলে অনেকে ভাবে, তালে পেয়ে তিরিশটা টাকা ঠকাচ্ছি।"

ঘড়ির দিকে তাকালেন মিসেস গাঙ্গুলী। জিজ্ঞেস করলেন, "একটু চা খাবেন?"

সোমনাথ রাজী হলো না। নটবরবাবু বললেন, "আরেকদিন হবে। শুধু চা কেন লুচি মাংস খেয়ে যাবো। মিস্টার গাঙ্গুলীকে বলবেন, পছন্দ মতো বাজার করে রাখতে।"

ফিক করে হাসলেন মিসেস গাঙ্গুলী। তারপর বললেন, "তাহলে ঘন্টাখানেক পরে আসুন। আমি তৈরি হয়ে নিই।"

সোমনাথকে সঙ্গে নিয়ে নটবর মিত্র সার্কুলার রোডে এসে দাঁড়ালেন। নটবর মিত্র এবার বিদায় নিতে চান। সোমনাথকে বললেন, "আপনার সমস্যা তো সমাধান হয়ে গেলো। ঘণ্টাখানেক পরে এসে মিসেস গাঙ্গুলীকে নিয়ে সোজা গ্রেট ইন্ডিয়ান হোটেলে চলে যাবেন।"

কিন্তু সোমনাথের ইচ্ছে নটবর যেন চলে না যান। সোমনাথের অনুরোধ ঠেলতে পারলেন না নটবরবাবু। বললেন, "আমার যে অনেক কাজ! এক নম্বর পার্টির এখনও ব্যবস্থা হলো না।"

সোমনাথ ভেবেছিল কোনো চায়ের দোকানে বসে একটা ঘণ্টা কাটিয়ে দেবে। কিন্তু নটবরবাবু বললেন, "কোথায় বসে থাকবেন? চলুন, আমার সঙ্গে ঘুরে আসবেন।"

নটবরবাবুর সত্যিই দুশ্চিন্তা! বিরক্তভাবে বললেন, "এ-লাইনে বাঙালী মেয়েদের এতো সুনাম—আজকাল এক্সপোর্ট পর্যন্ত হচ্ছে! অথচ আমার ফ্রেন্ডের পার্টি অদ্ভুত এক বায়না ধরেছে। পাঞ্জাবী, গুজরাতী, সিন্ধি মেয়ে পর্যন্ত সাপ্লাই করেছি—কিন্তু উনি চান বড়-বাজারী মেয়ে। কোথায় পাবো বলুন তো? এ-লাইনে সাপ্লাই নেই। অনেক কষ্টে একজন ফ্রেন্ডের কাছে ঊষা জৈন বলে একটা মেয়ের খবর পেয়েছি। সায়েবপাড়ায় থাকে। যাই একবার দেখে আসি।"

রডন স্ট্রীটে গাড়ি থামলো। নটবরবাবু নাকে নস্যি গুঁজে বললেন, "চলুন না? আপনারও জানাশোনা হয়ে থাকবে।"

সোমনাথ রাজী হলো না। তার মাথা ধরেছে। কপালটা টিপে ধরে সে গাড়ির মধ্যে

চুপচাপ বসে রইলো।

বেশ কিছুক্ষণ পরে নটবরবাবু ঊষা জৈনের কাছ থেকে ফিরে এলেন। বিরক্তভাবে বললেন, "ভীষণ ডাঁট মশাই! স্নান করছিলো, আধঘণ্টা বসিয়ে রাখলো। আমি ভাবলুম, না জানি কি ডানাকাটা পরী হবেন! সাজগুজু করে যখন অ্যাপিয়ারেন্স দিলেন তখন দেখলুম, মোস্ট অর্ডিনারি। গায়ের রংটা ফর্সা, কিন্তু কেমন যেন টলটলে ঢলঢলে চেহারা—কোনো বাঁধুনি নেই। মিনিমাম ছত্রিশ বছর বয়স হবে, অথচ আমাকে বললে কিনা সবে পঁচিশে পড়েছে।" নিজের টাকে নটবরবাবু একবার হাত বুলিয়ে নিলেন। "ঐ গতর নিয়েই ধরাকে সরা জ্ঞান করছে! মিস্টার রামসহায় মোরে ওঁর এক বন্ধুর সংগে শেয়ারে জয়পুর থেকে এই মেয়েকে আট মাস আগে কলকাতায় আনিয়েছিলেন। খরচাপাতি আধা-আধি বখরা হচ্ছিল। বন্ধুর ব্লাড-প্রেসার বাড়ায়, ভদ্রলোককে দুষ্টুমি কমাতে হয়েছে। তাই এখন মেয়েটা কিছু কিছু প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছে। স্বয়ং মিস্টার মোরে টেলিফোনে আমাকে ইনট্রোডিউস করে দিয়েছেন, বলেছেন আমার বুজম ফ্রেন্ড। তবু ঊষা জৈন সাতশ' টাকার কমে রাজী হলো না। বললো, বম্বেতে নাকি এখন হাজার টাকা রেট। তা মশাই, লংকাতে সোনার দাম চড়া হলে আমার কী বলুন তো? অন্য সময় হলে কোন্ শালা রাজী হতো—নেহাত ঐ ঊষা জৈন নামটার জন্যে! আমার কোনো চয়েস নেই। লোকাল মেয়ে হলে ছুঁড়ী একশ' টাকা পেতো না।"

◆

মিসেস গাঙ্গুলী রেডি হয়েই বসে আছেন। এক ঘণ্টা ধরে সমস্ত দেহে ভদ্রমহিলা যথেষ্ট চুনকাম করেছেন। নাক, চোখ, কপাল, ঠোঁট, কাঁধ, গ্রীবা থেকে আরম্ভ করে হাতের নখ, এমন কি পায়ের পাতায় প্রসাধনের সযত্ন প্রলেপ নজরে আসছে। নটবর মিত্তির রসিকতা করলেন, "আপনাকে চেনাই যাচ্ছে না—দুগ্‌গা ঠাকরুণ মনে হচ্ছে।"

বেশ খুশী হলেন মিসেস গাঙ্গুলী। বললেন, "গোয়েঙ্কা তো, তাই এরকম সাজলাম। ওরা একটু ঝলমলে জামাকাপড় পছন্দ করে, চড়া রুজ ওদের খুব ভালো লাগে। কিন্তু লিপস্টিক সম্বন্ধে ওদের খুব ভয়—পাঞ্জাবিতে বা গেঞ্জিতে লাগলে অনেক লিপস্টিকের রং উঠতেই চায় না। বাড়িতে বউ-এর কাছে ধরা পড়ে যাবার রিস্ক থাকে।"

মিসেস গাঙ্গুলী এবার সিগারেট ধরালেন। সামান্য একটু ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "কাস্টমারের সামনে আমি কিন্তু স্মোক করি না। তাই এখন একটা খেয়ে নিচ্ছি।"

"একটা কেন, দশটা সিগারেট খেতে পারেন আপনি—হাতে যথেষ্ট সময় আছে," নটবর মিত্র বললেন।

সিগারেটে আর একটা টান দিয়ে, কমনীয় অথচ অটুট দেহখানি ঈষৎ দুলিয়ে মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, "দুশো টাকায় আর চলে না মিত্তির মশাই। জিনিসপত্রের দাম যেরকম বাড়ছে, একবার সাজগোজেই ঊনিশ-কুড়ি টাকা খরচ হয়ে যায়। এই কাপড় কাচতেই পাঁচ টাকা নিয়ে নেবে—আমি আবার যে কাপড় পরে একবার কাজে বেরিয়েছি তা দুবার পরতে পারি না, ঘেন্না করে। তাছাড়া দামী ল্যাভেন্ডার পাউডার এবং স্যাচেট সেন্ট আমি ব্যাগের মধ্যে নিয়ে যাই। এক-একজন কাস্টমারের গায়ে যা ঘামের গন্ধ! আধ কৌটো পাউডার মাখাবার পরেও দুর্গন্ধে বমি ঠেলে আসে।"

"আপনার কাজের দাম কী আর টাকায় দেওয়া যায়?" বিনয়ে বিগলিত নটবর উত্তর দিলেন। "হাই-লেভেলের লোকদের আপনার মতো আপ্যায়ন করতে কে পারবে?"

"তা আপনাদের আশীর্বাদে অনেক বাঘ-সিংহকে বশ করে পায়ের কাছে লুটোপুটি খাইয়েছি!" বেশ গর্বের সঙ্গেই উত্তর দিলেন মিসেস গাঙ্গুলী। "পোষ মানাতে না পারলে আপনারাই-বা পয়সা ঢালবেন কেন? একটা কিছু উদ্দেশ্য আছে বলেই তো পার্টির বিছানায় আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন।"

"আপনি তো সবই বোঝেন মিসেস গাঙ্গুলী। বিলেত-আমেরিকা হলে আপনার মতো স্পেশালিস্ট লাখ লাখ টাকা রোজগার করতেন," বললেন নটবর মিত্র।

নাকের ডগায় পাউডার ঘষতে ঘষতে মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, "গোয়েঙ্কার কাছ থেকে কোনো খবর-টবর বার করবার থাকলে এখনই বলে দিন। তাহলে ভালো করে মদ-টদ খাওয়াবো।"

হেঁ-হেঁ করে হাসলেন নটবর। "কোনোরকম বিজনেস নেই। স্রেফ সৌজন্যের জন্যে আপ্যায়ন। মিস্টার গোয়েঙ্কা পুরোপুরি স্যাটিসফ্যাকশন পেলেই আমরা খুশী।"

"ফলেন পরিচিয়তে! পনেরো দিনের মধ্যে আমাকে আবার নিয়ে যাবার জন্যে গোয়েঙ্কা যদি আপনাদের ব্যতিব্যস্ত না করে তাহলে আমার নামে কুকুর রাখবেন," এই বলে মিসেস মলিনা গাঙ্গুলী সোফা ছেড়ে উঠলেন।

এবার বিরাট এক কাঁচের গেলাসে ডাবের জল খেলেন মিসেস গাঙ্গুলী। বললেন, "আপনাদের দিতে পারলাম না—ঠিক দুটো ডাব ছিল। এটা আমাদের লাইনে ওষুধের মতো। শরীর বাঁচাবার জন্যে কাজে বেরোবার ঠিক আগে খেতে হয়।"

বেরোবার মুখেই কিন্তু গণ্ডগোল হলো। মিসেস গাঙ্গুলীর স্বামী ফিরলেন। অফিস থেকে বেরিয়ে পথে কোথাও মদ খেয়ে এসেছেন। মুখে ভকভক করে গন্ধ ছাড়ছে।

"তুমি কোথায় যাচ্ছ?" বেশ বিরক্তভাবে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক। মিসেস গাঙ্গুলীর হাসি কোথায় মিলিয়ে গেলো। বললেন, "কাজে। খুব তাড়াতাড়ি ফিরবো।"

ভদ্রলোক নেশার ঝোঁকে বললেন, "তোমাকে এতো ধকল সইতে আমি দেবো না, মলিনা। পর পর তিনদিন বেরোতে হয়েছে তোমাকে! আগামীকাল মিস্টার আগরওয়ালা তোমাকে নিতে আসবেন।"

মিসেস গাঙ্গুলী স্বামীকে সামলাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভদ্রলোক রেগে উঠলেন: "শালারা ভেবেছে কী? পয়সা দেয় বলে তোমার ওপর যা খুশী অত্যাচার করবে? কালকে তোমায় রাত দেড়টার সময় ফেরত পাঠিয়েছে। আমি তোমার স্বামী—আমি হুকুম করছি, আজ তোমাকে বিশ্রাম নিতে হবে।"

বিব্রত মিসেস গাঙ্গুলী মত্ত স্বামীকে আবার বোঝাবার চেষ্টা করলেন। বললেন, "এঁদের কথা দিয়েছি—এঁরা অসুবিধেয় পড়ে যাবেন।"

রক্তচক্ষু মিস্টার গাঙ্গুলী একবার সোমনাথ ও আরেকবার নটবরবাবুর দিকে তাকালেন। তারপর দাঁতে দাঁত চেয়ে স্ত্রীকে বললেন, "আমি তো ফরেন হুইস্কি ছেড়ে দিশী খাচ্ছি মলিনা। অত টাকা তোমায় রোজগার করতে হবে না।"

অপারগ মিসেস গাঙ্গুলী অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। ক্ষমা চেয়ে বললেন, "আমাকে ভুল বুঝবেন না। ওর মাথায় যখন ভূত চেপেছে তখন ছাড়বে না। এখন যদি আপনাদের সঙ্গে বেরোই—বাড়ি ফিরে দেখবো সব ভেঙে-চুরে ফেলেছে। কী হাঙ্গামা বলুন তো—এসব রটে গেলে আমার যে কী সর্বনাশ হবে ভেবে দ্যাখে না।"

সোমনাথ স্তম্ভিত। জেনেশুনে স্বামী এইভাবে বউকে ব্যবসায় নামিয়েছে। 'আর সোমনাথ তুমি কোথায় যাচ্ছ?' কোনো এক অদূর অন্ধকার গুহা থেকে আরেকজন সোমনাথ কাতরভাবে চিৎকার করছে।

কিন্তু সোমনাথ তো এই ডাকে বিচলিত হবে না। যে-সোমনাথ ভালো থাকতে চেয়েছিল তাকে তো সমাজের কেউ বেঁচে থাকতে দেয়নি। সোমনাথ এখন অরণ্যের আইনই মেনে চলবে।

নটবর মিত্রের অভিজ্ঞ মাথায় এখন নানা চিন্তা। টাকের ঘাম মুছে বললেন, "এই জন্যে বাঙালীদের কিছু হয় না। হতভাগ্য গাঙ্গুলীটা বাড়ি ফিরবার আর সময় পেলো না! কত পত্নীপ্রেম দেখলেন না? তোমারি রেস্ট দরকার! তোমায় যেতে দেবো না! আর কি রকম সতী-সাধ্বী স্ত্রী! স্বামী-দেবতার আদেশ অমান্য করলেন না!"

সোমনাথের চিন্তা, কাজের শুরুতেই বাধা পড়লো। এবার কী হবে?

নটবর নিজেই বললেন, "চলুন চলুন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোলে কাজ হবে না। সময় হাতে নেই। মিস্টার গোয়েঙ্কার কাছে আপনার মানসম্মান রাখতেই হবে!"

* * *

উড স্ট্রীটে এলেন নটবর মিত্র।

একটা নতুন বিরাট উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ির অটোমেটিক লিফটে উঠে বোতাম টিপে দিলেন নটবরবাবু। "দেখি মিসেস চক্রবর্তীকে। আপনি আবার যা সরল, যেন বলে বসবেন না অন্য জায়গায় সাপ্লাই না পেয়ে এখানে এসেছি।" সোমনাথকে সাবধান করে দিলেন নটবরবাবু।

পাঁচতলায় দক্ষিণ দিকের ফ্ল্যাটে অনেকক্ষণ বেল টেপার পর মিসেস চক্রবর্তীর দরজা খুললো। একটা ম্যাড্রাসি চাকর ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ অতিথির দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর কোনোকিছু না বলে ভিতরে চলে গেলো। নটবরবাবু নিজের মনেই বললেন, "মিসেস চক্রবর্তীর ফ্ল্যাট যেন ঝিমিয়ে পড়েছে।"

এবার প্রৌঢ়া কিন্তু সুদর্শনা মিসেস চক্রবর্তী ঘোমটা দিয়ে দরজার কাছে এলেন। নটবরবাবুকে দেখেই চিনতে পারলেন। মুখ শুকনো করে মিসেস চক্রবর্তী বললেন, "আপনি শোনেননি? আমার কপাল ভেঙেছে। মেয়েগুলোকে আচমকা পুলিশে ধরে নিয়ে গেলো।"

আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করলেন নটরববাবু।

মিসেস চক্রবর্তী বললেন, "আর জায়গা পেলো না। পুলিশের এক অফিসার রিটায়ার করে পাশের ফ্ল্যাটটা কিনলো। ওই লোকটাই সর্বনাশ করিয়েছে মনে হয়। এতোগুলো মেয়ে ভদ্রভাবে করে খাচ্ছিল।"

গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করলেন নটবর মিত্র। কাঁদ-কাঁদ অবস্থায় মিসেস চক্রবর্তী বললেন, "বাঙালী পুলিশ বাঙালীর রক্ত খাচ্ছে। ভদ্র পরিবেশে সাত-আটটা মেয়ে আমার এই ফ্ল্যাটে প্রোভাইডেড হচ্ছিল! কয়েকটি কলেজের স্টুডেন্টকেও চান্স দিচ্ছিলাম—হপ্তায় দু-তিন দিন দুপুরবেলায় কয়েকঘণ্টা সৎভাবে খেটে মেয়েগুলো ভালো পয়সা তুলছিল। কিন্তু কপালে সহ্য হলো না!"

"গভরমেন্ট পুলিশ এদের কথা যতো কম বলা যায় ততো ভালো," নটবরবাবু সান্ত্বনা দিলেন মিসেস চক্রবর্তীকে।

একটু থেমে মিসেস চক্রবর্তী বললেন, "নতুন একটা ফ্ল্যাটের খুব চেষ্টা করছি মিত্তির মশাই। কলকাতায় বাড়ি ভাড়ার যা অবস্থা! সায়েবপাড়ায় মাসে দেড় হাজারের কম কেউ কথা বলছে না। আমি মেরে কেটে আটশ' পর্যন্ত দিতে পারি।"

নটবরবাবুকেও ফ্ল্যাট দেখবার জন্য অনুরোধ করলেন মিসেস চক্রবর্তী। বিদায় দেবার আগে বললেন, "আবার একটু গুছিয়ে বসি—তখন কিন্তু পায়ের ধুলো পড়া চাই।"

যথেষ্ট হয়েছে। জন্মদিনে আমার জন্যে কী অভিজ্ঞতা লিখে রেখেছিলে, হে বিধাতা? সোমনাথ এবার ফিরে যেতে চায়। কিন্তু নটবর মিত্তির এখন ডেসপারেট। তাঁর ধারণা সোমনাথের কাছে তিনি ছোট হয়ে যাচ্ছেন। পার্ক স্ট্রীটের দিকে যেতে যেতে নটবর বললেন, "কলকাতা শহরে আপনাদের আশীর্বাদে মেয়েমানুষের অভাব নেই। মিস সাইমনের ওখানে গেলে এখনই এক ডজন মেয়ে দেখিয়ে দেবে। কিন্তু ওই সব যা-তা জিনিস তো জানা শোনা পার্টির পাতে দেওয়া যায় না। তবে আমি ছাড়ছি না—আমার নাম নটবর মিত্তির। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।"

◆

মিসেস বিশ্বাসের ফ্ল্যাটের কাছে হাজির হলেন নটবরবাবু। রুমা এবং ঝুমা নিজের দুই মেয়েকে মিসেস বিশ্বাস ব্যবসায় নামিয়েছেন শুনে সোমনাথ আর অবিশ্বাস করছে না।

মিসেস বিশ্বাসের ফ্ল্যাটে যাবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে নটবরবাবু বললেন, "মেয়েমানুষ সম্পর্কে সেন্টিমেন্ট-ফেন্ট বাংলা নভেল নাটকেই পড়বেন। আসলে ফিল্ডে কিছুই দেখতে পাবেন না। টাকা দিয়ে মায়ের কাছ থেকে মেয়েকে, ভায়ের কাছ থেকে বোনকে, স্বামীর কাছ থেকে বউকে, বাপের কাছ থেকে বেটীকে কতবার নিয়ে এসেছি—টাকার অ্যামাউন্ট ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে গার্জেনদের একটুও উদ্বিগ্ন হতে দেখিনি। লাস্ট দশ বছরে বাঙালীরা অনেক প্রাক্‌টিক্যাল হয়ে উঠেছে—জাতটার পক্ষে এটাই একমাত্র আশার কথা।"

নটবর মিত্তির অমায়িক হাসিতে মুখ ভরিয়ে মিসেস বিশ্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন "কেমন আছেন? অনেকদিন আসতে পারিনি। ক্যালকাটার বাইরে যেতে হয়েছিল।"

"পাঁচজনের আশীর্বাদে" যে ভালোই চলে যাচ্ছে তা মিসেস বিশ্বাস জানিয়ে দিলেন। বললেন, "পুরানো ফ্ল্যাট নতুন করে সাজাতে প্রায় টেন থাউজেন্ড খরচা হয়ে গেলো।"

"এর থেকে নতুন কোনো ফ্ল্যাট ভাড়া নিলে অনেক সস্তা হতো। কিন্তু এই ঠিকানাটা দিল্লী, বম্বে, ম্যাড্রাসের অনেক ভালো ভালো পার্টির জানা হয়ে গেছে। কলকাতায় ট্যুরে এলেই তাঁরা এখানে চলে আসেন। ঠিকানা পাল্টালেই গোড়ার দিকে বিজনেস কমে যাবে।"

ঝকঝকে তকতকে হল্‌ঘরটার দিকে তাকিয়ে খুশী হলেন নটবরবাবু। "এ যে একেবারে ইন্দ্রপুরী বানিয়ে তুলেছেন!" নটবর মিত্তির প্রশংসা করলেন। "চারটে-পাঁচটা ছোট-ছোট চেম্বার করেছেন, মনে হচ্ছে।"

"জায়গা তো আর বাড়ছে না, কিন্তু মাঝে মাঝে অতিথি বেড়ে যায়। তাই এরই মধ্যে সাজিয়ে-গুজিয়ে বসতে হলো।" ঠোঁট উল্টিয়ে মিসেস বিশ্বাস বললেন, "যা জিনিসের দাম! কিন্তু প্রত্যেক চেম্বারে ডানলপিলোর তোশক দিলুম। নামকরা সব লোক সারাদিনের খাটুনির পর পায়ের ধুলো দেন, ওঁদের যাতে কোনো কষ্ট না হয় তা দেখা আমার কর্তব্য। ভগবান যদি মুখ তোলেন, সামনের মাসে দু'খানা চেম্বারে এয়ারকুলার বসাবো।"

"কাকে খোঁজ করছেন? রুমুকে না ঝুমুকে?" মিসেস বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলেন। তারপর শান্তভাবে বললেন, "ঝুমু কাস্টমারের সঙ্গে রয়েছে। একটু বসুন না, মিনিট পনেরোর মধ্যে ফ্রি হয়ে যাবে।"

নটবর মিত্তির ঘড়ির দিকে তাকালেন। মিসেস বিশ্বাস একগাল হেসে বললেন, "ঝুমু আপনার ওপর খুব সন্তুষ্ট। সেবার এই গ্রেট ইন্ডিয়ান হোটেলে জাপানী গেস্ট দিলেন—ভারি চমৎকার লোক। ঝুমুকে একটা ডিজিট্যাল টাইমপিস উপহার দিয়েছে—এখানে পাওয়া যায় না। ঝুমুটাও চালাক। ছোট ভাই আছে, এই বলে সায়েবের কাছ থেকে একটা দামী ফাউনটেন পেনও নিয়ে এসেছে। অথচ জাপানী সায়েব পুরো দাম দিয়েছে—একটি পয়সাও কাটেনি।"

"মেয়ে আপনার হীরের টুকরো—সায়েবকে সন্তুষ্ট করেছে, তাই পেয়েছে," নটবরবাবু বললেন।

মিসেস বিশ্বাস মুখ বেঁকালেন। "সন্তুষ্ট তো অনেককেই করে। কিন্তু হাত তুলে কেউ তো দিতে চায় না। রুমুর অবস্থা দেখুন না।"

"আপনার বড় মেয়ে তো? কী হলো তার?" নটবরবাবু উদ্বেগ প্রকাশ করলেন।

"বলবেন না। আপনাদের মিস্টার কেঁদিয়া—পয়লা নম্বর শয়তান একটা। রুমুকে হংকং-এ বেড়াতে নিয়ে যাবার লোভ দেখালেন। এখানে বেশ কয়েকবার এসেছেন। রুমু এবং ঝুমু দুজনের সঙ্গেই ঘণ্টাখানেক করে সময় কাটিয়ে গেছেন। তারপর রুমুর সঙ্গে ভাব বাড়লো! একবার ন'টার শোতে রুমুকে সিনেমা দেখিয়ে এনেছেন। আমাকে দেখলেই গলে যেতেন। ওঁর মাথায় যে এতো দুষ্টুমি কী করে বুঝবো? ভদ্রলোক আমাকে বললেন, 'বিজনেসের কাজে হংকং যাচ্ছি। রুমুকে দু হপ্তার জন্য ছেড়ে দিন। মেয়ের রোজগারও হবে ফরেন ঘোরাও হবে।' হাজার টাকায় রফা হলো। ওখানকার সব খরচা—প্লেন ভাড়া হোটেল ভাড়া উনি দেবেন। আমি তো বোকা—রুমুটা আমার থেকেও বোকা। হতভাগাটার শয়তানী বেচারা বুঝতে পারেনি। বিদেশে যাবার লোভে কাঁচ মেয়েটা লাফালাফি করতে লাগলো। কাজকর্ম বন্ধ রেখে পাসপোর্টের জন্য ছোটাছুটি আরম্ভ করলো। কেন মিথ্যে বলবো, কেঁদিয়ার ট্রাভেল এজেন্ট পাসপোর্টের ব্যাপারে সাহায্য করেছিল। আমি ভাবলাম, আহা, জানাশোনা ছেলের সঙ্গে বিদেশ ভ্রমণের একটা সুযোগ যখন এসেছে, তখন মেয়েটা সাধ-আহ্লাদ মিটিয়ে আসুক। ক'দিন আমার কাজকর্মের ক্ষতি হয় হোক।"

"হাজার হোক মায়ের প্রাণ তো।" নিজের টাকে হাত বুলিয়ে নটবরবাবু ফোড়ন দিলেন।

নাটকীয় কায়দায় সজল চোখে মিসেস বিশ্বাস এবার বললেন, "মেয়েটাকে আমার চোখের সামনে থেকে নিয়ে গিয়ে যা অত্যাচার করেছে না—বেচারার কিছু অবশিষ্ট রাখেনি।"

"কেঁদিয়া একটা নামকরা শয়তান," নটবরবাবু খবর দিলেন।

"শয়তান বলে শয়তান! মেয়ের মুখে যদি সব কথা শোনেন আপনার চোখে জল এসে যাবে। আমাকে বুঝিয়ে গেলো, কেঁদিয়ার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। আমি কোথায় ভাবলাম, দুজনে স্বামী-স্ত্রীর মতো ঘুরে বেড়াবে। তা না, হোটেলে তুলে বন্ধু-বান্ধব ইয়ার জুটিয়ে সে এক সর্বনাশা অবস্থা! মোটামোটা টাকা নিজের পকেটে পুরে অসহায় মেয়েটাকে আধঘণ্টা অন্তর ভাড়া খাটিয়েছে। মেয়েটা পালিয়ে আসবার পথ পায় না। ভাগ্যে রিটার্ন টিকিট কাটা ছিল।"

একটু থেমে মিসেস বিশ্বাস বললেন, "আপনি শুনে অবাক হবেন, নিজের রোজগার থেকে রুমুকে একটা পয়সাও ঠেকায়নি। উল্টে বলেছে তুমি তো ফুরনে এসেছো!"

"রুমু কোথায়?" নটবর মিটার জিজ্ঞেস করলেন।

"ডাক্তারের কাছে গেছে। চেহারা দেখলে আপনি চিনতে পারবেন না। আমার কী ক্ষতি বুঝুন। এই অবস্থায় কাজে লাগিয়ে মেয়েটাকে তো মেরে ফেলতে পারি না। ভাগ্যে একটা বদলি সিন্ধি মেয়ে পেয়ে গেলাম। লীলা সামতানী—সকালবেলায় একটা স্কুলে পড়ায়। এখন পাশের ঘরে কাস্টমারের সঙ্গে রয়েছে।"

মিসেস বিশ্বাসের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লীলা চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলো। পিছনে আঠারো-ঊনিশ বছরের এক ছোকরা। নিশ্চয় ছাত্র, কারণ হাতে কলেজের বই রয়েছে! মিশনারি কলেজের নামলেখা একটা খাতাও দেখা যাচ্ছে। লীলা বললো, "মিস্টার পোদ্দার আর একটা ডেট চাইছেন।" ব্যাগ থেকে ডাইরি বার করে, চোখে চশমা লাগিয়ে মিসেস বিশ্বাস বললেন, "ইট ইজ এ প্লেজার। কবে আসবেন বলুন?" তারিখ ও সময় ঠিক করে

মিসেস বিশ্বাস ডাইরিতে লিখে রাখলেন। বললেন, "ঠিক সময়ে আসবেন কিন্তু ভাই—দেরি করলে আমাদের প্রোগ্রাম আপসেট হয়ে যায়।"

পোদ্দার চলে যেতেই মিসেস বিশ্বাস আবার ডাইরি দেখলেন। তারপর বললেন, "লীলা, তুমি একটু কফি খেয়ে বিশ্রাম নাও। আবদুলকে বলো, তোমার ঘরে বিছানার চাদর এবং তোয়ালে পাল্টে দিতে। মিনিট পঁচিশের মধ্যে মিস্টার নাগরাজন আসবেন। উনি আবার দেরি করতে পারবেন না। এখান থেকে সোজা এয়ারপোর্ট চলে যাবেন।"

লীলা ভিতরে চলে যেতেই মিসেস বিশ্বাস বললেন, "টাকা নিই বটে—কিন্তু সার্ভিসও দিই। প্রত্যেক কাস্টমারের জন্যে আমার এখানে ফ্রেস বেডশিট এবং তোয়ালের ব্যবস্থা। অ্যাটাচড্ বাথরুমে নতুন সাবান। প্রত্যেক ঘরে ট্যালকাম পাউডার, লোশন, অডিকোলন, ডেটল। যত খুশী কফি খাও—একটি পয়সা দিতে হবে না।"

নটবর মিত্রকে ঘড়ির দিকে তাকাতে দেখে মিসেস বিশ্বাস বললেন, "ঝুমুটার এখনও হলো না? দাঁড়ান, ফুটো দিয়ে দেখে আসি। মেয়েটার ঐ দোষ। খদ্দেরকে ঝটপট খুশী করে তাড়াতাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারে না। ভাবছে, সবাই জাপানী সায়েব। বেশি সময় আদর পেলে, খুশী হয়ে ওকে মুক্তোর মালা দিয়ে যাবে! এসব ব্যাপারে লীলা চালাক। নতুন লাইনে এলেও কায়দাটা শিখে নিয়েছে। পোদ্দার একঘণ্টা থাকবে বলে এসেছিল, কিন্তু কুড়ি মিনিটের মধ্যে সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলো। অথচ লীলার অনেক আগে ঝুমু খদ্দের নিয়ে দরজা বন্ধ করেছে।"

ফুটো দিয়ে মেয়ের লেটেস্ট অবস্থা দেখে হেলেদুলে ফিরে এলেন মিসেস বিশ্বাস। বললেন, "আর দেরি হবে না। টোকা দিয়ে এসেছি।" তারপর বললেন, "আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে ঝুমুর চেহারাটা বেশ হয়েছে। যে দ্যাখে সেই সন্তুষ্ট হয়। টোকিও থেকে আপনার জাপানী সায়েব তো আবার বন্ধু পাঠিয়েছিলেন। হোটেলে মালপত্র রেখে সায়েব নিজে খোঁজখবর করে এখানে এসেছিলেন। ভলো ছবি তোলেন। খুব ইচ্ছে ছিল জামাকাপড় খুলিয়ে ঝুমুর একটা রঙীন ছবি তোলেন। পাঁচশ' টাকা ফী দিতে চাইলেন! আমি রাজী হলাম না।"

নটবর এবার সুযোগ নিলেন। বললেন, "আমার এই ফ্রেন্ডের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতাম ঝুমুর। ওকে ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে একটু গ্রেট ইন্ডিয়ানে নিয়ে যেতে চাই।"

মুখ বেঁকালেন মিসেস বিশ্বাস। তারপর সোমনাথকে বললেন, "হোটেলে কেন বাছা? আমার এখানেই বসো না। মিস্টার জয়সোয়াল চলে গেলেই ঝুমু ফ্রি হয়ে যাবে। আমার চেম্বারভাড়া হোটেলের অর্ধেক।"

হাঁ-হাঁ করে উঠলেন নটবরবাবু। "উনি নন, ওঁর এক পার্টি।"

মিসেস বিশ্বাস বললেন, "তাঁকেও নিয়ে আসুন এখানে। আমার লোকজন কম। মেয়েদের বাইরে পাঠালে বড্ড সময় নষ্ট হয়। তাছাড়া এখন কাজের চাপ খুব, মিস্টার মিত্তির! হোল নাইট বুকিং-এর জন্যে হাতে-পায়ে ধরছে।"

অনেক অনুরোধ করলেন নটবরবাবু। কিন্তু মিসেস বিশ্বাস রাজী হলেন না। বললেন, "ঝুমু তো রইলো। আপনার সায়েবকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এখানে নিয়ে আসুন। ঝুমুকে স্পেশাল আদর-যত্ন করতে বলে দেবো। দেখবেন আপনার সায়েব কীরকম সন্তুষ্ট হন। ওদের দুজনকে কাজে বসিয়ে দিয়ে আমরা তিনজন চা খেতে খেতে গল্প করবো।"

রাস্তায় বেরিয়ে সোমনাথ দেখলো নটবর মিটার দুটো হাতেই ঘুঁষি পাকাচ্ছেন। সোমনাথের কাছে ছোট হয়ে গিয়েছেন মনে করছেন। অথচ সোমনাথ সেরকম ভাবছেই না। সামনের পানের দোকান থেকে সোমনাথ দুটো অ্যাসপ্রো কিনে খেয়ে ফেললো। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সে মনকে তৈরি করে ফেলেছে। কিন্তু দেহটা কথা শুনছে না। একটু বমি করলে শরীরটা বোধহয় শান্ত হতো।

নটবরবাবু বললেন, "আপনার কপালটাই পোড়া। নটবর মিত্তির যা চাইছে. তা দিতে পারছে না আপনাকে। আর দেশটারই বা হলো কি! মেয়েমানুষের ডিমান্ড হুড়হুড় করে বেড়ে যাচ্ছে। ছ'মাস আগে এই মিসেস বিশ্বাস দুপুরবেলায় মেয়ে নিয়ে আমার অফিসে

দেখা করেছেন—পার্টির জন্যে হাতে ধরেছেন। কতবার বলেছেন, শুধু তো খদ্দের আনছেন। একদিন নিজে রুমু কিংবা ঝুমুর সঙ্গে বসুন—কোনো খরচ খরচা লাগবে না। কিন্তু মশাই, নটবর মিত্তির এসব থেকে একশ' গজ দূরে থাকে। নিজে যেন এসবের মধ্যে ঢুকে পড়বেন না—তাহলে কিন্তু সর্বনাশ হবে ওই বিশু বোসের মতন।"

কোনো কথা শুনলেন না নটবর। সোমনাথকে নিয়ে পার্ক স্ট্রীটের কোয়ালিটিতে বসে কফি খেলেন। ওখান থেকে বেরিয়েই অলিম্পিয়া বার-এর সামনে বুড়ো চরণদাসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো।

"চরণ না?" নটবর জিজ্ঞেস করলেন।

"আজ্ঞে, হ্যাঁ হুজুর," বহুদিন পরে নটবরকে দেখে খুশী হয়েছেন চরণদাস।

"তোমার বোর্ডিং-এ না পুলিশ হামলা হয়েছিল?" নটবর অনেক কিছু খবর রাখেন।

"শুধু পুলিশ হামলা! আমাকে আসামীর কাঠগড়ায় তুলেছিল।" চরণ দুঃখ করলো। "কোনোরকমে ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে এসেছি।"

চরণের বয়স হবে পঞ্চাশের বেশি। শুকনো দড়ি-পাকানো চেহারা। কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। সোমনাথকে নটবর বললেন, "চরণ এখানকার এক বোর্ডিং-এ বেয়ারা ছিল—মেয়ে সাপ্লাই করে টু-পাইস কামাতো।"

"এখন কী করছো চরণ?" নটবর মিত্তির জিজ্ঞেস করলেন।

"আগেকার দিন নেই হুজুর। এখন টুকটাক অর্ডার সাপ্লাই করছি। আমাদের ম্যানেজার-বাবু করমচন্দানী জেল থেকে বেরিয়ে একটা স্কুল করেছেন। টেলিফোন অপেরেটিং শেখবার নাম করে কিছু মেয়ে আসে—খুব জানাশোনা পার্টিরা খবর পেয়েছেন, কোনোরকমে চলে যায়।"

নটবর জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা চরণ, চাহিদার তুলনায় মেয়ের সাপ্লাই কি কমে গিয়েছে?"

"মোটেই না, হুজুর। গেরস্ত ঘর থেকে আজকাল অজস্র মেয়ে আসছে। কিন্তু তাদের আমরা জায়গা দিতে পারি না। এসব পাড়ায় জায়গার বড় অভাব।"

নটবর মিত্তির হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, "চরণ, তুমি তো আমার বহুদিনের বন্ধু। এখনই একটি ভালো মেয়ে দিতে পারো?"

চরণ বললো, "কেন পারবো না হুজুর? এখনই চলুন, তিনটে মেয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি।"

"একেবারে টপ ক্লাস হওয়া চাই। রাস্তার জিনিস তুলে নেবার জন্যে তোমার সাহায্য চাইছি না," নটবর বললেন।

চরণদাস এবার ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝলো। বললো, "তাহলে হুজুর, একটু অপেক্ষা করতে হবে। মিনিট পনেরো পরেই একটি ভালো বাঙালী মেয়ে আসবে। তবে মেয়েটি খুব দূরে যেতে ভয় পায়। গেরস্ত ঘরের মেয়ে তো, লুকিয়ে আসে।"

"রাখো রাখো—সবাই গেরস্ত," ব্যঙ্গ করলেন নটবর।

চরণদাস উত্তর দিলো, "এই ভর সন্ধ্যেবেলায় আপনাকে মিথ্যে বলবো না, হুজুর।"

"চরণদাস, ভেট হিসেবে দেবার মতো জিনিস তো?" নটবর মিত্তির খোলাখুলি জিজ্ঞেস করলেন।

"একদম নির্ভয়ে নিয়ে যেতে পারেন। রাঙতায় মুড়ে বড়দিনের ডালিতে সাজিয়ে দেবার মতো মেয়ে, স্যর!" চরণদাস বেশ জোরের সঙ্গে বললো।

চরণদাসের ঘাড়ে সোমনাথকে চাপিয়ে নটবর এবার পালালেন। বললেন, "ঊষা জৈনকে এখন না তুললেই নয়। মাগীর যা দেমাক, হয়তো দেরি করলে অর্ডার ক্যানসেল করে দেবে—সঙ্গে আসবেই না। আপনি ভাববেন না সোমনাথবাবু, বার বার তিনবার। এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সোমনাথকে নিশ্চল পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে থাকতে দেখে নটবর বললেন, "ভয় কী? একটু পরেই তো গ্রেট ইন্ডিয়ানে দেখা হচ্ছে। তেমন দরকার হলে আমি নিজে গোয়েঙ্কার সঙ্গে আপনার হয়ে কথা বলবো।"

"বাই-বাই," করে নটবর মিত্তির বেরিয়ে গেলেন। আর দাঁতে দাঁত চেপে সোমনাথ এবার চরণদাসের সঙ্গে রাসেল স্ট্রীট ধরে উত্তর দিকে হাঁটতে লাগলো। দুটো অ্যাসপ্রো ট্যাবলেটেও শরীরের যন্ত্রণা কমেনি—কিন্তু অনেক চেষ্টায় মনকে পুরোপুরি নিজের তাঁবেতে এনেছে সোমনাথ।

কী আশ্চর্য! দ্বৈপায়ন ব্যানার্জির ভদ্র সভ্য সুশিক্ষিত ছোটছেলে এই অন্ধকারে মেয়েমানুষের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—অথচ তার কনসেন্স তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে না। সোমনাথ এখন বেপরোয়া। জলে যখন নেমেছেই, তখন এর চূড়ান্ত না দেখে আজ সে ফিরবে না। জন-অরণ্যে সে অনেকবার হেরেছে—কিন্তু শেষ রাউন্ডে সে জিতবেই।

অন্ধকারের অবগুণ্ঠন নেমে এসেছে নগর কলকাতার ওপর। রাত্রি গভীর নয়—কিন্তু সোমনাথের মনে হচ্ছে গহন অরণ্যের ধার দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ সূর্য অস্ত গিয়ে সর্বত্র এক বিপজ্জনক অন্ধকার নেমে এসেছে। চরণদাস বললো, "নটবরবাবু এ-লাইনের নাম-করা লোক। ওঁকে ঠকিয়ে অর্ডার সাপ্লাই বিজনেসে আমি টিকতে পারবো না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাকে খারাপ জিনিস দেবো না কিছুতেই।"

এই বৃদ্ধকে কে বোঝাবে, মানুষ কখনও খারাপ হয় না, সোমনাথ নিজের মনে বললো। চরণদাস তার সহযাত্রীর মনের খবর রাখলো না। বললো, "গভরমেন্টের কী অন্যায় দেখুন তো? চাকরি দিতে পারবি না অথচ বোর্ডিং-এ আট-দশটি মেয়ে এবং আমরা তিন-চারজন করে খাচ্ছিলাম তা সহ্য হলো না।"

চরণদাস বলে চললো, "বন্ধ করতে তো পারলে না, বাবা। শুধু কচিকচি মেয়েগুলোকে কষ্ট দেওয়া। জানেন, কতদূর থেকে সব আসে—গড়িয়া, নাকতলা, টালিগঞ্জ, বৈষ্ণবঘাটা। আর একদল আসে বারাসত, দত্তপুকুর, হাবড়া এবং গোবরডাঙ্গা থেকে। বোর্ডিং-এ অনেক বসার জায়গা ছিল। মেয়েগুলোর কষ্ট হতো না। এখন এই টেলিফোন স্কুলে কয়েকখানা ভাঙা চেয়ার ছাড়া কিছুই নেই। কখন পার্টি এসে তুলে নিয়ে যাবে এই আশায় মেয়েগুলোকে তীর্থকাকের মতো বসে থাকতে হয়।"

চরণদাসের বকা স্বভাব। নীরব শ্রোতা পেয়ে সে বলে যাচ্ছে, "যেসব মেয়ের চক্ষুলজ্জা নেই, তারা নাচের স্কুলে চলে যাচ্ছে। বলরুম নাচ শেখানো হয় বলে ওরা বিজ্ঞাপন দেয়—অনেক উটকো লোক আসে, কিছু চাপা থাকে না। আমাদের টেলিফোন স্কুলে সুবিধে—এখনও তেমন কেউ জানে না, ভদ্রঘরের মেয়েদের পক্ষে বাড়িতে বলতেও ভালো। সাতদিন 'অপ্রেটর ট্রেনিং'-এর পরই ডেলি রোজ-এর ক্যাজুয়েল চাকরি। বাপ-মা খুব চেপে ধরলে আমাদের মেয়েরা বলে, বদলী অপ্রেটরদের বিকেল তিনটে-দশটার চাকরিটাই সহজে পাওয়া যায়। কারণ এ-সময়ে অফিসের মাস-মাইনের মেয়েরা কাজ করতে চায় না। বাপেরা অনেক সময় আমাদের এখানে ফোন করে। আমরা বলি, লিভ ভেকান্সিতে কাজ করতে করতেই আপনার মেয়ে হঠাৎ 'পার্মেন্ট' চাকরি পেয়ে যাবে।"

চরণদাস এবার একটা পুরানো বাড়িতে ঢুকে পড়লো। দুটো মেয়ে টেলিফোন স্কুলে এখনও বসে আছে। একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান—বোধহয় দেহে কিছু নিগ্রো রক্ত আছে। উগ্র এবং অসভ্য বেশবাস করেছে মেয়েটি। আরেক জন সিন্ধি—হাল ফ্যাশানের লুঙ্গী পরেছে। সোমনাথকে দেখে দুজন মেয়েই চাপা উত্তেজনায় দুবার মুখ বাড়িয়ে দেখে গেলো। চরণদাস বললো, "আপনি মিত্তির সায়েবের লোক—এসব জিনিস আপনাকে দেওয়া চলবে না। এরা ভারি অসভ্য—একেবারে বাজারের বেশ্যা। একটু বসুন—আপনার জিনিস এখনই এসে পড়বে।"

ফিক করে হাসলো চরণদাস। "আপনি ভাবছেন, তিনটে থেকে ডিউটি অথচ এখনও আসেনি কেন?"

চরণদাস নিজেই উত্তর দিলো, "একেবারে নতুন—দিন কয়েক হলো লাইনে জয়েন করেছে। গেরস্ত চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে ঘুরে, কিছু না পেয়ে এ-লাইনে এসেছে। বিকেলের দিকে তো আমাদের খদ্দেরের কাজের চাপ থাকে না। আমাকে বলে গেছে একবার হাসপাতালে যাবে কীসের খোঁজ করতে।"

চরণদাস বললো, “খুব ভালো মেয়েমানুষ পাবেন স্যার। যিনি ভেট নেবেন, দেখবেন তিনি কীরকম খুশী হন। অনেকদিন তো এ-লাইনে হয়ে গেলো। ছোটবেলা থেকে দেখছি, এ-লাইনে নতুন জিনিসের খুব কদর। আমাদের বোর্ডিং-এ গেরস্ত ঘর থেকে আনকোরা মেয়ে এলেই খদ্দেরের মধ্যে হৈ-হৈ পড়ে যেতো। এক-একবার দেখেছি, লাইন পড়ে যেতো। এক খদ্দের ঢুকেছে—আরও দুজন খদ্দের সোফায় বসে সিগ্রেট টানছে। নতুন রিফিউজি মেয়েগুলো পাঁচমিনিট বিশ্রাম নেবার সময় পেতো না।” একটা বিড়ি ধরালো চরণদাস। বললো, “আপনাকে যে-মেয়ে দেবো একেবারে ফ্রেশ জিনিস। ভয় পর্যন্ত ভাঙেনি। সাড়ে ন'টার পর এক মিনিটও বসবে না। আমাকে আবার বালিগঞ্জের মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতে হয়। আমার বাড়ি অবশ্য একই রাস্তায় পড়ে—দুটো-একটা টাকাও পাওয়া যায়।”

মেয়েটি আসতেই চরণদাস সব ব্যবস্থা করে দিলো। বললো, “পাঁচটা মিনিট সময় দিন, স্যার। একটু ড্রেস করে নিক। আমাদের এখানে সব ব্যবস্থা আছে।”

পাঁচমিনিটের মধ্যেই মেয়েটি তৈরি হয়ে নিলো। চরণদাস এবার সোমনাথকে জিজ্ঞেস করলো, “শাড়ির রংটা পছন্দ হয়েছে তো—না হলে বলুন। আমাদের এখানে স্পেশাল শাড়ি আছে—খদ্দেরের পছন্দ অনুযায়ী অনেক সময় মেয়েরা জামা-কাপড় পাল্টে নেয়!”

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সোমনাথ দেখলো আর একটুও সময় নেই। মেয়েটিকে গাড়িতে তুলে দিয়ে চরণদাস এবার সোমনাথকে লম্বা সেলাম দিলো। সোমনাথ পকেট থেকে দশটা টাকা বার করে চরণদাসের হাতে দিলো। বেজায় খুশী চরণদাস। বললো, “আপনারা যাচ্ছেন কোথায়?”

“গ্রেট ইন্ডিয়ান হোটেলে,” সোমনাথ উত্তর দিলো। নিজের শান্ত কণ্ঠস্বরে সোমনাথ নিজেই অবাক হয়ে গেলো। এই অবস্থাতেও তার গলা কেঁপে উঠলো না। মেয়েটাকে গাড়ির মধ্যে তুলে নিতে একটুও লজ্জা হলো না। ‘কেন লজ্জা হবে?’ রক্তচক্ষু এক সোমনাথ আর-এক শান্ত সুসভ্য সোমনাথকে জিজ্ঞেস করলো। ‘তিন বছর যখন তিলে তিলে যন্ত্রণা সহ্য করেছি, তখন তো কেউ একবারও খবর করেনি. আমার কী হবে? আমি কেমন আছি?’

মেয়েটি একেবারে নতুন। এখনও গ্রেট ইন্ডিয়ান হোটেল চেনে না! জিজ্ঞেস করলো, “অনেক দূরে নাকি?”

মেয়েটিকে বেশ ভীতু মনে হচ্ছে সোমনাথের। এদেশের লাখ লাখ বোকা ছেলেমেয়ের মতোই সদাশঙ্কিত হয়ে আছে। নিজের নাম বললো, “শিউলি দাস। আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে,” শিউলির গলায় কাতর অনুনয়।

“দয়া করে বেশি দেরি করবেন না। দশটার মধ্যে বাড়ি না ফিরলে আমার মা অজ্ঞান হয়ে যাবেন।”

জনবিরল মেয়ো রোড ধরে গাড়িতে যেতে যেতে শিউলি জিজ্ঞেস করলো, “আপনার নাম?” শিউলি যখন নিজের নাম জানিয়েছে, তখন সোমনাথের নাম জানবার অধিকার তার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সোমনাথ কেমন ইতস্তত বোধ করছে—জীবনে এই প্রথম নিজের পরিচয়টা লজ্জার উদ্রেক করছে। প্রশ্নটার পুরো উত্তর দিলো না সে। গম্ভীরভাবে বললো, “ব্যানার্জি।” মেয়েটা সত্যিই আনকোরা. কারণ ব্যানার্জির আগে কী আছে জানতে চাইলো না। চাইলেও অবশ্য সোমনাথ প্রস্তুত হয়েছিল—একটা মিথ্যে উত্তর দিতো।

চিন্তাজালে জড়িয়ে পড়েছে সোমনাথ। যে-নগরীকে একদা গহন অরণ্য মনে হয়েছিল সেই অরণ্যের নিরীহ সদাসন্ত্রস্ত মেষশাবক সোমনাথ সহসা শক্তিমান সিংহশিশুতে রূপান্তরিত হয়েছে। নিরীহ এক হরিণীকে কেমন অবলীলাক্রমে সে চরম সর্বনাশের জন্য নিয়ে চলেছে।

গ্রেট ইন্ডিয়ান হোটেলের অভিজ্ঞ দারোয়ানজীও শিউলিকে দেখে কিছু সন্দেহ করলেন না। দারোয়ানজীর দোষ কী? এই প্রথম দেখছেন শিউলিকে।

* * *

গোয়েঙ্কাজীর ঘরে ঢোকা পড়তেই তিনি নিজে দরজা খুলে দিলেন। সোমনাথের জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন।

আজ একটু স্পেশাল সাজগোজ করেছেন গোয়েঙ্কাজী। সাদা গরদের দামী পাঞ্জাবী পরেছেন তিনি। ধুতিটা জামাইবাবুদের মতো চুনোট করা। গায়ে বিলিতী সেন্টের গন্ধ ভুরভুর করছে। পানের পিচে ঠোঁট দুটো লাল হয়ে আছে। মুখের তেল-চকচক ভাবটা নেই—এখানে এসে বোধহয় আর এক দফা স্নান সেরে নিয়েছেন।

আড়চোখে শিউলিকে দেখলেন গোয়েঙ্কা। সাদরে বসতে দিলেন দুজনকে।

নটবরবাবু বারবার বলে দিয়েছিলেন, "গোয়েঙ্কাকে বোলো, ওর স্পেসিফিকেশন জানা না থাকায়, আমাদের বিদ্যেবুদ্ধি মতো মেয়েমানুষ চয়েস করেছি। একটু কেয়ারফুলি গোয়েঙ্কাকে স্টাডি কোরো। যদি বোঝো জিনিস তেমন পছন্দ হয়নি, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বোলো; এর পরের বারে আপনি যেমনটি চাইবেন ঠিক তেমনটি এনে রাখবো।"

এসব প্রশ্ন উঠলো না। কারণ গোয়েঙ্কাজীর হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছে সঙ্গিনীকে ওঁর বেশ পছন্দ হয়েছে।

সোমনাথের সমস্ত শরীর অকস্মাৎ মিশরের মমির মতো শক্ত হয়ে আসছে। তার চোয়াল খুলতে চাইছে না। নটবরবাবু বারবার বলেছিলেন, "জিজ্ঞেস করবে, কলকাতায় আসবার পথে গোয়েঙ্কাজীর কোনো কষ্ট হয়েছিল কিনা?"

গোয়েঙ্কাজী বললেন, "আমি এসেই আপনার চিঠি পেলাম। কষ্ট করে আবার ফুল পাঠাতে গেলেন কেন?"

'তোমাকে জুতো মারা উচিত ছিল,' এই বলতে পারলেই ভিতরের সোমনাথ শান্তি পেতো। কিন্তু সোমনাথের মমিটা কিছুই বললো না।

গোয়েঙ্কাজী স্যুইট নিয়েছেন। সামনে ছোট একটু বসবার জায়গা। ভিতরে বেডরুমটা উঁকি মারছে।

মানুষের চোখও যে জিভের মতো হয় তা সোমনাথ এই প্রথম দেখলো। শিউলির দিকে তাকাচ্ছেন গোয়েঙ্কা আর চোখের জিভ দিয়ে ওর দেহটা চেটে খাচ্ছেন।

শিউলি মাথা নিচু করে সোফায় বসেছিল। লম্বা বেণীর ডগাটা শিউলি যে বারবার নিজের আঙুলে জড়াচ্ছে গোয়েঙ্কা তাও লক্ষ্য করলেন। সঙ্গিনীকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে গোয়েঙ্কা জিজ্ঞেস করলেন, সে কিছু খাবে কিনা। শিউলি না বললো। ভদ্রতার খাতিরে গোয়েঙ্কাজী এবার সোমনাথকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কী খাবেন বলুন?" সোমনাথ না বলায় ভদ্রলোক যেন আশ্বস্ত হলেন।

শিউলির দেহটা একবার চেটে খেয়ে গোয়েঙ্কা বললেন, "বসুন না, মিস্টার ব্যানার্জি! শিউলির সঙ্গে দুজনে গল্প করি।" নটবরবাবুর উপদেশ সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেলো। "খবরদার এই কাজটি করবেন না। যার জন্যে ভেট নিয়ে গেছেন, মেয়েমানুষটি সেই সময়ের জন্যে তার একার, এই কথাটি কখনও ভুলবেন না। মেয়েমানুষের ক্ষেত্রে যা কিছু রস-রসিকতা পার্টি করুক। শাস্ত্রে বলেছে, পর দ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।"

ঘড়ির দিকে তাকালো সোমনাথ। অধৈর্য গোয়েঙ্কাজী এবার সঙ্গিনীকে বেড রুমে যেতে অনুরোধ করলেন।

নিজের কালো হাতব্যাগটা তুলে নিয়ে শিউলি পাশের ঘরে যেতেই সোমনাথ উঠে দাঁড়ালো। গোয়েঙ্কাজী খুশী মেজাজে সোমনাথের কাঁধে হাত দিলেন।

গোয়েঙ্কাজী অসংখ্য ধন্যবাদ জানালেন সোমনাথকে। বললেন, "অনেক কথা আছে। এখনই বাড়ি চলে যাবেন না যেন।"

সোমনাথ জানিয়ে দিলো সে একটু ঘুরে আসছে। গোয়েঙ্কা নির্লজ্জভাবে বললেন, "আপনি ঘণ্টা দেড়েক পরে ফিরে এসে নিচে লাউঞ্জে অপেক্ষা করবেন। আমি আপনাকে ফোনে ডেকে নেবো।"

◆

এই দেড় ঘণ্টা পাগলের মতো এসপ্ল্যানেডের পথে পথে ঘুরেছে সোমনাথ। ভিতরের পুরানো সোমনাথ তাকে জ্বালাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সোমনাথ এক ঝটকায় তাঁকে দূর করে দিয়েছে।

অন্ধকারে অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে এখন আশ্চর্য এক অনুভূতি আসছে। নিজেকে আর সিংহশিশু মনে হচ্ছে না। হঠাৎ ক্লান্ত এক গরিলার মতো মনে হচ্ছে সোমনাথের। বৃদ্ধ গরিলার ধীর পদক্ষেপে সোমনাথ এবার দি গ্রেট ইন্ডিয়ান হোটেলে ফিরে এলো। এবং নিরীহ এক গরিলার মতোই লাউঞ্জের নরম সীটে বসে পড়লো।

দেড় ঘণ্টা থেকে মাত্র দশ মিনিট সময় বেশি নিলেন গোয়েঙ্কা। এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের মাথায় ফোনে সোমনাথকে ডাকলেন। গোয়েঙ্কাজীর গলায় গভীর প্রশান্তি ঝরে পড়ছে। "হ্যালো মিস্টার ব্যানার্জি, উই হ্যাভ ফিনিশড্।"

ফিনিশড্। তার মানে তো সোমনাথ এখন ওপরে গোয়েঙ্কাজীর ঘরে চলে যেতে পারে। নষ্ট করবার মতো সময় এখন নয়। অথচ ঠিক এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ভিতরের পুরানো সোমনাথ আবার নড়ে-চড়ে উঠবার চেষ্টা করলো। গরিলা সোমনাথকে সে জিজ্ঞেস করছে, 'ফিনিশ কথাটার মানে কী?' ওই সোমনাথ ফিসফিস করে বলছে, 'ফিনিশড্ মানে তো শেষ হয়ে যাওয়া। গোয়েঙ্কাজী শেষ হয়ে যেতে পারেন, কিন্তু উই হ্যাভ ফিনিশড্ বলবার তিনি কে? ওঁর সঙ্গে তাহলে আর কে কে শেষ হলো?' 'আঃ!' ওই সোমনাথের ওপর ভীষণ বিরক্ত হলো সোমনাথ। 'তোমাকে হাতে-পায়ে দড়ি বেঁধে পাগল সুকুমারের মতো রেখে দিয়েছি—তাও শান্তি দিচ্ছো না।'

ওই সোমনাথটার স্পর্ধা কম নয়—আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ওসব বাজে বকুনি শোনবার সময় কোথায় সোমনাথের? মিস্টার গোয়েঙ্কার সঙ্গে বিজনেস সংক্রান্ত জরুরী কথাগুলো এখনই সেরে ফেলতে হবে। পড়োনি? স্ট্রাইক দ্য আয়রন হোয়েন ইট ইজ হট। গোয়েঙ্কা এখনও ফারনেস থেকে বেরুনো লাল লোহার মতো নরম হয়ে আছে, দেরি করা চলবে না।'

একটু দ্রুতবেগেই সোমনাথ যাচ্ছিল। কিন্তু লিফটের সামনে নটবর মিত্র তাকে পাকড়াও করলেন। বেশ খুশীর সঙ্গে বললেন, "কোথায় গিয়েছিলেন মশাই? আমি তো আপনাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান! গোয়েঙ্কার ঘরও বন্ধ—'ডোন্ট ডিস্টার্ব বোর্ড ঝোলানো—আমি জ্বালাতন করতে সাহস পেলাম না।"

সোমনাথ হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, "গড়ের মাঠে ঘুরছিলাম।"

"বেশ মশাই! আপনি গড়ের মাঠে হাওয়া খাচ্ছেন। আমিতো ঊষা জৈনকে মিস্টার সুনীল ধরের ঘরে চালান করে দিয়ে দেড় ঘণ্টা বার-এ বসে আছি। না বসে পারলাম না

মশাই। মিস্টার ধর বিরাট গভরমেন্ট ইনর্জিনিয়ার। একেবারে কাঠ-বাঙাল। বিকেল থেকে মালে চুর হয়ে আছেন। ভদ্রলোক আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন। নেশার ঘোরে বললেন, 'মেয়েমানুষের গায়ে কখনও হাত দিইনি। আজ প্রথম ক্যারেকটার নষ্ট করবো। থ্যাংক ইউ ফর ইওর সিলেকশন!' আমি ভাবলাম ঊষা জৈনকে পেয়ে খুব খুশী হয়েছেন। কিন্তু মিস্টার ধর যা শোনালেন, তাতে একটা শর্ট স্টোরি হয়ে গেলো। মিস্টার ধর বললেন, 'গুড়ের নাগরী-গুলো আমাদের এই সোনার দেশকে শুষে-শুষে সর্বনাশ করে দিয়েছে. টাকার দেমাক দেখিয়ে বেটারা ভূতের নৃত্য করছে। আমাদের অসহায় ইনোসেন্ট মেয়েগুলোকে পর্যন্ত আস্ত রাখছে না। তাই আজ আমি প্রতিশোধ নেবো।'

"শুনে তো মশাই আমার হাসি যায় না! হাসি চাপা দেবার জন্যে বাধ্য হয়ে আমাকে একটা ড্রিঙ্ক নিয়ে বার-এ বসতে হলো।"

নটবর মিত্তির বললেন, "যান আপনি গোয়েঙ্কার কাছে। বিজনেস কথাবার্তা এই তালে সেরে ফেলুন। আমি পাঁচ মিনিট পরেই আপনাদের ঘরে গিয়ে মেয়েটাকে দেখে আসছি—গোয়েঙ্কাকে যদি সন্তুষ্ট করে থাকে তাহলে ফিউচারে আমার কাছ থেকে কাজকর্ম পাবে।"

টোকা পড়তেই গোয়েঙ্কাজী দরজা খুলে দিলেন। কেমন মনোহর প্রশান্ত সৌম্য মুখে তিনি সোমনাথকে ভিতরে আসতে বললেন। শিউলিকে দেখা যাচ্ছে না। সে কোথায় গেলো? এখনও ভিতরের ঘরে শুয়ে আছে নাকি?

সোমনাথের আন্দাজ ঠিক হয়নি। শিউলি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো। সমুদ্রের আলোড়নের মতো ফ্লাশের আওয়াজ ভেসে আসছে। শিউলি কারো দিকে তাকাচ্ছে না। সে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। বেচারাকে ক্লান্ত বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে।

কী আশ্চর্য! এই ঘরে শিউলি ছাড়া অন্য কারও চোখে-মুখে লজ্জার আভাস নেই। গোয়েঙ্কাজী শান্তভাবে একটা সিগারেট টানছেন। সোমনাথ মাথা উঁচু করে বসে আছে। যত লজ্জা শুধু শিউলি দাসেরই। তার প্রাপ্য টাকা অনেক আগেই চুকিয়ে দিয়েছে সোমনাথ। নিজের ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে মাথা নিচু করে আর একটিও কথা না বলে সন্ত্রস্ত হরিণীর মতো শিউলি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

গোয়েঙ্কা এবার একটু কপট ব্যস্ততা দেখালেন। শিউলির যা প্রাপ্য তা অনেক আগেই চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এই বলে সোমনাথ তাঁকে আশ্বস্ত করলো।

সন্তুষ্ট গোয়েঙ্কা বললেন, "শিউলি ইজ ভেরি গুড। কিন্তু, লাইক অল বেঙ্গলী, নিজের ব্যবসায়ে থাকতে চায় না। বিছানাতে শুয়েও বলছে, একটা ছেলের চাকরি করে দিন।"

আজ কল্পতরু হয়েছেন মিস্টার গোয়েঙ্কা। সোমনাথের সঙ্গে করমর্দন করলেন। বললেন, "আপনার অর্ডারের চিঠি আমি টাইপ করে এনেছি। আপনি রেগুলার প্রতি মাসে কেমিক্যাল সাপ্লাই করে যান। দু-নম্বর মিলের কাজটাও আপনাকে দেবার চেষ্টা করবো। আর দেরি নয়। আমার শ্বশুর-বাড়িতে এখন আবার ডিনারের নেমন্তন্ন রয়েছে," এই বলে মিস্টার গোয়েঙ্কা নিজের জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করলেন।

প্রচণ্ড এক উল্লাস অনুভব করছে সোমনাথ। গোয়েঙ্কার লেখা চিঠিখানা সে আবার স্পর্শ করলো। সোমনাথ ব্যানার্জি তাহলে অবশেষে জিতেছে। সোমনাথ এখন প্রতিষ্ঠিত।

গোয়েঙ্কার ঘর থেকে বেরিয়ে সোমনাথ থমকে দাঁড়ালো। আবার চিঠিখানা স্পর্শ করলো।

করিডরেই নটবরবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। হুঙ্কার দিয়ে নটবর বললেন, "আজকেই চিঠি পেয়ে গেলেন? গোয়েঙ্কা তাহলে আপনাকে বিজনেসে দাঁড় করিয়ে দিলো। কংগ্র্যাচুলেশন. আমি ঠিক আন্দাজ করেছিলাম, ব্যাটা চিঠি তৈরি করে নিয়ে আসবে।"

সোমনাথের ধন্যবাদের জন্যে অপেক্ষা করলেন না নটবরবাবু। বললেন, "পরে কথা হবে। মিসেস বিশ্বাসের দেমাক আমি ভাঙতে চাই। মেয়েটাকে একটু দেখে আসি—ঘরে আছে তো?"

এইমাত্র যে শিউলি দাস বেরিয়ে গেলো তা জানালো সোমনাথ।

"এইমাত্র যে-মেয়েটার সঙ্গে করিডরে আমার দেখা হলো? লাল রংয়ের তাঁতের শাড়ি-পরা? চোখে চশমা? হাতে কালো ব্যাগ?"

সোমনাথ বললো, "হ্যাঁ। ওই তো শিউলি দাস।"

"শিউলি দাস কোথায়?" একটু অবাক হলেন নটবর মিত্র। "ওঁকে তো আমি চিনি। আমাদের যাদবপুরের পাড়ায় থাকে। তাহলে নাম ভাঁড়িয়ে এ-লাইনে এসেছে। এ-লাইনে কোনো মেয়েই অবশ্য ঠিক নাম বলে না। ওর নাম তো কণা।" নটবরবাবু বললেন, "দাস হলো কবে থেকে? ওরা তো মিত্তির। ওর বাবাকে চিনি—সবে রিটায়ার করেছে। আর ভাইটা মশাই ইদানীং ডাহা পাগল হয়ে গেছে—সুকুমার না কী নাম।"

অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের আনন্দে নটবর মিত্তির এখন বিমোহিত। বললেন, "কী আশ্চর্য দেখুন—সারা শহর খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত যাকে নিয়ে আসা হলো সে পাশের বাড়ির লোক। খুব অভাব ছিল ওদের, তা ভালোই করেছে।"

হঠাৎ ভীষণ ভয় লাগছে সোমনাথের। কাল যখন তপতী তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে তখন সোমনাথের মুখটা যদি গরিলার মতো দেখায়? তপতী তখনও কি ভালোবাসতে পারবে? তপতী যেন বলেছিল সোমনাথের নিষ্পাপ মুখের সরল হাসি দেখেই সে হৃদয় দিয়েছিল।

"কণা, কণা, কণা" পাগলের মতো কণাকে ডাকতে ডাকতে সোমনাথ গ্রেট ইন্ডিয়ান হোটেলের গাড়ি-বারান্দা পর্যন্ত ছুটে এসেছিল। কিন্তু কোথায় সুকুমারের বোন? সে চলে গিয়েছে।

* * *

যোধপুর পার্কে নিজেদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মাতালের মতো টলছে সোমনাথ ব্যানার্জি। হাতে তার দুখানা উপহারের শাড়ি এবং পকেটে সেই চিঠিটা—যা তাকে সমস্ত অর্থনৈতিক অপমান থেকে মুক্তি দিয়েছে। সোমনাথ এখন আর চাকরির ভিখিরি নয়—সে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। প্রতি মাসে একটা অর্ডার থেকেই হাজার টাকা রোজগার করবে সে। কারুর কাছে আর ভিখিরি থাকতে হবে না সোমনাথকে। তপতীকে জানিয়ে দেবে সে আর কাউকে ভয় করে না।

কমলা বউদিকেই প্রথম খবরটা দিলো সোমনাথ। তারপর শাড়িটা এগিয়ে দিলো। কমলা বউদি বুঝলেন, সোমনাথ আজ বড় একটা কিছু করেছে। "তুমি আজ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছ তাহলে?" কমলা বউদি গভীর আনন্দের সঙ্গে বললেন।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে বউদি এবার দেওরের দেওয়া প্রথম উপহারের প্যাকেট খুলে ফেললেন। বললেন, "বাঃ।" সোমনাথকে খুশী করার জন্যে বউদি এখনই সেই শাড়ি পরতে গেলেন। বললেন, "এই শাড়ি পরেই জন্মদিনের পায়েস পরিবেশন করবো।"

বউদি পাশের ঘরে যেতে-না-যেতেই সোমনাথ কাতরভাবে ডাকলো, "বউদি!"

"কী হলো তোমার? অমনভাবে চিৎকার করছো কেন?" বউদি ফিরে এসে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

করুণভাবে সোমনাথ বললো, "বউদি, ওই কাপড়টা আপনি পরবেন না।"

"কেন? কি হলো?" কমলা কিছুই বুঝতে পারছেন না।

"ওতে অনেক নোংরা বউদি!" আমতা-আমতা করতে লাগলো সোমনাথ। "সকালে যখন কিনেছিলাম তখনও বেশ পরিষ্কার ছিল। এই সন্ধ্যেবেলায় হঠাৎ নোংরা হয়ে গেলো।

ওতে অনেকরকম ময়লা আছে বউদি—আপনি পরবেন না!”

দেবরের এমন কথা বলার ভঙ্গী কমলা বউদি কোনোদিন দেখেননি। বললেন, “হাত থেকে নোংরার মধ্যে পড়েছিল বুঝি।”

সোমনাথ আবার বললো, “আপনাকে তো বারণ করলাম ঐ কাপড় পরতে।” কমলা অগত্যা কাপড়টা কাচবার জন্যে সরিয়ে রাখলেন।

আরও রাত হয়েছে। অভিজিৎ আসানসোল ফ্যাক্টরিতে গিয়েছে—আজ ফিরবে না। সোমনাথ খেতে আসছে না দেখে বুলবুল ওকে ডাকবার জন্যে ঘরে ঢুকে পড়েছিল। ভেবেছিল, সেই সময় অভিনন্দন জানিয়ে নিজের কাপড়টাও চেয়ে নেবে।

কিন্তু মুখ শুকনো করে সে সোমনাথের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। দিদির কাছে দ্রুত এসে উদ্বেগের সঙ্গে ফিস-ফিস করে সে বললো, “দিদি কী ব্যাপার! সোম বালিশে মুখ গুঁজে লুকিয়ে লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।”

কমলার চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। বললেন, “নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ওর বোধহয় মায়ের কথা মনে পড়ে গেছে।” বউদি কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, “ওকে লজ্জা দিও না—ওকে কাঁদতে দাও।”

জন-অরণ্যের নেপথ্য কাহিনী

কোনো গল্প-উপন্যাস পাঠক-পাঠিকাদের ভালো লাগলে লেখকের যেমন আনন্দ তেমনি নানা অসুবিধে। পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, আপিসে-রেস্তরাঁয় পরিচিতজনরা এগিয়ে এসে বলেন, তোমার অমুক বইটা পড়লাম—দারুণ হয়েছে। ডাকপিওন অপরিচিতজনদের চিঠির ডালি উপহার দিয়ে যায়; সম্পাদক ও প্রকাশকের দপ্তর থেকে রি-ডাইরেকটেড হয়েও অনেক অভিনন্দন-পত্র আসে। এসব অবশ্যই ভালো লাগে। কিন্তু অসুবিধে শুরু হয় যখন উপন্যাসের মূল কাহিনী সম্পর্কে পাঠকের মনে কৌতূহল জমতে থাকে।

তখন প্রশ্ন ওঠে, অমুক কাহিনীটি কী সত্য? কেউ-কেউ ধরে নেন, নির্জলা সত্যকেই গল্পের নামাবলী পরিয়ে লেখকেরা আধুনিক সাহিত্যের আসরে উপস্থাপন করে থাকেন। আর একদল বিরক্তভাবে বলে ওঠেন, 'সব ঝুটা হ্যায়—জীবনে এসব কখনই ঘটে না, সস্তা হাততালি এবং জনপ্রিয়তার লোভে বানানো গল্পকে সত্য-সত্য ঢঙে পরিবেশন করে লেখকেরা দেশের সর্বনাশ করেছেন।'

জন-অরণ্য উপন্যাস নিয়ে আমাকে এই ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই উপন্যাসের চলচ্চিত্ররূপ পাঠক ও দর্শকের কৌতূহলে ইন্ধন জুগিয়েছে। দেশের বিভিন্ন মহলে কাহিনীর পক্ষে এবং বিপক্ষে বিতর্কের ঝড় উঠেছে।

প্রত্যেক গল্পের পিছনেই একটা গল্প লেখার গল্প থাকে এবং জন-অরণ্য লেখার সেই নেপথ্য কাহিনীটা স্বীকারোক্তি হিসেবে আদায় করবার জন্যে অনেকেই আমার উপর চাপ দিয়েছেন। কৌতূহলী পাঠকদের এতোদিন আমি নানা তর্কজালে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেছি। বলেছি, "থিয়েটারের সাজঘর দেখলে নাটক দেখবার আকর্ষণ নষ্ট হতে পারে।" কিন্তু সে যুক্তি শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকেনি।—বিদেশের লেখকরা নাকি গল্প লেখার সাজঘরের গল্পটাও অনেক সময় উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। বিখ্যাত এক সায়েব-লেখকের নাম করে জনৈকা পাঠিকা জানালেন, "আপনি তো আর মিস্টার অমুকের থেকে কৃতী লেখক নন? তিনি যখন তাঁর অমুক উপন্যাস রচনার ইতিহাসটা বই-আকারে লিখে ফেলেছেন তখন আপনার আপত্তি কোথায়?"

মহিলার কথায় মনে পড়লো, উপন্যাস রচনার জন্য সংগৃহীত কাগজপত্র, নোটবই, প্রথম খসড়া ইত্যাদি সম্পর্কে এখন বিদেশে বেশ ঔৎসুক্য সৃষ্টি হয়েছে। ওয়াশিংটনে পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রন্থাগার লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের পাণ্ডুলিপি বিভাগে এই ধরনের ওয়ার্কিং পেপার সযত্নে সংগ্রহ করা হচ্ছে। ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে ওই গ্রন্থাগারে আমাকে জেমস মিচনারের 'হাওয়াই' উপন্যাস সংক্রান্ত ওয়ার্কিং পেপারস্-এর একটা বাক্স সগর্বে দেখানো হয়েছিল।

আমার পাঠিকাকে বলেছিলাম, "আমরা এখনও সায়েব হইনি। পড়াশোনা, অনুসন্ধান, গবেষণা, লেখালেখি, কাটাকাটির পরে শেষপর্যন্ত যে বইটা বেরুলো তাই নিয়েই পাঠকদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তার আগে কী হলো, তা নিয়ে লেখক ছাড়া আর কারুর মাথা-ব্যথার যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।"

পাঠিকা মোটেই একমত হলেন না—সন্দেহজনক দৃষ্টিতে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিরীক্ষণ করে বললেন, "লজ্জা পাবার মতো কিছু যদি না করে থাকেন, তাহলে কোনো কিছুই গোপন করবেন না।"

এরপর চুপচাপ থাকা বেশ শক্ত। কাতরভাবে নিবেদন করলাম, "এদেশে মূল উপন্যাসটাই লোকে পড়তে চায় না। উপন্যাসটা কীভাবে লেখা হলো সে-বিষয়ে কার মাথা-ব্যথা বলুন?"

মহিলা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "ওসব ছেলে-ভুলোনো কথায় মেয়ে ভুলোতে পারবেন না। আপনার জন-অরণ্য লেখার গল্পটা আমরা পড়তে চাই।"

অতএব আমার গত্যন্তর নেই। জন-অরণ্য উপন্যাসের গোড়ার কথা থেকেই শুরু করতে হয়।

এই উপন্যাস লেখার প্রথম পরিকল্পনা এসেছিল আমার বেকার জীবনে। সে

অনেকদিন আগেকার কথা। বাবা হঠাৎ মারা গিয়ে বিরাট সংসারের বোঝা আমার মাথার ওপর চাপিয়েছেন। একটা চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অথচ আফিস অথবা কারখানার কাউকে চিনি না—চাকরি কী করে যোগাড় করতে হয় তাও জানি না। এই অবস্থায় নতুন আপিসে গিয়ে লিফটে চড়তে সাহস পেতাম না—আমার ভয় ছিল লিফটে চড়তে হলে পয়সা দিতে হয়। চাকরির সন্ধানে সারাদিন ঘুরে ঘুরে কলকাতার আপিস-পাড়া সম্বন্ধে আমার মনে বিচিত্র এক ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছিল। একদিন এক পদস্থ ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে আমাকে বকুনি লাগালেন, "বাঙালীরা কি চাকরি ছাড়া আর কিছু জানবে না? বিজনেস করুন না?"

"কিসের বিজনেস?"

ভদ্রলোক বললেন, "এনিথিং—ফ্রম আলপিন টু এলিফ্যাণ্ট।"

সেই শুরু। বিজনেসে নেমে পড়বার সিদ্ধান্ত নিলাম। এই সময় পাকেচক্রে এক মাদ্রাজি ছোকরার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেলো—মিস্টার ঘোষ নামে এক বাঙালী ফাইনানসিয়ারের সহযোগিতায় তিনি ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেট তৈরির ব্যবসা খুলেছেন। আমি ওই কোম্পানির এজেন্ট।

বাস্কেট তৈরির সেই কারখানা এক আজব জায়গায়। তার ঝুড়িগুলো রং হতো মধ্য কলকাতার এক পুরানো বাড়িতে। এই রং করতেন কয়েকজন সিন্ধি এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলা—সন্ধ্যেবেলায় যাঁদের অন্য পেশা ছিল। দেহবিক্রয় করেও দেহধারণ কঠিন হয়ে পড়েছিল বলে এঁরা এই পার্টটাইম কুটিরশিল্পে মনোযোগ দিয়েছিলেন। তখন আমার কম বয়স, কলকাতার অন্ধকার জীবনযাত্রা সম্পর্কে কিছুই জানি না। এইসব স্নেহশীলা মহিলাদের সাক্ষাৎ-সংস্পর্শে এসে অভিজ্ঞতার এক নতুন দিগন্ত আমার চোখের সামনে উন্মোচিত হলো।

অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসায়ে নেমে আপিসপাড়ার যে-জীবনকে দেখলাম তার কিছুটা 'চৌরঙ্গী'র মুখবন্ধে নিবেদন করেছি। অনেক কোম্পানির কোট-প্যান্ট-চশমাপরা ক্রেতা গোপনে বাড়তি কমিশন চাইতেন, হাতে কিছু গুঁজে না দিলে পাঁচ-ছ'টাকার অর্ডারও তাঁরা হাতছাড়া করতেন না। মানুষের এই অরণ্যে পথ হারিয়ে মানুষ সম্বন্ধে যখন আশা ছাড়তে বসেছিলাম তখন ডালহৌসি-পাড়ার সাহেবী আপিসে এক দারোয়ানজীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। দারোয়ানজী সস্নেহে আমার কাছ থেকে কয়েকটা ঝুড়ি কিনলেন, সঙ্গে সঙ্গে পেমেন্টের ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি ভাবলাম দারোয়ানজীর এই স্পেশাল আগ্রহের স্পেশাল কারণ আছে। বিক্রির টাকাটা হাতে পেয়ে দারোয়ানজীকে কমিশন দিতে গেলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, "ছি ছি! ভেবেছো কি? তোমার কাছ থেকে পয়সা নেবার জন্যে এই কাজ করেছি আমি! ঘামে ভেজা তোমার অন্ধকার মুখখানা দেখে আমার কষ্ট হয়েছিল, তাই তোমাকে সাহায্য করেছি।"

দারোয়ানজী সেদিন আমাকে মাটির ভাঁড়ে চা খাইয়েছিলেন। নানা মূল্যবান উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, "মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ।"

জীবনের এক সঙ্কট-মুহূর্তে ডালহৌসি-পাড়ার অশিক্ষিত দারোয়ান আমাকে বাঁচিয়েছিল—আমি হেরে যেতে যেতে হারলাম না।

আমার মনের সেই অনুভূতি আজও নিঃশেষ হয়নি—মানুষকে আমি কিছুতেই পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারি না। কিন্তু ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেট হাতে দোকানে দোকানে, আপিসে আপিসে ঘুরে মানুষের নির্লজ্জ নগ্নরূপ দেখেছি। দু-একটা জায়গায় ঝুড়ি জমা দিয়ে একটা পয়সাও আদায় করতে পারিনি। এক সপ্তাহ পায়ে হেঁটে আপিস-পাড়ায় এসে এবং টিফিন না করে আমাকে সেই ক্ষতির খেসারৎ দিতে হয়েছে। ক্যানিং স্ট্রীটের একটা দোকানে ছ'টা ঝুড়ি দিয়েছিলাম—অন্তত তিরিশবার গিয়েও পয়সা অথবা ঝুড়ি কোনোটাই উদ্ধার করতে পারিনি। তবু যে পুরোপুরি হতাশ হইনি, তার কারণ মধ্যদিনে মধ্য-কলকাতার বান্ধবীরা! তাঁরা আমাকে উৎসাহ দিতেন। বলতেন, দেহের ব্যবসাতেও অনেক সময় টাকা মারা যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন সুযোগ আসে যখন সমস্ত

লোকসান সুদসমেত উসুল হয়ে যায়।

আমারও সামনে একদিন তেমন সম্ভাবনার ইঙ্গিত ঝলমল করে উঠলো। এক ভদ্রলোক বললেন, তিনি ডিসপোজাল থেকে খুব সস্তাদরে কিছু স্টীল বেলিং হুফ কিনেছেন। দাম বললেন এবং জানালেন, এর ওপর চড়িয়ে আমি যত দামে মাল বিক্রি করতে পারবো সবটাই আমার প্রফিট।

এইসব বেলিং হুফ কাপড়ের কল এবং জুট মিলে লাগে। কয়েকদিন খোঁজখবর নিয়ে জানলাম, ঠিক মতো পার্টি যোগাড় করতে পারলে বেশ কয়েক হাজার টাকা লাভের সম্ভাবনা আছে। বিজনেসে বড়লোক হবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে অনেক আপিসে ঘুরলাম। কিন্তু কোনো ফল হলো না। শেষে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার ওপর দয়াপরবশ হয়ে বললেন, "এইভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য হয় না ভাই—বড় বড় কারখানায় আপনার জানশোনা কোনো অফিসার নেই? ওই রকম কারুর মাধ্যমে পারচেজ অফিসারদের নরম করবার চেষ্টা করুন।"

অফিসারকে নরম করবার ব্যাপারটা তখনও বুঝে উঠতে পারিনি। একজন পরিচিত ভদ্রলোকের সাহায্যে এক জুট মিলে কিছুটা এগোলাম। জিনিসের নমুনা দিলাম। দামও যে সস্তা জানিয়ে দিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হলো না। পরিচিত ভদ্রলোক আমার দুঃখে কষ্ট পেয়ে বললেন, "পারচেজ অফিসার মালিকের আত্মীয়—ওরা নিজেদের খেয়াল-খুশী মতো চলে, ওদের সাতখুন মাপ।"

ভদ্রলোকের কাছে যাতায়াত করে জুতোর হাফসোল খইয়ে ফেলেছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু করা গেলো না। উনি কেন যে আমাকে অর্ডার দিলেন না তাও অজানা রয়ে গেলো।

শেষ পর্যন্ত ছোটখাট একটা চাকরি যোগাড় হয়ে যাওয়ায় ব্যবসার লাইন ছেড়ে বিজনেসে বড়লোক হবার স্বপ্নটা চিরদিনের মতো বিসর্জন দিয়েছি। এমন সময় একদিন মধ্য-কলকাতার সেই বাড়িতে গিয়েছি, কিছু হিসেব-পত্তর বাকি ছিল। তখন দুপুর তিনটে। রোজী নামে এক খ্রীষ্টান দেহপসারিণীর সঙ্গে আমার খুব আলাপ ছিল। তার ঘরে ঢুকতে গিয়ে হোঁচট খেলাম—আমার পরিচিত পারচেজ অফিসার সেখানে বসেই দু-দণ্ডের আনন্দ উপভোগ করছেন। মিনিট দশেকের মধ্যেই ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

পরে শুনেছি, আমাদের কোম্পানির মাদ্রাজি যুবকের বিশিষ্ট অতিথি হিসাবেই ভদ্রলোক রোজীর বিজন কক্ষে এসেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সেই বেলিং হুফ যা আমি বেচতে পারিনি তা তিনি রোজীর দেহসান্নিধ্যে সন্তুষ্ট হয়ে চড়া দরে কিনেছেন। রোজী আমার বোকামিতে বিরক্ত হয়ে বলেছিল, "ইউ আর এ ব্লাডি ফুল। আমাকে আগে বলোনি কেন?"

অস্বস্তিকর এই ঘটনা আমার মনের গভীরে গেঁথে গিয়েছিল। কিন্তু তখন অন্য এক জগতে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার নাটকে দুলতে আরম্ভ করেছি। আমার সামনে নতুন এক পৃথিবীর সিংহদ্বার সহসা উন্মীলিত হয়েছে, যার অন্তঃপুরে বসবাস করছেন বিচিত্র এক বিদেশী—নাম নোয়েল বারওয়েল।

সাহিত্যের নিত্য-নূতন পথে ঘুরতে ঘুরতে ব্যর্থ বিজনেসম্যান শংকর-এর ছবিটা আমার অজান্তেই অস্পষ্ট হতে আরম্ভ করেছিল। এ-সম্বন্ধে লেখবার ইচ্ছেও তেমনি ছিল না। ইতিমধ্যে বেশ কয়েক বছর কেটে গিয়েছে। কিছু দিন আগে খেয়ালের বশে একলা পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে লালবাজারের পূর্ব দিকে হাজির হয়েছি। কোনো সময় রবীন্দ্র সরণি ধরে হ্যারিসন রোডের দিকে ছুটতে আরম্ভ করেছিলাম। নতুন সি আই টি রোডের মোড়ে এসে দেখলাম লোকে লোকারণ্য চিৎপুর রোডে ট্রাম বাস ট্যাক্সি এবং টেম্পোর জটিল জট পাকিয়েছে। জ্যাম জমাট এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে একটা সেকেলে ধরনের ট্রামগাড়ির বৃদ্ধ ড্রাইভার করুণভাবে ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে। বিরাট এই যন্ত্রদানবকে হঠাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় গিরগিটির মতো মনে হলো। বেশ কিছুক্ষণ আমি ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম পথের ধারে একটা বিবর্ণ মলিন ল্যাম্পপোস্টের তলায় তেইশ-চব্বিশ বছরের এক ছোকরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার হাতে একটা অর্ডার সাপ্লায়ারের ব্যাগ। ভদ্রলোক যে অর্ডার সাপ্লায়ার তা বুঝতে আমার একটুও দেরি হলো না।

তরুণ এই ব্যবসায়ীর বিষণ্ণ সরল মুখখানি হঠাৎ কেন জানি না আমাকে অভিভূত করলো। যুবকটি ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। কার অপেক্ষায় সে এমনভাবে এখানে দাঁড়িয়ে আছে কে জানে? চিৎপুর রোডের স্থবির ট্রাফিক ইতিমধ্যে আবার চলমান হয়েছে এবং একটা ট্যাক্সি হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালো। এক অদ্ভুত স্টাইলের মধ্যবয়সী ভদ্রলোক ভারিক্কী চালে পাইপ টানতে টানতে ট্যাক্সির মধ্যে থেকে ছোকরার উদ্দেশ্যে বললেন, "মিস্টার ব্যানার্জি।" তরুণ ব্যবসায়ী দ্রুতবেগে ওই ট্যাক্সির মধ্যে উঠে পড়লো।

অতি সাধারণ এক দৃশ্য। কিন্তু হঠাৎ আমার মনে পড়লো আজ ১লা আষাঢ়।

কিন্তু চিৎপুর রোডের মানুষরা কেউ আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের খোঁজ রাখে না। অপেক্ষমান যুবকের দ্বিধাগ্রস্ত মুখখানা এরপর কিছুদিন ধরে আমার চোখের সামনে সময়ে-অসময়ে ভেসে উঠতো। পরিচয়হীন মিস্টার ব্যানার্জির নিষ্পাপ সরল মুখে আমি যেন বর্ণনাতীত বেদনার মেঘ দেখতে পেলাম। আমার পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে গেলো। ভাবলাম, লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকের হতভাগ্য এই দেশে বেকার এবং অর্ধবেকারদের সুখ-দুঃখের খবরাখবর সাহিত্যের বিষয় হয় না কেন? আমি এ বিষয়ে খোঁজ-খবর আরম্ভ করলাম।

চাকরির ইন্টারভিউ সংক্রান্ত বেশ কয়েকটা ম্যাগাজিন লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়। এই সব ম্যাগাজিনের প্রশ্নোত্তর বিভাগ মন দিয়ে পড়ে আমার চোখ খুলে গেলো। ইন্টারভিউতে এমন সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয় যার উত্তর সেইসব প্রতিষ্ঠানের বড়-কর্তারাও যে জানেন না তা হলফ করে বলা যায়। এ বিষয়ে আরও কিছু অনুসন্ধান করতে গিয়ে একদিন হতভাগ্য সুকুমারের খবর পেলাম। শুনলাম, চাকরির পরীক্ষায় পাস করবার প্রচেষ্টায় বারবার ব্যর্থ হয়ে ছেলেটি উন্মাদ হয়ে গিয়েছে—পৃথিবীর যতরকম জেনারেল নলেজের প্রশ্ন ও উত্তর তার মুখস্থ। বাস স্ট্যান্ডের কাছে দাঁড়িয়ে অপরিচিতজনদের সে এইসব উদ্ভট প্রশ্ন করে এবং উত্তর না পেলে বিরক্ত হয়।

ছোট ব্যবসায়ে বাড়তি কমিশন, ঘুষ এবং ডালির ব্যাপারটা আমার অজানা নয়। কিন্তু সম্প্রতি সেখানে নতুন একটি বিষয়ের অবতারণা হয়েছে। ব্যাপারটা কতখানি বিশ্বাসযোগ্য তা যাচাই করবার জন্যে কয়েকজন সাকসেসফুল ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তাঁরা সুকৌশলে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলেন—বললেন, ব্যবসার সব ব্যাপার সাহিত্যের উপাদান হতে পারে না। ঠিক সেই সময় আমার এক পরিচিত তরুণ বন্ধুর সঙ্গে অনেক দিন পরে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলো।

একদিন স্ট্র্যান্ড রোডে গঙ্গার ধারে বসে শুনলাম এই যুবকের নানা অভিজ্ঞতার কাহিনী। সে বললো, "যে-কোনোদিন সময় করে আসুন সব দেখিয়ে দেবো।"

নদীর ধারে ডাব বিক্রি হচ্ছিল। বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, "ডাব খাবে?" বন্ধু হেসে উত্তর দিলো, "আপনার সঙ্গে এমন একজন মহিলার পরিচয় করিয়ে দেবো যিনি অভিসারে বেরোবার আগে এক গেলাস ডাবের জল খাবেনই।"

এই মহিলাটির ঠিকানা আমার বিশেষ পরিচিত এক ভদ্র গলিতে। স্বামী বৃহৎ এক সংস্থার সামান্য কেরানি। নিজের নেশার খরচ চালাবার জন্যে বউকে দেহব্যবসায়ে নামিয়েছেন। অথচ বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ এবং সুভাষচন্দ্রের ছবি ঝুলছে। এই মহিলা সত্যিই একদিন জানাশোনা পার্টির সঙ্গে বেরুতে যাচ্ছেন এমন সময় স্বামী মত্ত অবস্থায় ফিরলেন। সেজেগুজে বউকে বেরুতে দেখে ভদ্রলোক তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, "পর পর ক'দিন তোমার ওপর খুব ধকল গিয়েছে। আগামীকালও তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে। আজ তোমায় বেরুতে হবে না; অত পয়সার আমার দরকার নেই!" এঁকে নিয়েই শেষ পর্যন্ত মলিনা গাঙ্গুলীর চরিত্র তৈরি হলো।

সবচেয়ে মজা হয়েছিল জন-অরণ্য উপন্যাস দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পরে। মিসেস গাঙ্গুলী যত্ন করে গল্পটা পড়েছিলেন। পড়া শেষ করেই পরিচিত খদ্দেরের সঙ্গে তিনি হোটেলে গিয়েছিলেন বিখ্যাত এক বেওসাদারের মনোরঞ্জনের জন্যে। সেখানে আরাধ্য ভি-আই-পির শুভাগমনের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে ভদ্রমহিলা বললেন, "শংকর-এর